ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ঢাকা শহরে বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

মূল প্রতিবেদন

২৫ নভেম্বর ২০২৬

ঢাকা শহরে বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো*

গবেষণা পরিচালনা
ড. অতনু দাস, *রিসার্চ ফেলো (প্রাক্তন)*

গবেষণা সহকারী
নওশীন আনজুম, খাইরুল হাসান, হাসান মাহমুদ কামরান, সোপান চাকমা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণার তথ্যদাতা ব্যক্তিবর্গের প্রতি, যাঁরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ মতামতের মাধ্যমে এই গবেষণাকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য করেছেন। তদুপরি, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশীজন–বিশেষত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক ও সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, গণমাধ্যমকর্মী, বেসরকারি আবাসন খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ, পেশাজীবী সমাজ এবং খাতসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ–যাঁরা তাঁদের মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত, বিশ্লেষণধর্মী মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এই গবেষণার গুণগত উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা প্রদানের জন্য গবেষণা সহকারী নওশীন আনজুম, খাইরুল হাসান, হাসান মাহমুদ কামরান এবং সোপান চাকমার প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। একইসঙ্গে গবেষণার তত্ত্বাবধান, প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রাঞ্জল সম্পাদনার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখার জন্য সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম. আকরাম, এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামানের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। গবেষণা কার্যক্রমে সার্বিক দিকনির্দেশনা, নীতিগত প্রজ্ঞা ও গঠনমূলক মতামত প্রদানপূর্বক প্রতিবেদনটির মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা (নির্বাহী ব্যবস্থাপনা) অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মী, যাঁরা প্রতিবেদনটির উপস্থাপনা, পরিমার্জন ও উৎকর্ষ সাধনে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতিও জানাই অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ২
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ৫
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ৬
১.৪ গবেষণার পরিধি ৭
১.৫ গবেষণাপদ্ধতি ৮
১.৫.১ তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ৯
১.৫.২ প্রাথমিক তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহ ও নমুনায়ন পদ্ধতি ৯
১.৫.৩ পরোক্ষ তথ্যের উৎস ১০
১.৫.৪ তথ্য সংগ্রহের সময় ১০
১.৬ বিশ্লেষণ কাঠামো ১০
১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১১
১.৮ প্রতিবেদনের কাঠামো ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে রিয়েল এস্টেট খাতের ক্রমবিকাশ ও অংশীজন কাঠামো

২.১ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার এবং এর শ্রেণিবিভাগ ১৩
২.১.১ রিয়েল এস্টেট, রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এবং রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার ১৩
২.১.২ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির শ্রেণিবিভাগ ১৪
২.১.৩ বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প ১৪
২.২ বাংলাদেশে বেসরকারি আবাসন খাতের ক্রমবিকাশ ১৫
২.৩ বাংলাদেশে বেসরকারি আবাসন খাতে অংশীজন কাঠামো ২০
২.৩.১ নীতিনির্ধারণী কাঠামো ২১
২.৩.২ নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদন ও তদারকি কর্তৃপক্ষ ২১
২.৩.৩ ইউটিলিটি ও নাগরিক সেবা প্রদান ২২
২.৩.৪ সরবরাহ (**Supply-side**) কাঠামো ২২
২.৩.৫ চাহিদা (**Demand-side**) কাঠামো ২২
২.৩.৬ ব্যবসায়ী সংগঠন ও খাতভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ২৩
২.৩.৭ বাজার মধ্যস্থতাকারী, তথ্য প্রচার কাঠামো, স্থানীয় সামাজিক এবং প্রভাবশালী অংশীজন ২৩
২.৩.৮ সরকারি প্রশাসনিক ও নিবন্ধন কাঠামো ২৩
২.৩.৯ পেশাগত ও প্রযুক্তিগত সহায়তা কাঠামো ২৪
২.৩.১০ সিভিল সোসাইটি ও পরিবেশবাদী ওয়াচডগ প্রতিষ্ঠান ২৪
২.৪ উপসংহার ২৪

তৃতীয় অধ্যায়: বেসরকারি রিয়েল এস্টেট খাত সংক্রান্ত নীতি ও আইনি কাঠামো

৩.১ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ ..... ২৫
৩.২ বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২ ও ২০১৫) ২৭
৩.৩ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন ২০১২ এবং ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র গাইডলাইন ২০২০ ..... ২৯
৩.৪ ভূমি সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ ..... ৩০
৩.৫ মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ ..... ৩১
৩.৬ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ..... ৩২
৩.৭ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ ..... ৩২
৩.৮ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ ..... ৩৩
৩.৯ রিহ্যাবের ব্যবসায়িক আচরণবিধি সম্পর্কিত উপ-আইনসমূহ (**Bye-Laws on Code of Business Conduct**) ৩৪
৩.১০ বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভেলপার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএলডিএ)-এর আচরণবিধি (**Code of Business Conduct**) ৩৫
৩.১১ উপসংহার ৩৬

চতুর্থ অধ্যায়: সক্ষমতা, কার্যকরতা এবং স্বচ্ছতা

৪.১ বেসরকারি আবাসন খাতের সক্ষমতা ও কার্যকরতা ৩৭
৪.১.১ মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি ৩৭
৪.১.২ ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিচারিক কাঠামোতে বিচারক সংখ্যার ঘাটতি ৩৮

৪.১.৩ দক্ষতার ঘাটতি ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতা ৩৯
৪.১.৪ নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদা পূরণে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির কার্যকরতার অভাব ৩৯
৪.১.৫ ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকরতার সীমাবদ্ধতা ৪১
৪.১.৬ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংগঠনসমূহের (বিএলডিএ ও রিহ্যাব) প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অকার্যকরতা ৪২
৪.১.৭ বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অকার্যকরতা ৪২
৪.২ স্বচ্ছতার ঘাটতি ৪৩
৪.২.১ প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি ৪৩
৪.২.২ আর্থিক তথ্য প্রকাশে স্বচ্ছতার ঘাটতি ৪৫
৪.২.৩ প্লটের মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতার ঘাটতি ৪৫
৪.২.৪ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংগঠনসমূহের স্বচ্ছতার ঘাটতি ৪৬
৪.৩ উপসংহার ৪৭

পঞ্চম অধ্যায়: অনিয়ম ও দুর্নীতি

৫.১ বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের স্থান নির্বাচন, জমি সংগ্রহ ও অধিগ্রহণ পর্যায় ৪৮
৫.১.১ জমি নির্বাচন ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনিয়ম ৪৮
৫.১.২ জমির মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে অনিয়ম ৫২
৫.১.৩ মধ্যস্বত্বভোগী নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অনিয়ম ৫২
৫.২ প্রকল্প পরিকল্পনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়া ৫৪
৫.২.১ বিভিন্ন আইনি শর্ত পালনে অনিয়ম ৫৪
৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন পর্যায় ৫৪
৫.৩.১ কমিউনিটি ফ্যাসিলিটি উপেক্ষা ৫৪
৫.৩.২ নির্মাণ/উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনিয়ম ৫৫
৫.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন পর্যায় ৫৬
৫.৪.১ প্লট বিক্রয় ও বরাদ্দ সংক্রান্ত অনিয়ম ৫৬
৫.৪.২ প্লটের মালিকানা হস্তান্তর ও মূল্য পরিশোধে অনিয়ম ৫৬
৫.৫ প্লট বিক্রয় ও গ্রাহক ব্যবস্থাপনা পর্যায় ৫৭
৫.৫.১ প্লট ক্রেতার কাছ থেকে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অতিরিক্ত অর্থ আদায় ও পদ্ধতিগত অনিয়ম ৫৭
৫.৫.২ প্রকল্প এলাকায় পণ্য ও সেবা ক্রয়ে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ৫৯
৫.৫.৩ প্লটের মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য নানা অজুহাতে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা ৫৯
৫.৬ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনিয়ম ৫৯
৫.৭ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ও সরকারি সংস্থার মধ্যে নিয়মবহির্ভূত লেনদেন ৬০
৫.৮ সংবাদমাধ্যমের কৌশলগত ব্যবহার ৬২
৫.৯ বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্য ও 'মাৎস্যন্যায়' বাস্তবতা ৬৫
৫.১০ রাজনৈতিক প্রভাব, পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যবসায়িক স্বার্থের যোগসূত্র ৬৬
৫.১১ বেসরকারি আবাসন খাতে দুর্নীতির চূড়ান্ত ভুক্তভোগী গ্রাহক ৬৯
৫.১২ বেসরকারি আবাসন খাতে "মাফিয়াতন্ত্র" ৭১
৫.১৩ আবাসন খাতে প্রভাব বিস্তার, নিয়ন্ত্রণ এবং 'স্টেট ক্যাপচার' ৭৩
৫.১৩.১ ড্যাপ সংশোধনে আবাসন ব্যবসায়ীদের প্রভাব ৭৩
৫.১৩.২ অপ্রদর্শিত অর্থের সুরক্ষায় রিয়েল এস্টেট খাতের নীতিগত প্রভাব বিস্তার ৭৫
৫.১৩.৩ আবাসন খাতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির 'স্টেট ক্যাপচার' প্রক্রিয়া ৭৭
৫.১৪ উপসংহার ৭৮

ষষ্ঠ অধ্যায়: অংশগ্রহণ, সমন্বয় ও জবাবদিহি

৬.১ অংশগ্রহণ ও সমন্বয় ৮০
৬.১.১ ভূমি মালিক ও প্লট ক্রেতাদের অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতা ৮০
৬.১.২ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ৮১
৬.১.৩ খাতসংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ৮২
৬.১.৪ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বেসরকারি পেশাজীবী সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ৮২
৬.২ জবাবদিহিতা ৮৩
৬.২.১ আইন প্রয়োগে ঘাটতি ৮৩
৬.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাত ও স্বার্থসংঘাত ৮৪
৬.২.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি ৮৫
৬.২.৪ বিরোধ নিষ্পত্তি ও ভুক্তভোগী সুরক্ষায় জবাবদিহিতার ঘাটতি ৮৫
৬.২.৫ ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক অস্বীকৃতির সংস্কৃতি ও যৌথ সুরক্ষাবাদ ৮৬

৬.৩ উপসংহার ৮৭

সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ

৭.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৮৮
৭.২ সুপারিশমালা ৮৯
৭.২.১ আইনগত ও নীতিনির্ধারণীমূলক ৮৯
৭.২.২ তদারকি ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ ৯১
৭.২.৩ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ ৯১
৭.২.৪ অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ৯২

পরিশিষ্ট ৯৩
তথ্যসূত্র ৯৩

সারণির তালিকা

সারণি ১. ১: প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্যদাতা/তথ্যদাতার ধরন এবং নমুনায়ন পদ্ধতি ৯
সারণি ১. ২: সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কাঠামো ১১
সারণি ২. ১: বাংলাদেশে বেসরকারি আবাসন খাতের ক্রমবিকাশ ১৯
সারণি ২. ২: বাংলাদেশে বেসরকারি আবাসন খাতের অংশীজন কাঠামো ২০
সারণি ৪. ১: বেসরকারি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনে নিম্নবিত্ত/নিম্ন-মধ্যবিত্তের উপস্থিতি ৪১
সারণি ৫. ১: ঢাকা শহরে জলাশয়, বৃক্ষ আচ্ছাদন, তৃণভূমি/কৃষিজমি এবং বিল্ট-আপ এলাকার পরিমাণ (১৯৮০-২০২৪) ৪৯
সারণি ৫. ২: মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের সহযোগিতা নেয়ার ক্ষেত্রে কোম্পানির আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ৫৩
সারণি ৫. ৩: গ্রাহকদের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত ব্যয়ের খাত ও আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ৫৮
সারণি ৫. ৪: সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থায় নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের প্রাক্কলিত হিসাব ৬০
সারণি ৫. ৫: একটি ২৫ একর আয়তনের বেসরকারি আবাসন প্রকল্পে সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থায় নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের প্রাক্কলিত হিসাব ৬১
সারণি ৫. ৬: নিজস্ব গণমাধ্যম আছে এমন রিয়েল এস্টেট কোম্পানির তালিকা ৬৩
সারণি ৫. ৭: নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর অর্জিত কৌশলগত সুবিধা ৭০

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১. ১: গবেষণার পরিধি ৭
চিত্র ১. ২: গবেষণা এলাকা - ঢাকা শহর ৮
চিত্র ১. ৩: তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ৯
চিত্র ২. ১: কার্যক্রমের ধরন/বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির শ্রেণিবিভাগ ১৪
চিত্র ৫. ১: ঢাকা শহরে জলাশয়, বৃক্ষ আচ্ছাদন, তৃণভূমি/কৃষিজমি এবং বিল্ট-আপ এলাকার পরিমাণ (১৯৮০-২০২৪) ৫০
চিত্র ৫. ২: বেসরকারি আবাসন প্রকল্পে মধ্যস্বত্বভোগীর কার্যক্রম ৫৩
চিত্র ৫. ৩: বেসরকারি আবাসন খাতে দুর্নীতির ত্রিমাত্রিক বাস্তবতা এবং দুর্নীতির ইকোসিস্টেম চক্র ৬৯
চিত্র ৫. ৪: বেসরকারি আবাসন খাতে 'মাফিয়াতন্ত্র' ৭২
চিত্র ৫. ৫: আবাসন খাতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রভাব বিস্তার, নিয়ন্ত্রণ এবং 'স্টেট ক্যাপচার' প্রক্রিয়া ৭৭

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ও পরিভাষা

রিহ্যাব	রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
রাজউক	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
সিডিএ	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
কেডিএ	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
এফএআর	ফ্লোর এরিয়া রেশিও (মেঝে/তলার আয়তন অনুপাত)
ডিএনসিসি	ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন
ডিএসসিসি	ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন
বিএলডিএ	বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভেলপারস অ্যাসোসিয়েশন
জিআইএস	জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম বা ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা
ইআইএ	এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট বা পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
টিআইএ	ট্রাফিক ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট বা ট্রাফিক প্রভাব মূল্যায়ন
এনএইচএ	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
ডিপিডিসি	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
ডেসকো	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড
ডিটিসিএ	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ
আইএবি	ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ
বিআইপি	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স
আইইবি	ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
এনবিআর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ড্যাপ	ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান বা বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা
ইসিএ	ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া (পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা)
বাপা	বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন
বেলা	বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি
আইপিএ	ইরেভোকেবল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বা অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি
এফবিসিসিআই	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আবাসনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি আবাসন খাত দেশের নগর উন্নয়ন ও আবাসন ব্যবস্থায়, বিশেষ করে ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভূমি উন্নয়ন, আবাসিক প্লট সরবরাহ এবং আবাসিক/বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে বিভিন্ন পর্যায়ে আইন ও বিধিবিধানের যথাযথ প্রয়োগে ঘাটতি, প্রকল্প অনুমোদন ও তদারকিতে অস্বচ্ছতা, ভূমির শ্রেণি ও ব্যবহার পরিবর্তনসংক্রান্ত অনিয়ম, প্লট বিক্রয় ও বরাদ্দে অনিয়ম, এবং ক্রেতা ও ভূমির মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব পালনে সীমাবদ্ধতা, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এ খাতের সুশাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাত, প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা, নীতি পরামর্শ ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দেশের বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসনের চর্চা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, এবং সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনার লক্ষ্যে 'ঢাকা শহরে বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। এ গবেষণায় বেসরকারি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে আইনের শাসন, সক্ষমতা, কার্যকরতা, অংশগ্রহণ, সমন্বয়, স্বচ্ছতা, অনিয়ম-দুর্নীতি ও জবাবদিহিতার আলোকে সুশাসনের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, বেসরকারি আবাসন খাতের ভূমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের প্রায় সব সূচকেই কাঠামোগত দুর্বলতা ও বাস্তবায়নের ঘাটতি বিদ্যমান। বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার ফাঁকফোকর, শিথিল প্রয়োগ এবং সমন্বয়হীনতার সুযোগ নিয়ে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো ধারাবাহিকভাবে আইন লঙ্ঘন করে চলছে। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং পানি-বিদ্যুৎ ও পয়ঃনিষ্কাশনসংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা ও সদিচ্ছার ঘাটতির ফলে তৈরি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে প্রভাবশালী কোম্পানিগুলো আইনি বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যাচ্ছে। ভূমি নির্বাচন, ক্রয় ও দখল, প্রকল্প অনুমোদন থেকে শুরু করে প্লট হস্তান্তর পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে পদ্ধতিগত অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে, যেখানে অপপ্রচার, তথ্যপ্রবাহ রুদ্ধ করা, নাগরিক অংশগ্রহণকে সীমিত রাখা এবং দুর্বল বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে একধরনের আইনি দায়মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তদুপরি, রাজনৈতিক ছত্রছায়া, মধ্যস্বত্বভোগী ও প্রশাসনিক অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের সহায়তায় বৃহৎ ডেভেলপাররা একটি শক্তিশালী 'মাফিয়াতন্ত্র' গড়ে তুলে নীতিনির্ধারণী ও সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে কার্যত জিম্মি করে ফেলেছে। আবাসন খাতে কালো টাকা বিনিয়োগকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ও তাদের সংগঠনগুলোর অব্যাহত প্রচেষ্টা এই খাতে সুশাসনকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। কোম্পানিগুলোর অতি-মুনাফাকেন্দ্রিক মানসিকতা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ফলে জমির মালিক ও সাধারণ ক্রেতারা আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছেন এবং তাঁদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে, এসব অনিয়ম ঢাকা শহরের পরিবেশগত সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা, পরিকল্পিত নগরায়ণ, 'সবার জন্য সাশ্রয়ী আবাসন' নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

এ গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছেন ড. অতনু দাস, সাবেক রিসার্চ ফেলো, টিআইবি এবং গবেষণাটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন টিআইবি'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন নওশীন আনজুম, খাইরুল হাসান, হাসান মাহমুদ কামরান ও সোপান চাকমা। গবেষণা পরিচালনার বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, এবং টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ গবেষণা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবান তথ্য, অভিজ্ঞতা ও মতামত দিয়ে সহযোগিতাকারী সকল অংশীজনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গবেষণার তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ বেসরকারি আবাসন খাতের ভূমি উন্নয়নখাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক, সরকারি ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য অংশীজন গবেষণার সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে টিআইবি প্রত্যাশা করে। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকদের যে কোনো গঠনমূলক মতামত, পরামর্শ ও সুপারিশ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮), ধারা ২৫(১) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য যথাযথ জীবনযাত্রার মানের অধিকার রয়েছে, যার মধ্যে 'বাসস্থান' অন্যতম। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অধীনে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে নাগরিকদের জীবনধারণের জন্য যেসব প্রয়োজনীয় মৌলিক উপকরণ নিশ্চিত করার বিষয়ে বলা হয়েছে, তার মধ্যে "আশ্রয়" অন্যতম [অনুচ্ছেদ ১৫(ক)]। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১)-এ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, যা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।[১] এছাড়া অনুচ্ছেদ ৩১ ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে, যার মধ্যে নিরাপদ ও সুষ্ঠু বাসস্থানের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০১৬ সালের জাতীয় গৃহায়ন নীতিতেও সাধ্যের মধ্যে সবার জন্য বিশেষত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।[২] এসব ধারা এবং নীতিমালা একত্রে প্রমাণ করে, নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও সমতাভিত্তিক বাসস্থান প্রদান রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব কেবল অগ্রাধিকারভিত্তিকই নয় (হোসেন, ২০১৮; রহমান, ২০২০), বরং সরকারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং অঙ্গীকার।

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে সরকারি উদ্যোগে সাধারণ মানুষের জন্য আবাসন প্রকল্পের সূচনা ঘটে মূলত ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে, যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ঢাকাসহ কয়েকটি শহরে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলে। এই উদ্যোগের সূচনা ঘটে ১৯৫৮ সালে ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য পূর্ব পাকিস্তান হাউজিং বোর্ডের (East Pakistan Housing Board) আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর মাধ্যমে (সিদ্দিক, ১৯৯০)। এসব এলাকাকে সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রথম দিককার পরিকল্পিত বসতি হিসেবে গড়ে তোলা হয়, যার মধ্যে মিরপুরের সেকশন-১, ২ ও ১০ এবং মোহাম্মদপুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ইসলাম, ২০০৫)। একই সময়ে সরকারি কর্মচারীদের জন্য আগারগাঁও এবং তেজগাঁও শিল্প এলাকার আশেপাশে বহুতল আবাসন কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়।[৩] ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহরেও মধ্যবিত্তদের জন্য সীমিত পরিসরে সরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় (আলম, ১৯৮৭)।[৪] মূলত শহরাঞ্চলে অভিবাসনপ্রবণ জনস্রোত সামলানো ও ঘনবসতি হ্রাস করাই ছিল এসব আবাসন প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য (ইসলাম, ২০০৫)।

স্বাধীনতার পরবর্তী দশকে (বিশেষত ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে) ঢাকায় প্রতি আবাসন ইউনিটে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়; ১৯৭৩ সালে গড়ে প্রতি বাসস্থান ইউনিটে ৭.৭ জন বসবাস করত, যা নগর আবাসন-সংকট এবং অতিরিক্ত ঘনবসতির একটি স্পষ্ট নির্দেশক (সাকুর, ১৯৮৭)। বাংলাদেশে সরকারি উদ্যোগে সাধারণ মানুষের জন্য আবাসন প্রকল্পের সূচনা মূলত স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে ১৯৭২ সালে শুরু হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষের পুনর্বাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে "বাস্তুহারা পুনর্বাসন" কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে গৃহহীন হয়ে পড়া লাখো মানুষকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহায়ন কার্যক্রম শুরু করে। এটি ছিল সরকারি উদ্যোগে গৃহনির্মাণের সূচনা পর্ব (সিদ্দিক, ১৯৯০)। ১৯৭৩ সালে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সরকারি প্লট বরাদ্দ, বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণসহ গৃহায়ন সংক্রান্ত একাধিক কার্যক্রম চালু করা হয়। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367.html (১১ আগস্ট ২০২৫)।

[২] গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, *জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা ২০১৬*, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, https://udd.gov.bd/site/page/0258bce8-65d3-4802-8d5b-f5afac308f7f/জাতীয়-গৃহায়ন-নীতিমালা-২০১৬ (১১ আগস্ট ২০২৫)।

[৩] গৃহায়ণ ও বসতি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার (আর্কাইভড নথিপত্র)।

[৪] এসব প্রকল্পে কেবল আবাসন নয়, বরং অবকাঠামোগত সুবিধা, যেমন রাস্তা, পানি, স্কুল ও বাজারসহ একটি পরিপূর্ণ বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করা হয় (সিদ্দিক, ১৯৯০)।

আওতায় একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) (সাবেক ডিআইটি) এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ – এই দুটি প্রতিষ্ঠান পরবর্তী সময়ে ঢাকার নগরায়ণ ও আবাসন খাতে সাধারণ জনগণের জন্য সরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে (ইসলাম, ২০০৫; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ২০১৫; জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮)। সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন সরকার গ্রামীণ ও গৃহহীন জনগণের কল্যাণে নানা কর্মসূচি[৫] গ্রহণ করে, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই জীবনমান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে (পরিকল্পনা কমিশন, ২০২০)।

বাংলাদেশে পরিকল্পিত নগরায়ন ও সাধারণ মানুষের আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সময়ে একাধিক আবাসন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ১৯৫০-এর দশকের শেষভাগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ধানমণ্ডি, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, গুলশান ও বনানী আবাসিক এলাকা গড়ে তোলে। ধানমণ্ডি (১৯৫৬-১৯৬০) ছিল ঢাকার প্রথম আধুনিক পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা, যার উদ্দেশ্য ছিল একটি সুপরিকল্পিত নগর পরিবেশ সৃষ্টি করা। তবে এটি মূলত উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের জন্য পরিকল্পিত হওয়ায় নিম্নআয়ের মানুষের আবাসনের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি (রাজউক, ২০১৫; নিলুফার, ২০১০)। একইভাবে মোহাম্মদপুর আবাসিক এলাকা (১৯৫০-এর দশকের শেষভাগ থেকে ১৯৬০-এর দশক) দ্রুত নগরায়নের চাহিদা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও পরবর্তীকালে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ ও অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের কারণে এর পরিকল্পিত বৈশিষ্ট্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় (নিলুফার, ২০১০; ইসলাম, ২০১২)। মিরপুর আবাসিক প্রকল্প (১৯৫৯-১৯৬৫) মূলত ভারত থেকে আসা উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য গড়ে তোলা হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি উচ্চ ঘনত্বের আবাসিক এলাকায় পরিণত হয় এবং অবকাঠামোর ওপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করে (নিলুফার, ২০১০)। অপরদিকে গুলশান (১৯৬১) ও বনানী (১৯৬৪) আন্তর্জাতিক মানের আবাসিক ও কূটনৈতিক এলাকা হিসেবে গড়ে উঠলেও ক্রমবর্ধমান জমির মূল্য এসব এলাকাকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যায় (রাজউক, ২০১৫; বাংলাপিডিয়া[৬])।

স্বাধীনতার পর রাজধানীর সম্প্রসারণ ও জনসংখ্যার চাপ মোকাবিলায় সরকার উত্তরা মডেল টাউন (১৯৭৯) প্রকল্প গ্রহণ করে, যা পরবর্তীতে একাধিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়। প্রকল্পটি ঢাকার উত্তরাংশে একটি পরিকল্পিত নগর গড়ে তুলতে সফল হলেও প্লট বরাদ্দে অনিয়ম, দীর্ঘ বাস্তবায়নকাল এবং নিম্নআয়ের মানুষের সীমিত প্রবেশাধিকার নিয়ে সমালোচনা রয়েছে (রাজউক, ২০২৩; বিশ্বব্যাংক, ২০০৭)। একইভাবে রাজধানীর দীর্ঘমেয়াদি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প ১৯৯৫ সালে গ্রহণ করা হয়, যেখানে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি প্লট পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম পরিকল্পিত নতুন শহর প্রকল্প হলেও ভূমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্লট হস্তান্তরে দীর্ঘসূত্রতার কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রত্যাশিত গতিতে এগোয়নি (রাজউক, ২০২৩; ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান, ২০২২-২০৩৫)। এছাড়া ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প (২০১০) মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য ফ্ল্যাটভিত্তিক আবাসনের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হলেও বাস্তবায়নের ধীরগতি এবং চাহিদার তুলনায় সীমিত সরবরাহ এর কার্যকরতা কমিয়ে দিয়েছে (রাজউক, ২০২৩)।

অন্যদিকে, নিম্নআয়ের ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর আবাসন নিশ্চিত করতে সরকার আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-বর্তমান) বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষাধিক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর প্রদান করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক পুনর্বাসন কর্মসূচি হিসেবে স্বীকৃত। তবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবিকার টেকসই ব্যবস্থা এবং পুনর্বাসিত পরিবারের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আশ্রায়ন প্রকল্প; পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ)।[৭] একই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে গৃহায়ন তহবিল ও স্বল্পমূল্যের আবাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও সীমিত অর্থায়ন, পর্যাপ্ত জমির অভাব এবং চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম সরবরাহের কারণে এসব উদ্যোগ সাধারণ মানুষের আবাসন সংকট উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সক্ষম হয়নি (জাতীয় গৃহায়ন নীতি, ২০১৬)।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকার বিভিন্ন আয়-শ্রেণির জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করলেও দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শহরায়নের ক্রমাগত চাপের ফলে এসব সরকারি উদ্যোগের চ্যালেঞ্জও বাড়তে থাকে। বিশেষত, শহরাঞ্চলে দ্রুত বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদা পূরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতিভাত হয়। এছাড়া ১৯৫০-এর দশক থেকে সরকার ধানমণ্ডি,

[৫] উদাহরণস্বরূপ, 'আশ্রয়ন প্রকল্প' (গৃহহীন পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের জন্য), 'ঘরে ফেরা কর্মসূচি' (শহর থেকে গ্রামে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের জন্য) ইত্যাদি।
[৬] বাংলাপিডিয়া, https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE (১৭ জুলাই ২০২৬)।
[৭] https://ashrayanpmo.gov.bd/sites/default/files/files/ashrayanpmo.portal.gov.bd/publications; https://dss.gov.bd/pages/static-pages/6922e025933eb65569e25b11 (১৭ জুলাই ২০২৬)।

মোহাম্মদপুর, মিরপুর, গুলশান, বনানী, উত্তরা ও পূর্বাচলের মতো একাধিক পরিকল্পিত আবাসন কর্মসূচি গ্রহণ করলেও এগুলোর অধিকাংশই মধ্য ও উচ্চ আয়ের জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক ছিল। দ্রুত নগরায়ন, সীমিত সরকারি বিনিয়োগ, বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা এবং ক্রমবর্ধমান আবাসন চাহিদার ফলে সাধারণ মানুষের আবাসন সংকট পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে বেসরকারি রিয়েল এস্টেট খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হলেও একই সঙ্গে সুশাসন, জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত নতুন চ্যালেঞ্জেরও উদ্ভব ঘটে।

ধারণা করা হয়, ২০৫০ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৮.৪% মানুষ নগরবাসী হবে (বিবিএস, ২০২২; ইসলাম প্রমুখ, ২০২২)। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৩১.৬৬% শহরাঞ্চলে বসবাস করছে এবং ঢাকা বিভাগের শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের হার সর্বাধিক (৪৬.৯%) (বিবিএস, ২০২২)।[৮] বর্তমানে ঢাকা শহরের মোট জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি।[৯] জনসংখ্যা বিচারে ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ও বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ঘনবসতিপূর্ণ শহর, বিগত এক বছর ধরে ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি – ৩% (ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ, ২০২৫)। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৭০০ জন মানুষ ঢাকায় আসে, এবং এই হিসাবে প্রতিবছর প্রায় ছয় লক্ষ মানুষ ঢাকা শহরে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু বাড়তি চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে শহর এলাকায় আবাসন সুবিধা বাড়ছে না।[১০] উদাহরণস্বরূপ, শুধু ঢাকা শহরেই জনসংখ্যার অনুপাতে বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার আবাসনের চাহিদা রয়েছে, যার মাত্র ২০% পূরণ সম্ভব হচ্ছে।[১১] এ শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার ২৫%-৩০% এর আনুষ্ঠানিক আবাসনের সুযোগ নেই, যা মানসম্মত আবাসনের সংকটের চিত্র তুলে ধরে।[১২] ঢাকা শহরে প্রায় ৯০% মানুষ ভাড়া বাসায় অনেকটা 'আধুনিক যাযাবর'-এর মতো থাকেন।[১৩] কিন্তু বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯১-এর যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় নিয়ন্ত্রণহীণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বাড়ি ভাড়া।[১৪] ভোক্তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিগত ২৫ বছরে ঢাকা শহরে বাসা ভাড়া বেড়েছে প্রায় ৪০০%।[১৫] এ শহরের ভাড়াটিয়াদের আয়ের প্রায় ৫১.৭% খরচ হয় বাড়িভাড়া পরিশোধে।[১৬] আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, নগরীতে বসবাসকারী শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের আয়ের ৬০% বেশি বাড়িভাড়া বাবদ ব্যয় করতে হয়। এই ক্রমবর্ধমান বাড়িভাড়ার বোঝা সামলাতে গিয়ে ঢাকা শহরে বসবাসকারী প্রায় ৮০% ভাড়াটিয়ার কাছে নিজ বাড়ি বা স্থায়ী আবাসনের স্বপ্ন অধরা থেকে যায়।[১৭] ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী সরকারি খাতের আবাসন সরবরাহ খুবই সীমিত হওয়ার কারণে নগরবাসীকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বেসরকারি আবাসন খাতের ওপর নির্ভর করতে হয় (ন্যান্সি, ২০০৪)। ফলে বেসরকারি রিয়েল এস্টেট খাত একটি বিকল্প ও বর্ধনশীল খাত হিসেবে গড়ে উঠেছে (ন্যান্সি, ২০০৪; রাজউক, ২০১৫; রিহ্যাব, ২০২০)।

প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং অবকাঠামো সুবিধাসহ আবাসন প্রদানে দেশের বেসরকারি আবাসন খাত একটি প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করছে (ন্যান্সি, ২০০৪)। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) তথ্যমতে, ২০১২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়ে আবাসন

[৮] শুধু ঢাকা বিভাগে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৬.৮% বসবাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে (১.৭৪%)।

[৯] *কালের কণ্ঠ*, 'রাজধানীর ৭২% মানুষ থাকেন ভাড়া বাড়িতে', ২৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/online/dhaka/2025/04/29/1510763 (১৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০] এখানে "আবাসন সুবিধা" বলতে নিরাপদ, টেকসই ও মানসম্মত বাসস্থান প্রাপ্তি, পর্যাপ্ত বাসযোগ্য স্থান, মৌলিক নাগরিক সেবা (যেমন পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) এর প্রাপ্যতা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে বাসস্থানের সুযোগকে বোঝানো হয়েছে।

[১১] *যুগান্তর*, 'বাড়ি ভাড়ার চাপে চ্যাপ্টা ভাড়াটিয়া', ২১ জানুয়ারি ২০১০, https://www.jugantor.com/tp-protimoncho/269378 (১৪ আগস্ট ২০২৫)।

[১২] *জাগো নিউজ২৪.কম*, 'ঢাকার আবাসন সংকট এবং উত্তরণের পথ', ১২ মে ২০২৫, https://www.jagonews24.com/opinion/article/1021196 (১৪ আগস্ট ২০২৫)।

[১৩] *রূপান্তর*, '২০২৯ সালে সংকটে পড়বে ৩ কোটি নগরবাসী', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, https://www.deshrupantor.com/121373/২০২৯-সালে-সংকটে-পড়বে-৩-কোটি-নগরবাসী (১৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১৪] ১৯৯১ সালের বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনে ভাড়াটিয়া হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এই আইন অনুযায়ী, কোনো বাড়ির ভাড়া মানসম্মত ভাড়ার অধিক ভাড়া কোনোভাবেই আদায়যোগ্য হবে না। দুই বছর আগে ভাড়া বাড়ানো যায় না। যাবে না জামানত নেওয়াও। এর জন্য ভাড়াটিয়া ও মালিকপক্ষকে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়। অর্থাৎ এই আইনে আইনে বাড়িভাড়া কেমন হবে, ভাড়া বৃদ্ধি হার, বাড়ি থেকে উচ্ছেদ, অগ্রিম জামানত গ্রহণ, ভাড়ার রসিদ প্রদান, লিখিত চুক্তি, বাসযোগ্য বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া রয়েছে।

[১৫] *ঢাকা পোস্ট*, 'বাসা ভাড়ার বাড়তি চাপে চ্যাপ্টা ভাড়াটিয়ারা', ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/343232 (১৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১৬] ঢাকার ২৭% ভাড়াটিয়া আয়েল প্রায় ৩০%, ৫৭% ভাড়াটিয়া প্রায় ৫০%, ১২% ভাড়াটিয়া আয়ের প্রায় ৭৫% ব্যয় করেন বাসা ভাড়া পরিশোধে। সূত্র: *প্রাগুক্ত*।

[১৭] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'বাড়ির স্বপ্ন অধরা থেকে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের: দুই দশকে ঢাকায় জমির দাম বেড়েছে ২৭০০%', ৩ অক্টোবর ২০২২, https://www.tbsnews.net/bangla/অর্থনীতি/news-details-113270 (১৪ আগস্ট ২০২৫)।

খাতে প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে।[১৮] এ সময়ে বাংলাদেশের শহরগুলোতে রিয়েল এস্টেট খাতের বিনিয়োগ নগর উন্নয়নের এক অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ঢাকা বিভাগে বেশি বিনিয়োগ হয় এবং বিপুল পুঁজি সংস্থানের মাধ্যমে আবাসন পরিকাঠামো ও নগর সম্প্রসারণে এই খাতের প্রভাব সুস্পষ্ট। রাজধানী ঢাকার মতো সব নাগরিক সুবিধাসহ উন্নত জীবনযাপনের জন্য মানুষ এসব আবাসন প্রকল্পে প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয় করতে শুরু করে। ঢাকার বাইরেও রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম ও বাজারের আধিপত্য বিস্তার সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট খাত তিন শতাধিক ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ বা সহযোগী শিল্পের[১৯] মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।[২০] পাশাপাশি এ সময়পর্বে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রিয়েল এস্টেট খাতকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত করেছে, যার ওপর বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল (ইসলাম, ২০২৪)।[২১]

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

১৮৬৪ সালে ঢাকা পৌরসভা ঘোষণার পর থেকে বিভিন্ন সময় নগর পরিকল্পনার উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি।[২২] ১৯১৭ সালে স্যার প্যাট্রিক গেডেসের নেতৃত্বে Report on Town Planning, Dacca প্রকাশিত হয় এবং ঢাকার জন্য ভৌত পরিকল্পনা প্রস্তুতের কমিশন গঠন করা হয়, যা ছিল ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়নের জন্য একটি দিকনির্দেশক পরিকল্পনা (গেডেস, ১৯১৭)।[২৩] তবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরের সম্প্রসারণ অধিকাংশ সময়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বিশদ পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটেছে (খান, ২০১৮)।[২৪] এরপর ১৯৫৯ সালে ঢাকা, ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম, ১৯৬৬ সালে খুলনা এবং ১৯৮৪ সালে রাজশাহী শহরের জন্য ২০ বছর মেয়াদি মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হয়। কিন্তু স্যার প্যাট্রিক গেডেসের ১৯১৭ সালের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পরবর্তী মাস্টারপ্ল্যানগুলো আংশিক বাস্তবায়িত হলেও ১৯৯৭-২০১০ এবং ২০১০ সালের ড্যাপও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।[২৫] বর্তমানে ২০২২-২০৩৫ সালের

---

[১৮] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'দ্রুত নগরায়ণে জেলা ও মফস্বল শহরে বাড়ছে আবাসন ব্যবসার পরিসর', ২৫ এপ্রিল ২০২২, https://www.tbsnews.net/bangla/অর্থনীতি/news-details-91222 (১৪ আগস্ট ২০২৫)।

[১৯] ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্পের মধ্যে রেয়েছে - ২৭টি কনস্ট্রাকশন সামগ্রী খাত, ৪৩টি বাথ ও কিচেন ফিটিংস পণ্যসামগ্রী ও সরবরাহকারী খাত, ৪৪টি ইলেকট্রিক্যাল, ৪৪টি ফার্নিচার, ১৮টি সাফেচ ফার্নিশিংসহ আরও অনেক ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ খাত।

[২০] *কালের কণ্ঠ*, 'অর্থনৈতিক সংকটে আবাসনশিল্পে বিপর্যয়, ঝুঁকিতে ৪৫৮ উপখাত', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/online/business/2024/09/08/1423318 (১৬ আগস্ট ২০২৬); *ডেইলি সান*, 'আবাসনশিল্পে বিপর্যয়, বন্ধের হুমকিতে সংশ্লিষ্ঠ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান', ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.daily-sun.com/bangla/post/5354 (১৬ আগস্ট ২০২৫); *ডেইলি সান*, 'আবাসন খাতে দুঃসময়: নির্মাণ ও শিল্প খাতজুড়েই স্থবিরতা', ০৯ আগস্ট ২০২৫, https://www.daily-sun.com/bangla/post/18412 (১৬ আগস্ট ২০২৫)। ১৮টি খাতে বিভক্ত এবং ৪৫৮টি উপখাতে বিস্তৃত এই খাতটি দেশের একটি বৃহৎ ও কর্মসংস্থাননির্ভর খাতে পরিণত হয়েছে। উপখাতসমূহ হলো- রড, সিমেন্ট, রেডিমিক্স, ইট, পাথরসহ ১১টি উপখাত নিয়ে সিভিল খাত। ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার, সুইচ-সকেট, মিটার, লাইট মিলিয়ে ৩০টি উপখাতের ইলেকট্রিক খাত। উড, দরজা, লকসহ ২৫টি উপখাত নিয়ে উড খাত। পাইপ, গ্যাস, ট্যাব, ফিটিংস, ওয়াটার পাম্প নিয়ে ২০টি উপখাতের প্লাম্বিং খাত। বিভিন্ন প্রকারের টাইলস, মার্বেল, স্টোন, মোজাইক চিপস ইত্যাদি ১৩টি উপখাত নিয়ে টাইলস খাত। কমোড, বেসিন, বাথট্যাব, হ্যান্ড শোয়ার, কানেকশন পাইপ, গ্রেটিংসহ ৩৩টি উপখাত নিয়ে স্যানিটারি খাত। পেইন্ট, ফোম ল্যাব, বুস্ন অ্যান্ড পোলিশ নিয়ে ৬টি উপখাতের পেইন্ট খাত। সুরকি, কেমিক্যাল, অ্যাডমিক্সার, স্টোনসহ ৬টি উপখাত। ফ্লোর ব্রোম, হেয়ার ব্রুশ, সেফটি নেট, রয়েল প্লাগ, প্লামব্রুশ, হস পাইপ, প্যাড লক, মাসকিন ট্যাব ইত্যাদি ৯৭টি উপখাত নিয়ে হার্ডওয়্যার খাত। লিফট, সাব-স্টেশন, সোলার সিস্টেম, জেনারেটর, ইন্টারকমসহ ১৮টি উপখাতের ইলেকট্রিক খাত। অ্যালুমিনিয়াম, গ্রিল, ফায়ার ডোর, স্টিল অবকাঠামো, স্কাই লাইট, এলপিজি সিস্টেম, সুইমিংপুল ইত্যাদি নিয়ে ৬৪টি উপখাতের সাব-কন্ট্রাক্ট খাত। এক্সকেভেটর, লিট ট্রাক, রোড রোলার মেশিন, বুলডুজার, ডাম্প ট্রাকস, পাইপ ড্রাইভিং মেশিনসহ ১৯টি উপখাতের কনস্ট্রাকশন মেশিনারিজ খাত। সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, স্যানিটারি, টাইলস, পেইন্টম সয়েল টেস্ট, পাইল ওয়ার্ক নিয়ে ২৬টি উপখাতের শ্রম খাত। এ ছাড়াও ভূমি উন্নয়ন, প্রশাসনিক, হোম এপ্লিক্যান্স ও অফিস স্টেশনারি খাতে আরও ৯০টি উপখাত জড়িত আবাসনশিল্পের সঙ্গে।

[২১] বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতে সরাসরি ৫০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। বিভিন্ন আবাসন কোম্পানিগুলোতে প্রায় ২০,০০০ নির্মাণকাজ ব্যবস্থাপক, ১০,০০০ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী, ৩০০০ স্নাতক প্রকৌশলী এবং প্রায় ৫০০ স্থপতি নিয়োজিত আছে। অর্থাৎ বেসরকারি আবাসন খাত শুধু আবাসনই সরবরাহ করছে না, একইসঙ্গে এই খাতে ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রায় ২ কোটি মানুষ নির্ভরশীল।

[২২] *দি ডেইলি স্টার*, 'Dhaka before and after Partition', ২ ডিসেম্বর ২০২২, https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/dhaka-and-after-partition-3185521 (১৭ আগস্ট ২০২৫)।

[২৩] *দি ডেইলি স্টার*, 'Implementation of Dhaka City Master Plan', ২ ডিসেম্বর ২০২২, https://archive.thedailystar.net/suppliments/2010/02/ds19/segment1/plan.htm (১৭ আগস্ট ২০২৫)।

[২৪] *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'Dhaka: Four centuries of uncontrolled growth', ০২ অক্টোবর ২০১৭, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/127088/dhaka-four-centuries-of-uncontrolled-growth (১৭ আগস্ট ২০২৫)।

[২৫] *ডয়চে ভেলে*, 'নগর পরিকল্পনা শুধুই নগরের নয়', ১৯ মার্চ ১৯ ২০১৮, https://www.dw.com/bn/নগর-পরিকল্পনা-শুধুই-নগরের-নয়/a-43019385 (১৭ আগস্ট ২০২৫)। ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশী পরিকল্পনাবিদদের সম্পৃক্ত করে ঢাকা মহানগর বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা বা ড্যাপ (Detailed Area Plan) তৈরি করা হয়, যা বাস্তবায়ন করা যায়নি।

নতুন ড্যাপ প্রণয়ন করা হলেও এটি নিয়ে পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি , রিহ্যাব ও আবাসন ব্যবসায়ীদের মধ্যে মতবিরোধ ও সমালোচনা রয়েছে, ফলে এর বাস্তবায়ন অনিশ্চিত।[২৬] একইসঙ্গে নগরায়নে বাণিজ্যিক স্বার্থ, নীতিগত বৈষম্য, পেশাজীবীদের মতামত উপেক্ষা এবং সমন্বয়ের অভাবের কারণে ঢাকায় অপরিকল্পিত আবাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পরিবেশ ও বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।[২৭] ফলে বিশ্বে ঢাকার বসবাসযোগ্যতার অবস্থান নিম্নমুখী।[২৮] সম্প্রতি একটি জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বের ১৪৭টি বসবাসযোগ্য নগরীর ভিতরে ঢাকার অবস্থান ১৪৩, যা মূলত ঢাকার অবসবাসযোগ্যতাকেই চিহ্নিত করে।[২৯]

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের অবস্থা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। ঢাকা শহরের পরিকল্পিত উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইতোপূর্বে ২০০৬ সালে টিআইবি থেকে রাজউকের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় ইমারত নির্মাণ সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ২০২০ সালে রাজউকের ওপর পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় রাজউকের সেবা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সুশাসনের দুর্বলতার বিষয়টি উঠে আসে। ২০২২ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর পরিচালিত গবেষণায় সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্প ও আবাসনের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর বেশ কিছু বিধি লঙ্ঘিত হওয়ার বিষয়ও চিহ্নিত হয়। এছাড়া বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ওপর প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশিত খবরে প্রতারণা, রাজনৈতিক, ক্ষমতার আধিপত্য ও অপব্যবহার, আইন লঙ্ঘন, জমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ঘটনা উল্লেখ করা হয় (আলম, ২০১৮; আরেফিন, ২০১৯; হক, ২০১২; খান, ২০২০; লামার্কা প্রমুখ, ২০২১)। তবে উল্লিখিত গবেষণায় আবাসন খাতে সুশাসনের বিভিন্ন ঘাটতি চিহ্নিত হলেও এখন পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে এ খাতে বিস্তারিত গবেষণা অপ্রতুল।

এই প্রেক্ষাপটে বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ গভীরভাবে অনুধাবন করা এবং বিদ্যমান কাঠামোর সমীবদ্ধতা চিহ্নিত করে নীতিগত সুপারিশ প্রদান করা জরুরি, যা কেবল খাতটির সুষ্ঠু ও দায়িত্বশীল বিকাশে অবদান রাখবে না, বরং নগরায়ণ প্রক্রিয়াকে টেকসই ধারায় পরিচালিত করতেও সহায়ক হবে। বর্তমান গবেষণাটি বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন খাতের অন্তর্নিহিত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করেছে, যা এই খাতে সুশাসনের ভিত্তি সদৃঢ় করতে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করার পাশাপাশি এই খাতে সুশাসন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি পূরণ করতে সহায়ক হবে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ঢাকা শহরে বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা;

---

[২৬] পরিকল্পনাবিদরা মনে করেন রাজউক ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ড্যাপ সংশোধনের ব্যাপারে পরিকল্পনাবিদদের মতামতকে অগ্রাহ্য করছে এবং এই প্রবণতা নগরকে নাগরিকদের হাত থেকে বেহাত করে এবং নগর ব্যবসায়ীদের পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সূত্র: *দি ডেইলি স্টার*, 'Detailed Area Plan, to what end?', ২৮ এপ্রিল ২০২৫, https://www.thedailystar.net/business/news/debate-over-detailed-area-plan-3882016 (১৭ আগস্ট ২০২৫); স্থপতিদের মতে, ড্যাপ (২০২২-২০৩৫) বাতিল নয় বরং সংশোধনই এর সমাধান। তাছাড়া ঢাকাকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য ড্যাপ যে ধারণা দিয়েছে তা একেবারে অযৌক্তিক নয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান। সূত্র: *বাংলা ট্রিবিউন*, 'রাজউকের 'ড্যাপ' বাতিল নাকি সংশোধন', ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/others/864133/রাজউকের-'ড্যাপ'-বাতিল-নাকি-সংশোধন (১৭ আগস্ট ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ড্যাপ বাতিল চায় রিহ্যাব', ২১ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/rn0u70ki2r (১৭ আগস্ট ২০২৫); *যুগান্তর*, 'ড্যাপ সংশোধনের প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে', ১৮ মার্চ ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/930936 (১৭ আগস্ট ২০২৫); *এনটিভি অনলাইন*, 'আবাসন ব্যবসা বাচাতে আরও বসবাস অযোগ্য হয়ে উঠবে ঢাকা?', ১০ আগস্ট ২০২৫, https://www.ntvbd.com/bangladesh/news-1601157?amp (১৭ আগস্ট ২০২৫)।

[২৭] *ডয়চে ভেলে*, 'নগর পরিকল্পনা শুধুই নগরের নয়', ১৯ মার্চ ২০১৮, https://www.dw.com/bn/নগর-পরিকল্পনা-শুধুই-নগরের-নয়/a-43019385 (১৭ আগস্ট ২০২৫)।

[২৮] ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চল জুড়ে সমন্বিত নগর উন্নয়ন কাঠামোর প্রত্যাশিত সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের ধারা বৃদ্ধিকে একটি স্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ২০২২-২০৩৫ জন্য নতুন ড্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে, যার লক্ষ্য ঢাকার ভবিষ্যৎ নগরায়ণকে একটি স্থায়ী কাঠামোতে রূপ দেওয়া, জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ এবং অবকাঠামোগত ভারসাম্য রক্ষা করা।

[২৯] *যুগান্তর*, 'ড্যাপ সংশোধনের প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে', ১৮ মার্চ ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/930936 (১৭ আগস্ট ২০২৫)।

২. এ খাতে নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় জড়িত অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা;
৩. বেসরকারি আবাসন খাতে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন এবং কারণ চিহ্নিত করা; এবং
৪. এ খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.৪ গবেষণার পরিধি

রিয়েল এস্টেট কার্যক্রমের ধরন বিবেচনায় রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কোম্পানির শ্রেণি বিভাগ, গবেষণার প্রেক্ষাপট, গবেষণার সমস্যা ও গবেষণার উদ্দেশ্য বিবেচনায় এই গবেষণার পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নের চিত্রে বর্তমান গবেষণার পরিধি তুলে ধরা হলো:

চিত্র ১. ১: গবেষণার পরিধি

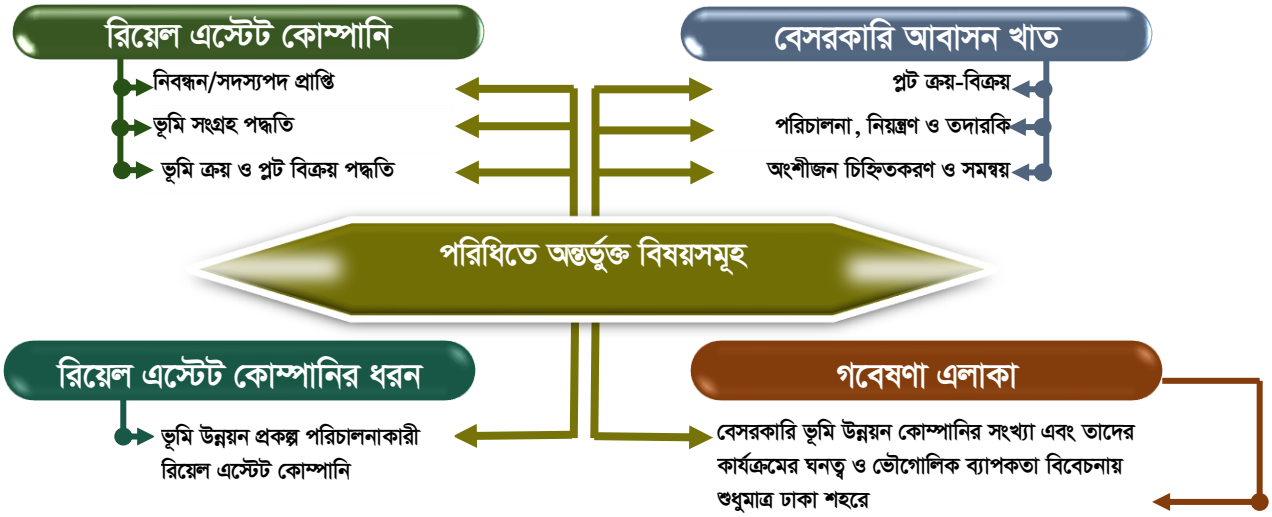

গবেষণাটি বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর পরিচালিত হয়েছে, যেখানে গবেষণার পরিধি বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন কোম্পানির সংখ্যা এবং তাদের কার্যক্রমের ঘনত্ব ও ভৌগোলিক ব্যাপকতা বিবেচনায় শুধু ঢাকা শহরে বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনাকারী রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। গবেষণায় এসব কোম্পানির নিবন্ধন ও সদস্যপদ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া, ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি সংগ্রহ ও ক্রয় পদ্ধতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্লট বিক্রয়-সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি আবাসন খাতের প্লট ক্রয়-বিক্রয়, খাত পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থা, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা ও পারস্পরিক সমন্বয়-সংক্রান্ত বিষয়গুলোও গবেষণার আওতাভুক্ত। উল্লেখ্য, সরকারি জমির ওপর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত আবাসন প্রকল্প এবং সরকারি জমিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত অন্যান্য ভূমি উন্নয়ন উদ্যোগ এ গবেষণার পরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়।

চিত্র ১. ২: গবেষণা এলাকা - ঢাকা শহর

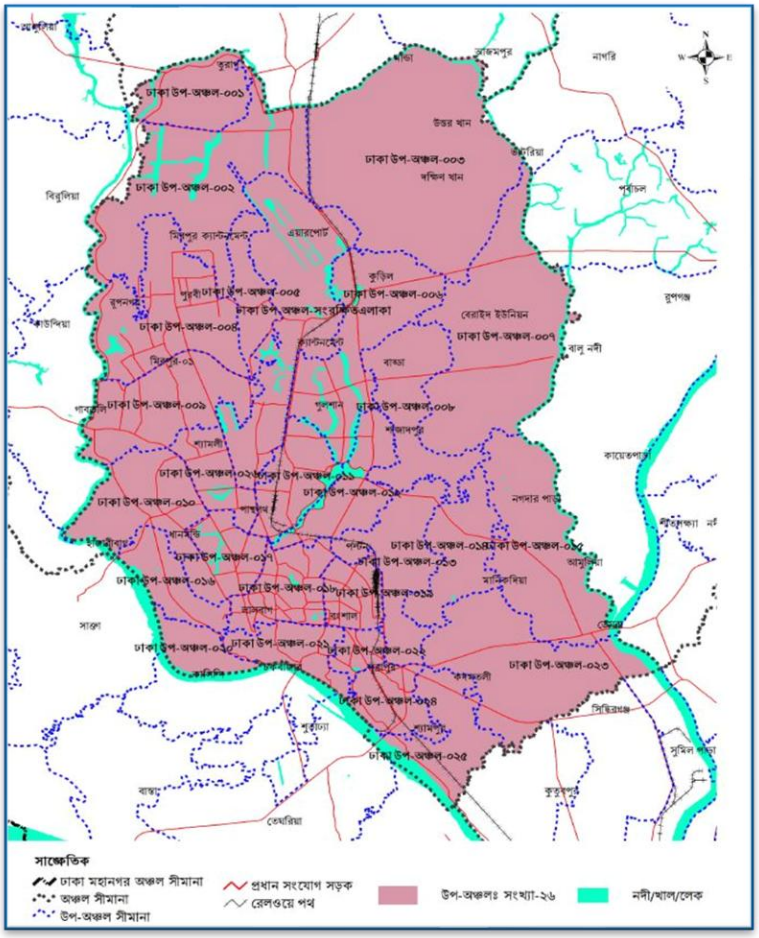

সূত্র: বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০২২-২০৩৫) (২য় খন্ড)।

গবেষণাটি মূলত বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারটি প্রধান অংশীজন এবং তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ারকে কেন্দ্র করে গঠিত – রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, প্লট ক্রেতা, মূল জমির মালিক এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ। এছাড়া এই গবেষণায় বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন খাতের সামগ্রিক চিত্র বিশ্লেষণের জন্য আইনি কাঠামো, সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের ভূমিকা ও তাদের সমন্বয়, এবং নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির কার্যকরতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে কোম্পানিগুলোর নিবন্ধন প্রক্রিয়া, বাধ্যবাধকতা, প্রতিবন্ধকতা ও সদস্যপদ, ভূমি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, মূল্য নির্ধারণ, চুক্তি ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া, এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ভূমি উন্নয়নের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রভাব, যেমন জলাশয় ও খাস জমি ভরাটের প্রবণতা এবং সরকারি আবাসন প্রক্রিয়ার প্রভাবও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, গবেষণাটি আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিকসমূহকে সমন্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

১.৫ গবেষণাপদ্ধতি

সমস্যার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় এটি একটি নির্ণায়ক গবেষণা বা সমস্যা-নির্ণয়কমূলক গবেষণা (Diagnostic Research)। বর্তমান গবেষণায় গুণবাচক গবেষণাপদ্ধতি (Qualitative Research) ব্যবহার করার পাশাপাশি গুণবাচক গবেষণা নকশা (Qualitative Research Design) ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাখ্যামূলক (Interpretivism) গবেষণা প্যারাডাইম বা দার্শনিক ভিত্তি এবং অভিজ্ঞতামূলক বা আনুভূতিক (Phenomenology) নকশা – এই দুটির ওপর ভিত্তি করে বর্তমান গবেষণায় ব্যাখ্যামূলক আনুভূতিক গবেষণা পদ্ধতি (Interpretive Phenomenological Research Method) ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৫.১ তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় দুটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – প্রাথমিক উৎস ও পরোক্ষ উৎস।

চিত্র ১. ৩: তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

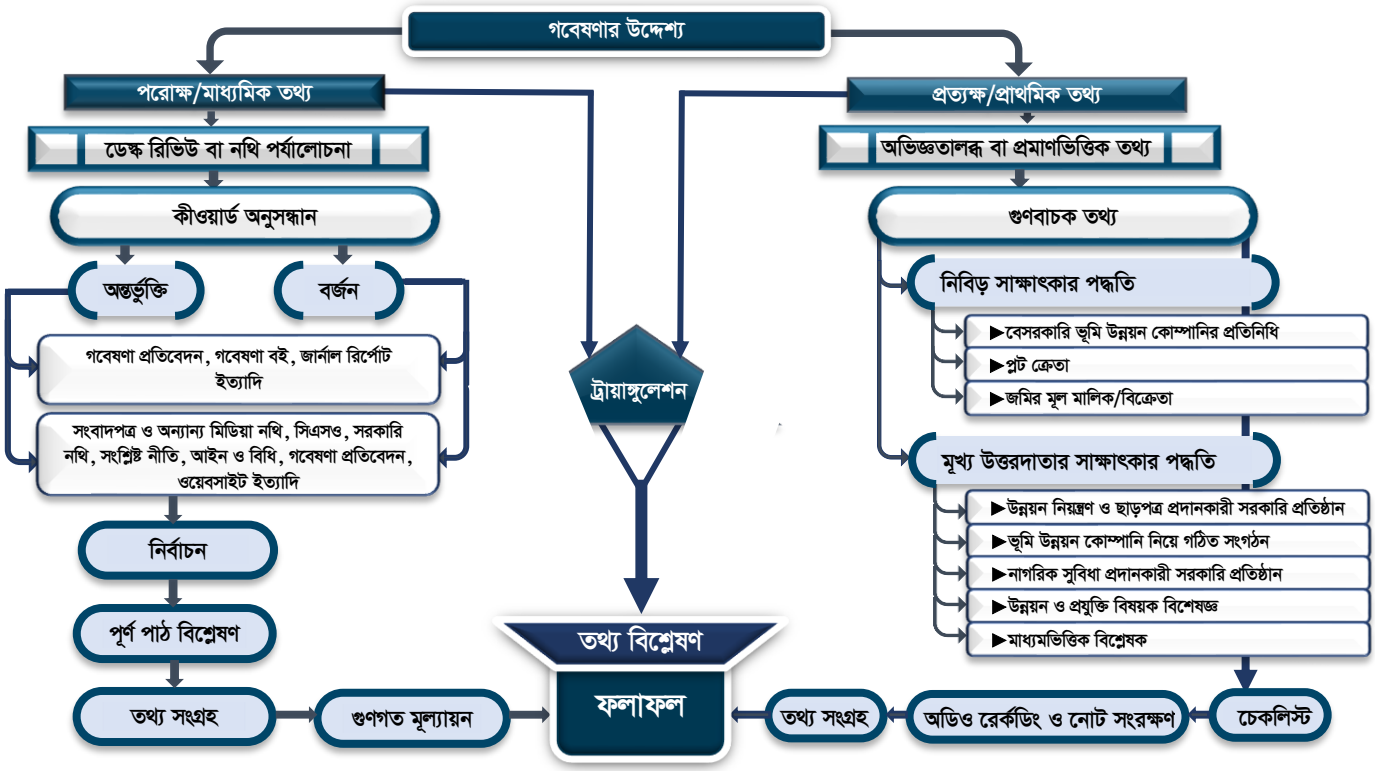

১.৫.২ প্রাথমিক তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহ ও নমুনায়ন পদ্ধতি

মাঠ পর্যায় থেকে গবেষণার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণির তথ্যদাতা বেসরকারি আবাসন খাতের সাথে কোনো না কোনো স্তরে বা ধাপে যুক্ত ও সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

সারণি ১. ১: প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্যদাতা/তথ্যদাতার ধরন এবং নমুনায়ন পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যদাতার ধরন	তথ্যদাতা নির্বাচন পদ্ধতি বা নমুনা কৌশল		তথ্যদাতার সংখ্যা নির্ধারণ পদ্ধতি
নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (IDI)	• রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রতিনিধি • প্লট ক্রেতা • ভূমির মূল মালিক/ ভূমি বিক্রেতা	সর্বাধিক বৈচিত্র্যমূলক নমুনায়ন (Maximum Variation Sampling)	মিশ্র লক্ষ্যমাত্রিক বা উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি (Mixed Purposive Sampling Method)	পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি (Data Saturation)
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (KII)	• রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রতিনিধি			
	• ভূমি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন ছাড়পত্র প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান (রাজউক, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ) • রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংগঠন (রিহ্যাব, বিএলডিএ) • নগর স্থানীয় সরকার ও জনসেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন)	বিশেষজ্ঞ নমুনায়ন (Expert Sampling)		

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যদাতার ধরন	তথ্যদাতা নির্বাচন পদ্ধতি বা নমুনা কৌশল		তথ্যদাতার সংখ্যা নির্ধারণ পদ্ধতি
	• **বেসরকারি আবাসন প্রকল্প এলাকায় ইউটিলিটি সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান** (ওয়াসা, ডিপিডিসি, ডেসকো) • **বিশেষজ্ঞ** (প্রকৌশলী, নকশাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) • **মাধ্যমভিত্তিক বিশ্লেষক** (সংবাদমাধ্যম কর্মী)			

বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে – নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (In-Depth Interview-IDI) এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Key-Informant Interview-KII)। এছাড়া নিয়মতান্ত্রিকভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তথ্যদাতার ধরন অনুযায়ী পৃথকভাবে সুসংহত ও কাঠামোবদ্ধ চেকলিস্ট প্রস্তুত করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য নোটবুক ব্যবহার করা হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে তথ্যদাতার অনুমতিসাপেক্ষে অডিও রেকর্ড করা হয়েছে, যাতে তথ্যের নির্ভুলতা ও গবেষণার মান বজায় থাকে।

সার্বিকভাবে বর্তমান গবেষণায় তথ্যদাতা নির্বাচনে মিশ্র লক্ষ্যমাত্রিক বা উদ্দেশ্যমূলক বা বিচারনির্ভর নমুনায়ন পদ্ধতির (Mixed Purposive Sampling Method/ Mixed Judgmental Sampling) আওতায় সর্বাধিক বৈচিত্র্যমূলক নমুনায়ন (Maximum Variation Sampling) পদ্ধতি এবং বিশেষজ্ঞ নমুনায়ন (Expert Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে বেসরকারি আবাসন খাতের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত পক্ষসমূহের (রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, প্লট ক্রেতা ও জমির মালিক) অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে, অন্যদিকে নীতিনির্ধারক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, খাতসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষকদের অন্তর্দৃষ্টিও সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া তথ্যদাতার উপযুক্ত সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি (Data Saturation) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৫.৩ পরোক্ষ তথ্যের উৎস

বর্তমান গবেষণায় প্রথমে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, বই, জার্নাল, সরকারি নথি, নীতি, আইন, ওয়েবসাইট ও গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন উৎস থেকে নথিপত্র পর্যালোচনা (Desk Review) পদ্ধতিতে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য তিনভাবে ব্যবহার করা হয় – প্রথমত, গবেষণার পটভূমি ও সমস্যা বিশ্লেষণে তাত্ত্বিক ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞান আহরণে; দ্বিতীয়ত, কী-ওয়ার্ড (Keyword) অনুসন্ধান, পূর্ণপাঠ পর্যালোচনা (Full Text Review) এবং অন্তর্ভুক্তি/বর্জন (Inclusion/Exclusion) পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক নথি নির্বাচন করে গুণগত মূল্যায়নের পর বিশ্লেষণে; এবং তৃতীয়ত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্যের সমন্বয়ে ত্রিমুখী যাচাই বা (Data Triangulation) পদ্ধতিতে ফলাফল যাচাই ও উপস্থাপনে। এতে গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা, সম্পূর্ণতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৫.৪ তথ্য সংগ্রহের সময়

গবেষণার পুরো প্রক্রিয়া ২০২৪ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০২৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণায় ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৬ বিশ্লেষণ কাঠামো

গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, ব্যবহার এবং পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুশাসনের ছয়টি নির্দেশক নির্বাচন করা হয়েছে।[৩০]

[৩০] বিশ্বব্যাংক সুশাসন নিরূপণে Worldwide Governance Indicators (WGI) হিসেবে ছয়টি নির্দেশক ব্যবহার করেছে (কাউফম্যান, ক্রে ও মাস্ত্রুজ্জি, ২০১০)। অন্যদিকে ইউএনডিপি ও ইউএনইএসক্যাপ-এর 'সুশাসন' ধারণায় আটটি মূল নির্দেশক বা মূলনীতির (Governance Principles) ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (ইউএনএসক্যাপ, ২০০৯)।

সারণি ১. ২: সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
আইনের শাসন	বিদ্যমান নীতি ও আইনি কাঠামো পর্যালোচনা; আইন প্রতিপালনের ঘাটতি/সীমাবদ্ধতা/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	সংশ্লিষ্ট অংশীজন/প্রতিষ্ঠানের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া; নীতি বাস্তবায়ন; তদারকি প্রক্রিয়া; মানবসম্পদ; কর্ম সম্পাদন ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সক্ষমতা; বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা; সাশ্রয়ী আবাসন
স্বচ্ছতা	নীতিমালা প্রণয়ন/নির্ধারণ প্রক্রিয়া; তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও তথ্যে অভিগম্যতা; ওয়েবসাইট ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবস্থাপনা; প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন; মূল্য নির্ধারণ; আবাসন ব্যবসা পরিচালনা
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও অংশগ্রহণ; ভূমি/প্লট ক্রয়-বিক্রয় এবং মূল্য নির্ধারণ; নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা
জবাবদিহি	অভিযোগ ব্যবস্থাপনা/প্রতিকার ব্যবস্থা; সাড়াদান ও অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া; তদারকি ও নিরীক্ষা
অনিয়ম ও দুর্নীতি	নীতি নির্ধারণ, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন, ভূমি উন্নয়ন এবং প্লট হস্তান্তরে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, কারণ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ; ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও বিতরণ; ছাড়পত্র ও ইউটিলিটি সেবা প্রাপ্তিতে অনিয়ম ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন

এই গবেষণায় সুশাসনের উপরিউক্ত ছয়টি নির্দেশকের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত ও বিশ্লেষণ কাঠামো প্রয়োগ করা হয়েছে, যা রিয়েল এস্টেট খাতের নীতি, প্রক্রিয়া, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকরতা এবং অংশীজন সম্পৃক্ততার সামগ্রিক মূল্যায়ন করে। এ কাঠামোর অধীনে আইনের শাসন নির্দেশক বিদ্যমান নীতি ও আইনি কাঠামোর প্রাসঙ্গিকতা এবং বাস্তবায়ন ঘাটতি পর্যালোচনা করে; স্বচ্ছতা নির্দেশক নীতি নির্ধারণ, তথ্য প্রকাশ, তথ্যে অভিগম্যতা এবং প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নের উন্মুক্ততা মূল্যায়ন করে; অংশগ্রহণ ও সমন্বয় নির্দেশক বিভিন্ন অংশীজনের সম্পৃক্ততা, পারস্পরিক সম্পর্ক, তথ্য ও দায়িত্বের সমন্বয় এবং নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে; জবাবদিহি নির্দেশক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, প্রতিকার, তদারকি ও নিরীক্ষা ব্যবস্থার কার্যকরতা মূল্যায়ন করে; সক্ষমতা ও কার্যকরতা নির্দেশক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, কর্মসম্পাদন, নীতি বাস্তবায়ন ও বিরোধ নিষ্পত্তির সক্ষমতা বিশ্লেষণ করে; এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি নির্দেশক নীতি প্রণয়ন, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন, ভূমি উন্নয়ন ও প্লট হস্তান্তরসহ বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত অনিয়ম, নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন, এর কারণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা অনুসন্ধান করে। সমষ্টিগতভাবে, এই নির্দেশকভিত্তিক কাঠামোটি খাতটির সুশাসনের বিভিন্ন মাত্রা নিরূপণের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, সমন্বয়ের ঘাটতি, কাঠামোগত দুর্বলতা এবং অংশীজনভিত্তিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার একটি সুসংহত বিশ্লেষণাত্মক ভিত্তি প্রদান করে, যা নীতিগত উন্নয়ন ও টেকসই আবাসন খাত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাসঙ্গিক দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম।

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

- প্রথমত, শুধু বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি উন্নয়নের ওপর পরিচালিত হওয়ায় গবেষণাটিতে কেবল ঢাকা শহরে ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনাকারী বেসরকারি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে, ফলে অন্যান্য রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান এর আওতার বাইরে থেকে গেছে এবং সমগ্র খাতের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রতিফলিত হয়নি।
- দ্বিতীয়ত, গবেষণার ভৌগলিক পরিসর কেবল ঢাকা শহরে সীমাবদ্ধ থাকায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাস্তবতা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, যা ফলাফলের সাধারণীকরণে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে।
- তৃতীয়ত, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব), গৃহায়ন ও গণপূর্ত কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভেলপার্স অ্যাসোসিয়েশনসহ (বিএলডিএ) সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কাছ থেকে শ্রেণিবিন্যস্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডারের অভাব কোম্পানির ধরন নির্ধারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ফলে নমুনা নির্বাচন আংশিকভাবে পরোক্ষ তথ্য, অংশীজনের মতামত ও ক্ষেত্রভিত্তিক অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, যা কিছু ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিকতা তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি গবেষণার জন্য নির্বাচিত সকল কোম্পানি গবেষণায় অংশগ্রহণে সম্মত না হওয়ায়

বিভিন্ন শ্রেণির কোম্পানির মধ্যে সমসংখ্যক নমুনা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি, যা তুলনামূলক বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে। বাস্তব প্রতিবন্ধকতা, যেমন তথ্য প্রকাশে অনাগ্রহ, আইনি স্বচ্ছতার অভাব এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভীতি, এসব কারণে অনিবন্ধিত কোম্পানির প্রতিনিধিদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব হয়নি। ফলে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রধানত পরোক্ষ উৎসের ওপর নির্ভর করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

- চতুর্থত, এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল যা গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণে বাধা সৃষ্টি করেছে। এসব প্রতিবন্ধকের মধ্যে অন্যতম অনিয়ম বা দুর্নীতির সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার প্রবণতা, যা সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজউক, রিহ্যাব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে নির্ধারিত ফরম্যাটে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে।[৩১] এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা, সময়সূচি বারবার পরিবর্তন, সাক্ষাৎকার বাতিল ও দপ্তরের ব্যস্ততাজনিত বাধার কারণে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া বিলম্বিত ও বিঘ্নিত হয়েছে।

সার্বিকভাবে, উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাসমূহ গবেষণার ফলাফলের পরিপূর্ণতা, গভীরতা এবং সাধারণীকরণে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে। তবে একাধিক তথ্য উৎসের ব্যবহার এবং ডাটা ট্রায়াঙ্গুলেশন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

১.৮ প্রতিবেদনের কাঠামো

এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার পটভূমি, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, গবেষণার প্রশ্ন, গবেষণাপদ্ধতি ও বিশ্লেষণ কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে খাতটির ঐতিহাসিক বিবর্তন ও কাঠামোগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যা খাতটির কাঠামোগত গতিশীলতা বোঝাতে সহায়তা করে। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের আলোকে মূল ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গবেষণার মূল প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায়। সপ্তম ও শেষ অধ্যায়ে রয়েছে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণভিত্তক সুপারিশের মাধ্যমে বেসরকারি আবাসন খাতের নীতিগত পুনর্গঠন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নপথ নির্দেশিত হয়েছে।

[৩১] শুধু ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) থেকে চাহিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে, তা-ও তথ্য চাওয়ার প্রায় চার মাসেরও অধিক সময় পর। এসব তথ্যও অনেকক্ষেত্রে ছিল সংগতিহীন ও অসম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে রিয়েল এস্টেট খাতের ক্রমবিকাশ ও অংশীজন কাঠামো

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট তথা বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন খাতের ঐতিহাসিক বিবর্তন, গঠনগত রূপান্তর এবং অংশীজন কাঠামোকে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বেসরকারি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ও ডেভেলপারদের প্রকৃতি, ভূমিকা এবং তাদের শ্রেণিবিভাগ, রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর শ্রেণিভিত্তিক কাঠামো, বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট খাতের ক্রমবিকাশ ও সম্প্রসারণের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া অংশীজন কাঠামোর অন্তর্গত বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা, ক্ষমতার বিন্যাস, পারস্পরিক নির্ভরতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা এই খাতের কার্যগত বাস্তবতা ও প্রভাব বিস্তারের ধরনকে স্পষ্ট করে।

২.১ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার এবং এর শ্রেণিবিভাগ

২.১.১ রিয়েল এস্টেট, রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এবং রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার

রিয়েল এস্টেট খাত আধুনিক নগরায়নের একটি কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। 'রিয়েল এস্টেট' (Real Estate) শব্দটি দুটি ভিন্ন উৎস থেকে আগত – "Real" এবং "Estate"। "Real" শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ *res* থেকে, যার অর্থ বাস্তব বা ভৌত অস্তিত্বসম্পন্ন; অন্যদিকে "Estate" শব্দটি মধ্যযুগীয় ফরাসি ও ল্যাটিন উৎস থেকে আগত, যার অর্থ সম্পত্তি বা ভূমির অধিকার। ফলে "Real Estate" বলতে স্থাবর সম্পত্তি, অর্থাৎ ভূমি এবং তার সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত সকল প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানকে বোঝায়। বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে রিয়েল এস্টেট তার স্থিরতা ও একক বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, আর অর্থনৈতিকভাবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদশ্রেণি, যা সম্পদ সঞ্চয়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩২] সাধারণভাবে, রিয়েল এস্টেট বলতে ভূমি ও ভূমির সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত সকল ধরনের নির্মাণ, যেমন আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন, অবকাঠামো, বিনোদনমূলক ও সেবামূলক স্থাপনা বোঝানো হয় (চেন, ২০১৯; আলম ও ইসলাম, ২০১৮)। এছাড়া রিয়েল এস্টেট খাত পণ্য ও ব্যবসা – উভয় দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ (আলম ও ইসলাম, ২০১৮)। এতে সম্পত্তির মালিক, ডেভেলপার, অর্থায়নকারী ও বিপণনকারীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা নির্দিষ্ট সম্পত্তির ওপর আইনগত অধিকার ভোগ করে থাকে (ওয়েইমার, ১৯৮০)।

সাধারণ অর্থে, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বলতে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যারা ভূমি উন্নয়ন ও ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসিক বা বাণিজ্যিক অবকাঠামো গড়ে তোলে এবং তা বাজারজাত করে। এসব প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়ন, ভবন নির্মাণ, বিপণন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে নগরাঞ্চলের আবাসন ও অবকাঠামোগত চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যভাবে বলা যায়, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার হলেন এমন ব্যক্তি বা সংস্থা, যারা জমি ক্রয়, প্রকল্পে বিনিয়োগ, নির্মাণ কার্য সম্পাদন (নিজস্বভাবে বা নির্মাতার মাধ্যমে) এবং পুরো উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা, সমন্বয়, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন (মাইলস, বেরেন্স ও ওয়েইস, ২০০৭)। তাদের দায়িত্বের মধ্যে জমি নির্বাচন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ, অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্পের পূর্ণ বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকে (এমব্যানি রিয়েল এস্টেট, ২০২৪)। অতএব, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারকে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা ও পরিচালনাকারী হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যিনি বিভিন্ন সেবা প্রদানকারীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। সাধারণত তাদের প্রধান ব্যবসায়িক লক্ষ্য উন্নয়নকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন (লুসিয়াস, ২০০১)।

[৩২] বিস্তারিত দেখুন, What is Real Estate? Meaning, Types, Characteristics & Examples, SOBHA, https://www.sobha.com/blog/what-is-real-estate-and-its-types/ (১৪ আগস্ট ২০২৫)।

উল্লেখ্য, রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর ধারা ২(১২) অনুযায়ী 'রিয়েল এস্টেট' বলতে উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আবাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা বাণিজ্যিক প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট অথবা প্রাতিষ্ঠানিক বা মিশ্র ফ্লোর স্পেস জাতীয় স্থাবর ভূ-সম্পত্তিকে বোঝানো হয়েছে।[৩৩] একই আইনের ধারা ২(১৫) অনুযায়ী 'রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা ডেভেলপার' বলতে নিবন্ধিত এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসা পরিচালনায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে।

২.১.২ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোকে সাধারণত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে – (১) বড় আকারের কোম্পানি, (২) মাঝারি আকারের কোম্পানি, এবং (৩) ছোট আকারের কোম্পানি (আলম প্রমুখ, ২০১৮)। তবে উল্লেখ্য, সরকারি কোনো আইন বা নীতিমালায় রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোকে বড়, মাঝারি ও ছোট – এইভাবে বিভাজনের বাধ্যতামূলক কাঠামো নির্ধারিত হয়নি।

অন্যদিকে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কোম্পানির সংজ্ঞা ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের কাজের পরিধিতে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য রয়েছে। সাধারণত এসব প্রতিষ্ঠান ভূমি উন্নয়ন, ভবন নির্মাণ এবং ফ্ল্যাট, প্লট বা বাণিজ্যিক স্পেস উন্নয়ন ও বিপণনের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ধরনের কার্যক্রমগত বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কোম্পানিগুলোকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব, যা তাদের কার্যপ্রণালি ও ভূমিকার পার্থক্যকে আরও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে।

চিত্র ২. ১: কার্যক্রমের ধরন/বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির শ্রেণিবিভাগ

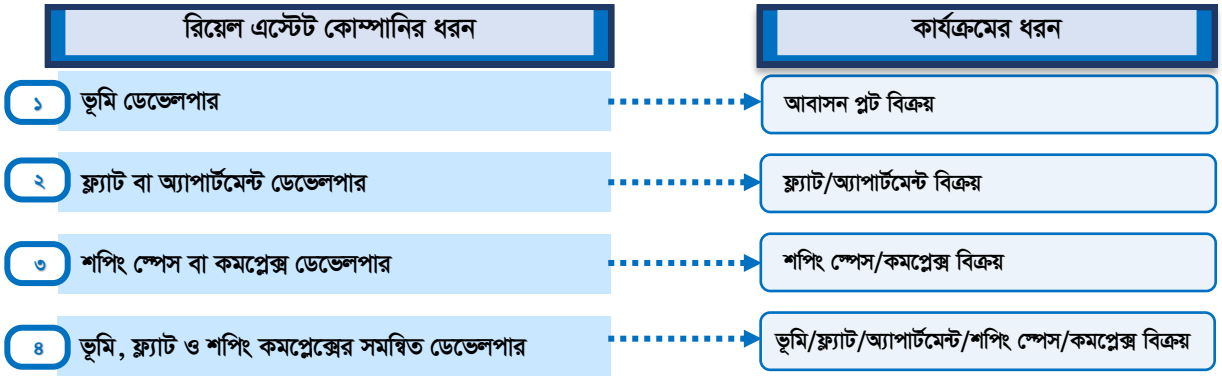

বাংলাদেশে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোকে তাদের কার্যক্রমের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করলে দেখা যায়, কিছু কোম্পানি শুধু নির্দিষ্ট একটি কার্যক্রম, যেমন ভূমি উন্নয়ন বা ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণে নিয়োজিত। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান একইসঙ্গে একাধিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেমন ভূমি উন্নয়ন, ফ্ল্যাট নির্মাণ এবং বাণিজ্যিক স্পেস উন্নয়নসহ সমন্বিত বা মিশ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন।

২.১.৩ বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প

বাংলাদেশে বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০১০ (সংশোধিত ২০১২ ও ২০১৫) এর বিধি ২(ঠ) অনুযায়ী "ভূমি উন্নয়ন" বলতে মহাপরিকল্পনাভুক্ত কোনো নির্ধারিত এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধাসহ আবাসিক উদ্দেশ্যে ভূমির পরিকল্পিত উন্নয়নকে বোঝায় এবং বিধি ২(ঞ) অনুযায়ী "বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প" বলতে কোনো উদ্যোক্তা দ্বারা বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও ইমারত নির্মাণের জন্য গৃহীত প্রকল্পকে বোঝায়।[৩৪] এই ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম বেসরকারি উদ্যোগে নির্দিষ্ট একটি এলাকায় সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়িত হলে তা সাধারণভাবে "বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প" হিসেবে পরিচিতি লাভ

[৩৩] আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, 'রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন)', https://legislativediv.gov.bd/pages/static-pages/694032b835ce18e1c0561243 (১৪ জুলাই ২০২৬)।

[৩৪] রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), 'বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০১০ (সংশোধিত ২০১২ ও ২০১৫)', গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, https://rajuk.gov.bd/pages/static-pages/6922e0df933eb65569e28f3e (১৪ জুলাই ২০২৬)।

করে। এ হিসেবে বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প এমন একটি ভূমি উন্নয়ন উদ্যোগ, যা বেসরকারি ডেভেলপার বা ব্যক্তি দ্বারা প্লট বা ফ্ল্যাট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়, এবং যা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, বিল্ডিং কোড ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী পরিচালিত হতে হয় (রাজউক, ২০১৫)। রিহ্যাবের[৩৫] দৃষ্টিতে বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প বলতে নিবন্ধিত রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও বাজারজাত আবাসন প্রকল্পকে বোঝানো হয়, যা ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে আবাসন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই গড়ে ওঠে (রিহ্যাব, ২০২০)। অন্যদিকে বিএলডিএর "বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবিত নীতিমালা" অনুযায়ী, সরকারি অর্থায়ন ব্যতীত ব্যক্তিগত বা ডেভেলপারদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা যেকোনো আবাসিক ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমকেই বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৩৬]

রিহ্যাব, বিএলডিএ ও রাজউকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মূল পার্থক্য তাদের সংজ্ঞার পরিধি ও দৃষ্টিকোণে নিহিত। রাজউক বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পকে আইন, মহাপরিকল্পনা ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদনভিত্তিক একটি নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে রিহ্যাবের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাতিষ্ঠানিক ডেভেলপারকেন্দ্রিক, যেখানে নিবন্ধিত রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের দ্বারা পরিকল্পিত ও বাজারজাত প্রকল্পকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অপরদিকে, বিএলডিএ তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত সংজ্ঞা প্রদান করে, যেখানে সরকারি অর্থায়ন ছাড়া ব্যক্তি বা ডেভেলপার কর্তৃক পরিচালিত যেকোনো আবাসিক ভূমি উন্নয়নকেই বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প হিসেবে ধরা হয়। ফলে, রাজউক যেখানে পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদনকে প্রাধান্য দেয়, রিহ্যাব সেখানে ব্যবসাকেন্দ্রিক ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং বিএলডিএ বেসরকারি উদ্যোগের বিস্তৃত পরিসরকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে সার্বিকভাবে বলা যায়, বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প হলো পরিকল্পিত ভূমি উন্নয়ন, যা বেসরকারি উদ্যোগে (ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রিয়েল এস্টেট কোম্পানি দ্বারা) পরিচালিত হয়।

২.২ বাংলাদেশে বেসরকারি আবাসন খাতের ক্রমবিকাশ

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজনের পর ঢাকা শহরের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, যা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় দ্বিগুণে পৌঁছে গিয়ে শহরের ওপর তীব্র জনসংখ্যাগত চাপ এবং আবাসন সংকটের সৃষ্টি করে।[৩৭] এই দ্রুত নগরায়ণ প্রক্রিয়া মূলত কর্মসংস্থান ও শিক্ষার সুযোগের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরমুখী অভিবাসনের ফলে ত্বরান্বিত হয়, যা নগর আবাসনের চাহিদাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে (আহসান, ১৯৯৬)। সেই সময় বেসরকারি খাতে সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক আবাসন উন্নয়ন কার্যক্রম প্রায় অনুপস্থিত থাকায় সরকারকে পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন ও আবাসন ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৫৩ সালে প্রণীত The Town Improvement Act, 1953 (East Bengal Act) (Act No. XIII of 1953) ঢাকার পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই আইনের আওতায় ১৯৫৬ সালে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডিআইটি) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ঢাকার নগর পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার এবং অবকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।[৩৮] পরবর্তীতে ১৯৫৯ সালে ডিআইটি কর্তৃক প্রণীত প্রথম মাস্টার প্ল্যান ঢাকার নগর উন্নয়নে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে প্রাথমিকভাবে ২২০ বর্গমাইল এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল

[৩৫] ১৯৯১ সালে মাত্র ১১ জন সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দেশের রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের একমাত্র জাতীয় বাণিজ্য সংগঠন, যার লক্ষ্য বেসরকারি আবাসন খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংগঠিত করা। বর্তমানে এটি দেশের প্রধান ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেভেলপারদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর "এ" শ্রেণির সদস্য হিসেবে আবাসন খাতের স্বার্থ সংরক্ষণ, নীতিনির্ধারণে মতামত প্রদান এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া রিহ্যাব নিয়মিত হাউজিং ফেয়ার আয়োজনের মাধ্যমে ডেভেলপার, বিনিয়োগকারী ও ক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং দেশ-বিদেশে আবাসন খাতের সম্প্রসারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

[৩৬] দেশের বেসরকারি ভূমি উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন। ২০০৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৪-এর অধীনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টরেট অব ট্রেড অর্গানাইজেশনে (ডিটিও) নিবন্ধিত। এছাড়া এটি এফবিসিসিআই-এর সঙ্গেও সম্পৃক্ত। বর্তমানে বিএলডিএ দেশের অধিকাংশ ভূমি উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা সম্মিলিতভাবে মোট সম্পত্তি উন্নয়নের প্রায় ৮০ শতাংশের জন্য দায়ী। জাতীয় পর্যায়ের এই প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে বিএলডিএ ডেভেলপারদের মতামত ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও নীতিনির্ধারকদের কাছে উপস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে, মানসম্মত আবাসন ও রিয়েল এস্টেট উন্নয়নে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব প্রদানই এর মূল লক্ষ্য।

[৩৭] *কালের কণ্ঠ*, 'ঢাকার জনসংখ্যা', ১১ জুলাই ২০১৮, https://www.kalerkantho.com/print-edition/dhaka-360/2018/07/07/656443 (১১ আগস্ট ২০২৫)।

[৩৮] রাজউক (তারিখবিহীন), *Dhaka Master Plan and Urban Development History*, ঢাকা।

এবং পরবর্তীতে তা ৩২০ বর্গমাইলে সম্প্রসারিত করা হয়।[৩৯] এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ঢাকার নগর কাঠামোকে একটি সুসংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয়।

এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকারি উদ্যোগে ঢাকায় একাধিক পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা শুরু হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানী, মোহাম্মদপুর, মিরপুর এবং পরবর্তীতে উত্তরা মডেল টাউন। এই এলাকাগুলোকে পরিকল্পিত সড়ক নেটওয়ার্ক, জোনিং ব্যবস্থা, নির্ধারিত প্লট সাইজ, এবং আধুনিক অবকাঠামোগত সুবিধার মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়, যা আধুনিক নগর পরিকল্পনার একটি আদর্শ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয় (আহমেদ, ২০১২; রহমান, ২০১০)। এই আবাসিক এলাকাগুলোর উন্নয়ন কেবল আবাসন সংকট নিরসনে সহায়তা করেনি, বরং ঢাকার নগর কাঠামোকে একটি নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত রূপ প্রদান করে, যা পরবর্তীকালে নগর সম্প্রসারণ ও আবাসন ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

এ পর্যায়ে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের সমান্তরাল অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে তৎকালীন East Pakistan Industrial Development Corporation (EPIDC)-কে শিল্প ও আবাসনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য পরিকল্পিত প্লট ও আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড (ইএইচএল) প্রতিষ্ঠিত হয় (চৌধুরী, ২০১৩)। প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়েই কোম্পানিটি ঢাকা মহানগরীতে প্রধানত পরিকল্পিত আবাসন উন্নয়নের মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট খাতে কার্যক্রম বিস্তার করে, যা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণের জন্য স্বল্পমূল্যের আবাসন সরবরাহকারী প্রথম প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি আবাসন খাতের এক অগ্রণী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়।[৪০] তখন প্রতিষ্ঠানটি ঢাকার পল্লবী এলাকায় প্রায় ৯১০ একর (প্রায় ৩.৭ বর্গকিলোমিটার) জমি অধিগ্রহণের পর প্রায় ৭০০টি আবাসিক ইউনিট নির্মাণের মাধ্যমে দেশের প্রথম বৃহৎ আকারের আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের একটি ভিত্তি স্থাপন করে (তালুকদার, ২০১৩; ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড, ২০১৬)। ১৯৭০ সালে পাঁচটি নিবন্ধিত রিয়েল এস্টেট কোম্পানির মাধ্যমে দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে রিয়েল এস্টেট খাতের প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ সূচিত হয়[৪১] (সিরাজ, ২০১২; কুলসুম, ২০২৩)। এসব প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিত ভূমি উন্নয়ন, আবাসন নির্মাণ এবং নগরবাসীর জন্য সংগঠিত আবাসন সুবিধা প্রদান করে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে আবাসন খাতের অগ্রাধিকার মূলত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেখানে সরকার প্রাথমিকভাবে সরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করে। এ সময় বেসরকারি আবাসন খাত তুলনামূলকভাবে সীমিত থাকলেও ধীরে ধীরে এর বিকাশ শুরু হয়, যা পরবর্তীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাতে রূপ নেয় (লাইটক্যাসেল পার্টনারস, ২০১৫)।

১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা দেশব্যাপী উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আবাসন ইউনিট নির্মাণ করে, যার মধ্যে প্রায় ৮,৫০০টি আবাসন ইউনিট, ১৬৩টি ফ্ল্যাট, ১,৬৭৪টি আধা-স্থায়ী বাড়ি এবং ৫,২৪৫টি প্লট অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই প্রকল্পসমূহের প্রায় সবই সরকারি কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়, যা সে সময়কার রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আবাসন নীতির প্রতিফলন নির্দেশ করে। একইসঙ্গে, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯% নগর এলাকায় বসবাস করত, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঢাকামুখী অভিবাসন দ্বারা গঠিত ছিল।[৪২] ক্রমবর্ধমান নগর জনসংখ্যা ও আবাসন চাহিদার তুলনায় সরকারি খাতের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা ১৯৮০-এর দশকে বেসরকারি আবাসন খাতের উল্লেখযোগ্য উত্থানের পথ প্রশস্ত করে। এই সময় থেকে বেসরকারি উদ্যোগসমূহ আবাসন উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে এবং বাজারে তাদের উপস্থিতি দৃশ্যমান হয় (আলম এবং ইসলাম, ২০১৮)।

---

[৩৯] রাজউক, 'রাজউকের ইতিহাস,' https://rajuk.gov.bd/pages/static-pages/6922e122933eb65569e2a6d5 (২৪ মে ২০২১)

[৪০] ১৯৯৩ সালে কোম্পানিটি রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এর কাছে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। কোম্পানিটি ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত প্রসপেক্টাসের মাধ্যমে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার আইপিও সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করে। সূত্র: ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড, https://easternhousing.com/about/ (১১ আগস্ট ২০২৫)।

[৪১] আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক, 'The Real Estate Industry in Bangladesh: Evolution, Trends and Future,' https://anwarlandmark.com/blog/real-estate-industry-in-bangladesh (১১ আগস্ট ২০২৫)।

[৪২] *প্রথম আলো*, 'নগরায়ণের সঙ্গে কলেবর বাড়ছে আবসন শিল্পের', ২৫ জানুয়ারি ২০১৯, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/নগরায়ণের-সঙ্গে-কলেবর-বাড়ছে-আবাসন-শিল্পের (১২ আগস্ট ২০২৫)।

১৯৮০-এর দশকের শুরু থেকেই ঢাকায় রিয়েল এস্টেট খাতের দ্রুত বিকাশ লক্ষ করা যায়, যা বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে (সিরাজ, ২০১২)। আধুনিক আবাসনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বেসরকারি খাত পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যবিত্তের জন্য মানসম্মত ও সাশ্রয়ী আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করে। অধিকন্তু, ১৯৮৫ সাল থেকে এই খাত ঢাকা মহানগরে ২০,০০০-এরও বেশি পরিবারের জন্য আবাসন সুবিধা সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে (সিরাজ, ২০০৩)।

১৯৮৭ সালে ১৯৫৩ সালের ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত ডিআইটি সংশোধিত আইনের মাধ্যমে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (রাজউক) রূপান্তরিত হয়। এর অধিক্ষেত্র সাভার, কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ প্রায় ৫৯০ বর্গমাইল (১৫২৮ বর্গকিলোমিটার) এলাকায় বিস্তৃত হয়। ১৯৮০-এর দশকের শেষভাগে দ্রুত নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসন চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে এ খাতে নতুন নতুন রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রবেশ ঘটে। ১৯৮০ সালে ঢাকা শহরে যেখানে মাত্র পাঁচটি কোম্পানি ছিল, ১৯৮৮ সালের মধ্যে তা ৪২টিতে উন্নীত হয় (সিরাজ, ২০১২)।

১৯৯০-এর দশককে ঢাকার নগরায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত চাহিদার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে।[৪৩] এই সময়ে রাস্তাঘাট, সেতু, হাসপাতাল ও বাণিজ্যিক অবকাঠামোর চাহিদা বৃদ্ধি পেলে নির্মাণ খাতে ব্যাপক উত্থান ঘটে এবং সম্ভাবনাময় এই খাতটি ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা ও সুযোগের কারণে অধিকসংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তা নির্মাণ শিল্পে প্রবেশ করেন।

১৯৯১ সালে দেশের শীর্ষ ১১টি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির উদ্যোগে রিয়েল এস্টেট হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেসরকারি রিয়েল এস্টেট খাতের সংগঠিত বিকাশ শুরু হয়। এই সংগঠন খাতের স্বার্থ সংরক্ষণ, নীতিনির্ধারণে ভূমিকা এবং বাজার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একই সময়ে রাজউকের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হয়, এবং আবাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় সরকারি নীতিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকার বনানী, গুলশান, উত্তরা, মিরপুর ও বারিধারা এলাকায় পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্পের পাশাপাশি মিশ্র-ব্যবহার (Mixed-Use) উন্নয়ন কার্যক্রমও সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৯০-এর দশকে ঢাকায় প্রায় ৫০-৬০টি নতুন রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের আগমন ঘটে (লাইটক্যাসেল পার্টনারস, ২০১৫)। একইসঙ্গে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও এলিট আবাসনের চাহিদা বাড়ায় খাতটি মুক্তবাজার অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিকশিত হয়।

২০০০ সালের মধ্যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংখ্যা প্রায় ২০০-এ উন্নীত হয় (রাজউক, ২০১৫)। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দ্রুত নগরায়ণ, জমির স্বল্পতা এবং ঢাকায় আবাসনের উচ্চ চাহিদার কারণে খাতটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ লাভ করে। পরবর্তীতে ২০০৪-২০০৬ সময়কালে দেশের রিয়েল এস্টেট বাজারে ব্যাপক বিনিয়োগ ও আবাসন সরবরাহে বড় ধরনের উত্থান ঘটে, যা নতুন উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে এবং খাতের প্রবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করে।[৪৪] ২০০৬ সালে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে ২১ জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিএলডিএ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেসরকারি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের জাতীয় পর্যায়ের সংগঠিত প্রতিনিধিত্ব শুরু হয়।[৪৫] তবে ২০০৬-২০০৮ সময়কালে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বাজার সংকোচনের কারণে খাতটি মন্দার সম্মুখীন হয়, ফলে অনেক নতুন ডেভেলপার বাজার থেকে সরে যায়।[৪৬] ২০১১ সালে দেশের নগর জনসংখ্যার প্রায় ৩৪% ঢাকায় কেন্দ্রীভূত ছিল। নগরায়ণের এই উচ্চ মাত্রা ও আবাসন চাহিদার ক্রমবর্ধমান চাপের প্রেক্ষাপটে রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানসমূহ নগর আবাসন সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০৯ থেকে ২০১১ সময়কালে খাতটিতে পুনরায় বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং

[৪৩] *প্রথম আলো*, 'নগরায়ণের সঙ্গে কলেবর বাড়ছে আবাসন শিল্পের', ২৫ জানুয়ারি ২০১৯, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/নগরায়ণের-সঙ্গে-কলেবর-বাড়ছে-আবাসন-শিল্পের (১১ আগস্ট ২০২৫)। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা কলকাতার লোকসংখ্যা অতিক্রম করে যায়। সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী, ঢাকা শহরে ১ কোটি ২ লাখের বেশি মানুষ বসবাস করে (বিবিএস, ২০২২)। তবে ধারণা করা হয় এ সংখ্যা ২ কোটির কাছাকাছি (বিশ্বব্যাংক, ২০১৮)।

[৪৪] উইকিপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*।

[৪৫] বিএলডিএ, https://blda-bd.com/about-us/ (১১ আগস্ট ২০২৫)।

[৪৬] উইকিপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*।

ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমে ইতিবাচক গতি পরিলক্ষিত হয়, ফলে রিয়েল এস্টেট খাত তুলনামূলকভাবে লাভজনক ও সক্রিয় অবস্থানে পৌঁছায়। তবে এই উন্নয়নের ধারাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন কাঠামোগত ও বাজারগত সীমাবদ্ধতার কারণে এর গতি হ্রাস পায়।[৪৭]

২০১২ সালে বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট খাত উল্লেখযোগ্য মন্দার মুখোমুখি হয়, যা ২০১৩ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আরও তীব্র হয়।[৪৮] এর ফলে অনেক ডেভেলপার গ্রাহক আকর্ষণে ব্যর্থ হয় এবং মূল্য হ্রাস সত্ত্বেও চাহিদা কমে যায়; পাশাপাশি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে অনেক বুকিং বাতিল হয়।[৪৯] ২০১৪ সালে দেশে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংখ্যা প্রায় ১৫০০-তে পৌঁছালেও পরবর্তীতে ২০১৬ সাল থেকে খাতটি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হতে শুরু করে (রিহ্যাব, ২০১৪)। একইসঙ্গে এই খাত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে; ২০০০ সালের ২.১% থেকে ২০১৭ সালে শ্রমশক্তির ৫.৫% এই খাতে নিয়োজিত হয় (বিবিএস, ২০১৮)। সরকারি নীতিগত সহায়তা, যেমন ২০১৮ সালে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫% সুদে গৃহঋণ[৫০] এবং ২০১৯ সালে সম্পত্তি নিবন্ধন ব্যয় হ্রাস,[৫১] খাতটির পুনরুদ্ধার ও প্রবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করে।

চাহিদা ক্রমবর্ধমান থাকায় ২০২১ সালে এই খাতে প্রায় ১,৫০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়[৫২] এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক (১০,০০০টির ওপরে) ফ্ল্যাট বিক্রয় হয়।[৫৩] রিহ্যাবের তথ্য অনুযায়ী সেই সময় এই খাতে ৩৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়, যেখানে ২৬৯টি ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ (Backward Linkage) শিল্পও যুক্ত হয়।[৫৪] তখন এই খাত প্রতি বছর সরাসরি সরকারি আয়ে (ভ্যাট, রেজিস্টেশন ফি, ইউটিলিটি ফি ইত্যাদির মাধ্যমে) গড়ে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা যোগ করতে শুরু করে।[৫৫]

২০২২ সালে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কারণে রিয়েল এস্টেট খাতে কিছুটা মন্দা দেখা গেলেও ২০২৩ সাল থেকে শহরাঞ্চলে আবাসনের চাহিদা পুনরায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। গ্রাহকদের মধ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, সাশ্রয়ী মূল্য এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও বাণিজ্যিক সুবিধার সহজপ্রাপ্যতার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। একইসঙ্গে মিশ্র-ব্যবহারের আবাসন, গেটেড কমিউনিটি এবং হাই-রাইজ অ্যাপার্টমেন্টের প্রতি আগ্রহ বাড়ে, যা জমির সীমিত প্রাপ্যতার বাস্তবতায় একটি কার্যকর সমাধান হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া 'ভিশন ২০২১' ও 'ভিশন ২০৪১'-এর মতো সরকারি উন্নয়ন কৌশল রিয়েল এস্টেট খাতকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়ায় খাতটির ধারাবাহিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে।[৫৬]

---

[৪৭] *দি ডেইলি স্টার*, 'Real estate development,' ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, https://www.thedailystar.net/supplements/25th-anniversary-special-part-2/real-estate-development-210862 (১১ আগস্ট ২০২৫)।

[৪৮] উইকিপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*।

[৪৯] *ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি)*, 'Real estate business in Bangladesh is booming again overcoming the brunt of pandemic,' ১৯ আগস্ট ২০২১, https://unb.com.bd/category/Business/real-estate-business-in-bangladesh-is-booming-again-overcoming-the-brunt-of-pandemic/77473 (১১ আগস্ট ২০২৫)।

[৫০] *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'Home loans for government employees at 5% interest from October 1,' ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/government-affairs/156524/home-loans-for-government-employees-at-5%-interest (১১ আগস্ট ২০২৫); *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'Government employees to get home loans with 5% interest rate,' ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮, https://bdnews24.com/economy/government-employees-to-get-home-loans-with-5-interest-rate (১১ আগস্ট ২০২৫)।

[৫১] ২০১৯ সালে সম্পত্তি নিবন্ধনের খরচে স্টাম্প ডিউটি, নিবন্ধন ফি, ভ্যাট এবং স্থানীয় সরকার কর যথাক্রমে ৩% থেকে ১.৫%, ২% থেকে ১%, ৩% থেকে ২% এবং ২% থেকে ১% কমিয়ে আনা হয়।

[৫২] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'Rapid urbanisation boosts housing in district towns,' ২৫ এপ্রিল ২০২২, https://www.tbsnews.net/economy/industry/rapid-urbanisation-boosts-housing-district-towns-409494 (১১ আগস্ট ২০২৫)

[৫৩] *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'Flat sales cross 10,000-mark for the first time,' ২২ ডিসেম্বর ২০২১, https://www.dhakatribune.com/business/real-estate/315240/flat-sales-cross-10-000-mark-for-the-first-time (১১ আগস্ট ২০২৫); *দি ডেইলি স্টার*, 'Annual flat sales to cross 10,000 units for the first time,' ২১ ডিসেম্বর ২০২১, https://www.thedailystar.net/business/economy/news/annual-flat-sales-cross-10000-units-first-time-2922956?amp (১১ আগস্ট ২০২৫)। ২০১৮ সাল থেকে প্রতি বছর গড়ে ৮৫০০ - ৯০০০টির মতো ফ্ল্যাট বিক্রয় হতো।

[৫৪] *দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'Movements of residential prices in Bangladesh,' ২১ জানুয়ারি ২০২১, https://thefinancialexpress.com.bd/views/reviews/movements-of-residential-prices-in-bangladesh-1610984847 (১২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৫] *প্রাগুক্ত*।

[৫৬] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'মন্দার সময়ে প্রবৃদ্ধি দেখছে দেশের রিয়েল এস্টেট খাত,' ২৫ মে ২০২৪, https://www.tbsnews.net/bangla/অর্থনীতি/news-details-220091 (১২ আগস্ট ২০২৫)।

২০২৪ সালে বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট খাত নগরায়ণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একটি দ্রুত বর্ধনশীল ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে অবস্থান সুদৃঢ় করছে। ক্রমবর্ধমান আবাসন চাহিদা বিনিয়োগ ও নির্মাণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করেছে, যার ফলে খাতটি জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে এই খাতের অবদান ছিল ৭.৭৭%, এবং প্রাক্কলিত হিসাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা প্রায় ১১%-এ পৌঁছাতে পারে (রহমান, ২০২৪)। ২০২৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত রাজউকে নিবন্ধিত রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংখ্যা ৮২৬, রিহ্যাবের সদস্যসংখ্যা ৮৯০ এবং বিএলডিএর সদস্যসংখ্যা ৩৫২।[৫৭] এসব নিবন্ধিত রিয়েল এস্টেট কোম্পানির পাশাপাশি রয়েছে অনেক অনিবন্ধিত রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান, যার সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না।[৫৮] তবে ধারণা করা হয়, নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কোম্পানিসহ বাংলাদেশে মোট রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংখ্যা প্রায় ৩,০০০।[৫৯] বর্তমানে ঢাকা শহরে আবাসন চাহিদা সর্বোচ্চ, যার ফলে ৯৮% রিয়েল এস্টেট কোম্পানি শুধু ঢাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে মাত্র ২% কোম্পানি তাদের কার্যক্রম ঢাকার বাইরে বিস্তৃত করেছে।[৬০]

সামগ্রিকভাবে, রিয়েল এস্টেট খাত তার সূচনালগ্ন থেকে আবাসন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিম্নে বাংলাদেশে রিয়েল এস্টেট খাতে ক্রমবিকাশের ধারা তুলে ধরা হলো (সারণি ২.১)।

সারণি ২. ১: বাংলাদেশে বেসরকারি আবাসন খাতের ক্রমবিকাশ

বিকাশের ধাপ	সময়কাল	মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
প্রারম্ভিক পর্যায়	১৯৪৭ - ১৯৬৯	– দেশভাগের পর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি – সরকারি আবাসন উদ্যোগের সূচনা – বেসরকারি আবাসন কার্যক্রম প্রায় শূন্য – ডিআইটি প্রতিষ্ঠা (১৯৫৬) ও প্রথম মাস্টার প্ল্যান (১৯৫৯) – পরিকল্পিত শহর পরিকল্পনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা – শহর এলাকায় জমি উন্নয়ন ও প্লট বিক্রয়ের প্রথম উদ্যোগ – নতুন আবাসিক এলাকা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শহর সম্প্রসারণের সূত্রপাত – মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবাসন চাহিদার উত্থান – বেসরকারি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির যাত্রা শুরু ও ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড প্রতিষ্ঠা (১৯৬৪-৬৫) – রিয়েল এস্টেটের প্রতি প্রাথমিক ক্রেতার আস্থা গঠন এবং ভবিষ্যৎ বাজার সম্প্রসারণের ভিত্তি তৈরি
প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও বিকাশ পর্যায়	১৯৭০ - ১৯৯৯	– প্রথম রেজিস্টার্ড রিয়েল এস্টেট কোম্পানি গঠন ও পাঁচটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির যাত্রা শুরু – সরকারি ও বেসরকারি খাত সক্রিয় হওয়া শুরু – সরকারের উদ্যোগে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসন প্রকল্পে গুরুত্ব প্রদান – দেশের ক্রমবর্ধমান আবাসন চাহিদা পূরণে সরকারের সীমাবদ্ধতা – ক্রমবর্ধমান আবাসন চাহিদা পূরণে বেসরকারি খাতের প্রবেশ ও বেসরকারি আবাসন প্রকল্প বৃদ্ধি – শহরের মধ্যবিত্ত বাসিন্দাদের দ্বারা প্রশংসিত হওয়া ও সুপরিচিত বিষয় হিসেবে পরিচিতি লাভ – রাজউকের যাত্রা শুরু ও বিস্তার (১৯৮৭) – প্রায় ১০০টি রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা – রিয়েল এস্টেট খাত দ্রুত সম্প্রসারণ এবং জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা

[৫৭] যেসব রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম করে, তারাই মূলত বিএলডিএর সদস্য হতে পারে। বিএলডিএর সদস্য এমন ৮.৪% রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার রিহ্যাবের সদস্য।

[৫৮] একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, গড়ে প্রায় ১৫০০টির রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আবাসন ব্যবসায় যুক্ত রয়েছে, যেগুলো রাজউক এবং রিহ্যাবে নিবন্ধিত নয়। সূত্র: *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'Most real estate companies unregistered,' ১৫ জানুয়ারি ২০১৩, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/bangladesh-others/28711/most-real-estate-companies-unregistered (১২ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৯] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'Housing sector going through a critical phase,' ০৯ জুন ২০২৫, https://en.bd-pratidin.com/special/2025/06/19/39794 (০৬ এপ্রিল ২০২৬)।

[৬০] *দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'Movements of residential prices in Bangladesh,' ২১ জানুয়ারি ২০২১, https://thefinancialexpress.com.bd/views/reviews/movements-of-residential-prices-in-bangladesh-1610984847 (১২ আগস্ট ২০২৫)।

বিকাশের ধাপ	সময়কাল	মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
প্রসারণ ও পরিপক্কতার পর্যায়	২০০০ - ২০১৯	– রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৮২ (২০১১) – রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংখ্যা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি – আধুনিক আবাসনের চাহিদা ও সরকারি নীতি উন্নয়ন – বিএলডিএ প্রতিষ্ঠা (২০০৬) – রিয়েল এস্টেট খাতে মন্দা ও পুনরুদ্ধার (২০০৮, ২০১২-১৩) – দেশে প্রায় ১,৫০০টি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা (২০১৫)[৬১] – রিয়েল এস্টেট খাতের স্থিতিশীল উন্নতি – দ্রুতবর্ধনশীল রিয়েল এস্টেট বাজার – মিশ্র ব্যবহার, হাইরাইজ প্রকল্প, গেজেটেড কমিউনিটি ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি – সরকারি সহায়তা ও নতুন নতুন রিয়েল এস্টেট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা – রিহ্যাবের মোট সদস্যসংখ্যা ১১৯১-তে পৌঁছানো (২০১৯)[৬২]
টেকসই ও স্মার্ট পর্যায়	২০২১ - বর্তমান	– নিবন্ধিত রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধি (রাজউকে নিবন্ধিত ৮২৬, রিহ্যাবের সদস্য ৮৯০ এবং বিএলডিএর সদস্য ৩৫২) – সর্বোচ্চসংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় – রিয়েল এস্টেট এবং এর সাথে সংযুক্ত লিঙ্কেজ শিল্পগুলো মিলিয়ে জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান – মিশ্র ব্যবহার ও হাইরাইজ প্রকল্প বৃদ্ধি এবং গেজেটেড কমিউনিটি ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি – অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের উপায় হিসেবে সরকারি উদ্যোগগুলোতে রিয়েল এস্টেট খাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া – টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্প – বাজারের চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রয়াস

২.৩ বাংলাদেশে বেসরকারি আবাসন খাতে অংশীজন কাঠামো

বাংলাদেশে বেসরকারি আবাসন খাত একটি দ্রুত বিকাশমান ও বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, যা নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আবাসন চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। তাই সম্ভাবনাময় এই খাতের অংশীজন কাঠামো বিশ্লেষণ খাতটির কার্যক্রম, নীতি ও বাজার প্রবণতা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাঠামোর বিশ্লেষণে রিয়েল এস্টেট খাতের স্বচ্ছতা, কার্যকরতা, জবাবদিহিতা এবং টেকসই নগর উন্নয়নের সম্ভাবনা অনুধাবনে সহায়ক হবে।

সারণি ২. ২: বাংলাদেশে বেসরকারি আবাসন খাতের অংশীজন কাঠামো

অংশীজনের ধরন	অংশীজন
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	গৃহায়ন ও গণপূর্ত; পরিবেশ; বন ও জলবায়ু; বাণিজ্য; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক; পানিসম্পদ; সড়ক পরিবহন ও সেতু; অর্থ; ভূমি
নীতিনির্ধারণ, অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ/ বোর্ড	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), পরিবেশ অধিদপ্তর, ভূ-তত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), সিটি কর্পোরেশন, তিতাস গ্যাস, ডিপিডিসি/ ডেসকো/ সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ অফিস, ঢাকা ওয়াসা, পানি উন্নয়ন বোর্ড
ইউটিলিটি সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা, ডিপিডিসি/ ডেসকো, তিতাস গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ডিটিসিএ
সরবরাহের দিক	জমির যোগানদাতা (জমির মালিক), রিয়েল এস্টেট কোম্পানি

[৬১] *দি ডেইলি স্টার*, 'Global media and Dhaka's urbanisation,' ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, https://www.thedailystar.net/drivers-economy/global-media-and-dhakas-urbanisation-1364854 (১২ আগস্ট ২০২৫)।

[৬২] *প্রথম আলো*, 'নগরায়ণের সঙ্গে কলেবর বাড়ছে আবসন শিল্পের,' ২৫ জানুয়ারি ২০১৯, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/নগরায়ণের-সঙ্গে-কলেবর-বাড়ছে-আবাসন-শিল্পের (১২ আগস্ট ২০২৫)।

অংশীজনের ধরন	অংশীজন
চাহিদার দিক	প্লট ক্রেতা
রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সংগঠন	রিহ্যাব ও বিএলডিএ
মধ্যস্থতাকারী	ব্রোকার হাউজ, মধ্যস্বত্বভোগী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি পর্যায়ের মধ্যস্বত্বভোগী
তথ্য প্রচারকারী	বিজ্ঞাপন সংস্থা, গণমাধ্যম
সরকারি প্রশাসনিক ও নিবন্ধন সংস্থা	ভূমি অফিস, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেল অফিস
লিংকেজ শিল্প	সিভিল, ইলেকট্রিক, কাঠ শিল্প, প্লাম্বিং, টাইলস, স্যানিটারি, পেইন্ট, হার্ডওয়্যার, সাব-কন্ট্রাক্ট, কনস্ট্রাকশন মেশিনারিজ; শ্রম, হোম এপ্লিকেশন, অফিস স্টেশনারি ইত্যাদি
নাগরিক ও পেশাজীবী সংগঠন	বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), আইন ও সালিশ কেন্দ্র, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) ইত্যাদি
	স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনা ফার্ম; প্রকৌশল ও নির্মাণ পরিকল্পনা ফার্ম; পরিবেশ ও প্রভাব মূল্যায়ন ফার্ম; আইনি পরামর্শদাতা ফার্ম
	ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি), ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্স (বিআইপি)

নিম্নে প্রতিটি অংশীজনদের কার্যক্রমভিত্তিক আলোচনা করা হলো।

২.৩.১ নীতিনির্ধারণী কাঠামো

বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতের কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারক হিসেবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা প্রণয়ন, আবাসন প্রকল্পের অনুমোদন এবং সামগ্রিক তদারকি নিশ্চিত করে। তবে এই খাতের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো একটি বহুমুখী ও সমন্বিত ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর আবাসন প্রকল্পের পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে। ভূমি ব্যবস্থাপনা, নামজারি ও মালিকানা সংক্রান্ত আইনি জটিলতা নিরসনে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ (যেমন রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, আরডিএ)[৬৩] এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো মাস্টারপ্ল্যান বা ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (DAP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে নগরায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কোম্পানি নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, এবং স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদান করে থাকে। আবাসন খাতের আর্থিক প্রবাহ ও ঋণ সহায়তা নিয়ন্ত্রণে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক নীতিমালা ও সুদের হার নির্ধারণ করে। এছাড়া বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন অথরিটির (ওয়াসা) মতো সংস্থাগুলো নাগরিক সুবিধা প্রদান করে।

২.৩.২ নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদন ও তদারকি কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতের সুশৃঙ্খল বিকাশ ও মান নিশ্চিত করতে একটি বহুস্তরীয় নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (Multi-layered Regulatory Regime) বিদ্যমান। এই কাঠামোর কেন্দ্রে রয়েছে রাজউক এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। রাজউক প্রধানত ঢাকা মহানগরীর জন্য বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) ও মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী নকশা অনুমোদনের কাজ করে। অন্যদিকে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে ভূমি উন্নয়নে নীতিনির্ধারণী ভূমিকা পালন করে। রাজউক ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সদস্যপদ নিবন্ধন, ভূমি উন্নয়ন ও আবাসন প্রকল্পের নকশা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[৬৩] সিডিএ - চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; কেডিএ - খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আরডিএ - রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

পরিবেশ অধিদপ্তর আবাসন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। প্রকল্পের কারিগরি ও মাটির গুণাগুণ যাচাইয়ে ভূ-তত্ত্ব অধিদপ্তর এবং নদী বা জলাশয় রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ড তদারকি সংস্থা হিসেবে কাজ করে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে রাস্তাঘাট এবং ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের সমন্বয়ের জন্য সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা থেকে অনাপত্তি গ্রহণ করতে হয়। নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসা (পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন), ডিপিডিসি/ ডেসকো (বিদ্যুৎ সরবরাহ) এবং তিতাস গ্যাস (জ্বালানি সংযোগ) তাদের নিজস্ব কারিগরি মানদণ্ড অনুযায়ী নকশা যাচাই ও সংযোগ প্রদান করে। বর্তমানে রাজউকের মতো সংস্থাগুলো ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

২.৩.৩ ইউটিলিটি ও নাগরিক সেবা প্রদান

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা আবাসন প্রকল্পে ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সড়ক বাতির মতো মৌলিক অবকাঠামো নিশ্চিত করে। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য ঢাকা ওয়াসা এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের নকশা যাচাই ও সংযোগ প্রদান করে। বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) ও ঢাকা পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির (ডিপিডিসি) মতো বিতরণ সংস্থাগুলো লোড ক্যালকুলেশন ও সাব-স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিত করে। জ্বালানি নিরাপত্তা ও রান্নার সুবিধার জন্য তিতাস গ্যাস (বা এলপিজি ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলো) সংযোগ প্রদান করে। অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি উদ্ধার তৎপরতার সক্ষমতা যাচাইয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ এবং ফায়ার সেফটি প্ল্যান বাস্তবায়ন করা বর্তমানে বাধ্যতামূলক। এছাড়া পরিকল্পিত যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) বড় প্রকল্পগুলোর পরিবহন প্রভাব মূল্যায়ন (ট্রান্সপোর্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট-টিআইএ) পর্যালোচনা করে।

২.৩.৪ সরবরাহ (Supply-side) কাঠামো

বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতের সরবরাহ কাঠামো মূলত জমির মালিক এবং রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের একটি দ্বিপাক্ষিক ও কৌশলগত সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। জমির মালিকরা এই খাতের প্রাথমিক কাঁচামাল বা জমি সরবরাহ করেন, যা বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন ও গৃহায়ন প্রকল্পের প্রধান ভিত্তি। অন্যদিকে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো তাদের কারিগরি দক্ষতা, মূলধন এবং বিপণন কৌশলের মাধ্যমে অবিকশিত ভূমিকে সুপরিকল্পিত প্লট বা আধুনিক অ্যাপার্টমেন্টে রূপান্তর করে বাজারে আবাসন সরবরাহ নিশ্চিত করে। আবাসিক প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে ল্যান্ড ডেভেলপাররা শত শত একর জমি একত্রিত করে (Land Pooling) রাস্তা, বিদ্যুৎ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাসহ উন্নত প্লট সরবরাহ করে, যা পরবর্তী পর্যায়ে ছোট ডেভেলপার বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবাসন নির্মাণের সুযোগ তৈরি করে দেয়।

বাংলাদেশের আবাসন খাত একটি বহুমাত্রিক অংশীজন কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত, যেখানে লিংকেজ শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক অংশীজন হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এই খাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০০টিরও বেশি শিল্প যুক্ত, যার মধ্যে স্টিল (রড), সিমেন্ট, ইট, সিরামিক টাইলস, পেইন্ট, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনকারী খাতগুলো প্রধান। আবাসন খাতের চাহিদা এসব শিল্পে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণকে প্রভাবিত করে। রিয়েল এস্টেট খাতের সম্প্রসারণের সাথে সাথে লিংকেজ শিল্পসমূহও সমানতালে বিকশিত হয়। একটি বড় আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কেবল অবকাঠামো নির্মাণেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি পণ্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতিশীলতা এবং বাজার সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করে। পাশাপাশি ভারী যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী, প্রকৌশল ও স্থাপত্য পরামর্শক এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইন খাতও এই প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে ওঠে।

২.৩.৫ চাহিদা (Demand-side) কাঠামো

প্লট/ফ্ল্যাট ক্রেতারা এই খাতের চূড়ান্ত ভোক্তা। নগরায়ণ, একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্রুত সম্প্রসারণ এবং নিরাপদ ও আধুনিক মানসম্পন্ন আবাসনের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে তাদের ভূমিকা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং বাজারের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করছে। ভোক্তা চাহিদার এই পরিবর্তনের ফলে আবাসন কোম্পানিগুলো এখন জিমনেশিয়াম, শিশুদের খেলার মাঠ, আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং পরিবেশবান্ধব নকশার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্সের একটি বড় অংশ সরাসরি এই খাতে বিনিয়োগ হওয়ায় তা চাহিদাকে আরও বেগবান করছে।

২.৩.৬ ব্যবসায়ী সংগঠন ও খাতভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব

রিয়েল এস্টেট কোম্পানি সংগঠন যেমন রিহ্যাব ও বিএলডিএ শিল্পের মান, নৈতিক দিক এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিবন্ধন গ্রহণ করে এবং এফবিসিসিআই-এর সদস্য হিসেবে আইনি ও শিল্প স্বীকৃতি অনুসরণ করে। রিহ্যাব মূলত অ্যাপার্টমেন্ট ও কমার্শিয়াল স্পেস ডেভেলপারদের প্রতিনিধিত্ব করে, যা দেশের আবাসন খাতের বৃহত্তম এবং প্রভাবশালী প্ল্যাটফর্ম। অন্যদিকে বিএলডিএ মূলত বৃহৎ আকারের ভূমি উন্নয়ন ও স্যাটেলাইট টাউন প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা ও নীতিনির্ধারণী বিষয়ে কাজ করে। এরা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খাতের স্বার্থে সমন্বয় রাখে, অংশগ্রহণমূলক সম্পর্ক বজায় রাখে, পরামর্শ প্রদান করে এবং খাতের স্বার্থে নৈতিক সহায়তা ও নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে বেসরকারি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। তারা নৈতিক সহায়তা প্রদান, খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভোক্তা বা প্লট ক্রেতাদের অধিকার সুরক্ষা, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং সতর্কীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.৩.৭ বাজার মধ্যস্থতাকারী, তথ্য প্রচার কাঠামো, স্থানীয় সামাজিক এবং প্রভাবশালী অংশীজন

আধুনিক আবাসন বাজারে বাজার মধ্যস্থতাকারী এবং তথ্য প্রচার কাঠামো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। প্রথাগত ব্রোকার বা মধ্যস্বত্বভোগীদের পাশাপাশি বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক রিয়েল এস্টেট কনসালটেন্সি এবং ডিজিটাল প্রপার্টি পোর্টালসমূহ (যেমন Bproperty, PBazaar) এই খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল সংযোগ স্থাপনই নয়, বরং সম্পত্তির সঠিক মূল্যায়ন, আইনি নথিপত্র যাচাই এবং লেনদেন প্রক্রিয়াকে নিরাপদ ও স্বচ্ছ করতে পেশাদার ভূমিকা পালন করে।

পাশাপাশি বিজ্ঞাপন সংস্থা ও মিডিয়া হাউজ বাজার তথ্য প্রচার, ব্র্যান্ডিং এবং প্রকল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরিতে প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মগুলো ক্রেতার সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রধান মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নিয়মিত বাজার বিশ্লেষণ এবং 'আবাসন সাপ্লিমেন্ট' বা বিশেষ সংখ্যাগুলো ক্রেতাদের বর্তমান বাজারদর ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করতে বাজারের তথ্য প্রবাহকে অবাধ ও গতিশীল রাখে।

বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে স্থানীয় অংশীজনদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যা অনেক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর চেয়েও অধিক প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এই কাঠামোর মূলে রয়েছে স্থানীয় কমিউনিটি, যাদের জমির মালিকানা হস্তান্তর এবং প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মানসিকতা প্রকল্পের প্রাথমিক গতি নির্ধারণ করে। স্থানীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ প্রায়শই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, সীমানা নির্ধারণ এবং শ্রম ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। বাস্তব প্রয়োগে, এই প্রভাবশালী অংশীজনরা প্রকল্পের 'সোশ্যাল লাইসেন্স টু অপারেট' বা সামাজিক বৈধতা নিশ্চিত করতে যেমন সহায়ক হতে পারে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্বে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করতে পারে। তবে কখনো কখনো ভূমি দখল বা অনুচিত বলপ্রয়োগের মতো ঘটনাও ঘটে, যা আবাসন খাতের সুশাসনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

২.৩.৮ সরকারি প্রশাসনিক ও নিবন্ধন কাঠামো

আবাসন প্রকল্পের আইনি ভিত্তি ও স্থায়িত্ব মূলত একটি শক্তিশালী সরকারি প্রশাসনিক ও নিবন্ধন কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। এই প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ উপজেলা ভূমি অফিস, যা নামজারি (মিউটেশন), খতিয়ান যাচাই এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের মাধ্যমে জমির প্রাথমিক মালিকানা ও ব্যবহারের বৈধতা নিশ্চিত করে। বর্তমানে প্রবর্তিত 'স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা' ও অনলাইন ই-নামজারি প্রক্রিয়া এই প্রশাসনিক স্তরে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। জমির চূড়ান্ত মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী দলিলাদি নিবন্ধন ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়ের মাধ্যমে তারা প্রতিটি হস্তান্তরের আইনি বৈধতা ও রাষ্ট্রীয় রেকর্ড নিশ্চিত করে, এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসংশ্লিষ্ট কর ও ভ্যাট কর্তৃপক্ষ প্রতিটি লেনদেন থেকে গেইন ট্যাক্স, ভ্যাট ও অন্যান্য উৎসকর সংগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বড় অঙ্কের রাজস্ব যোগান দেয়। এই সমন্বিত প্রশাসনিক কাঠামো কেবল জমির মালিকানার নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করে না, বরং একটি সুশৃঙ্খল বাজার ব্যবস্থা বজায় রাখতে এবং কর ফাঁকি রোধে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

২.৩.৯ পেশাগত ও প্রযুক্তিগত সহায়তা কাঠামো

এই অংশীজনদের মধ্যে রয়েছে স্থাপত্য, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, নগর পরিকল্পনা এবং পরিবেশ পরামর্শক সংস্থাগুলো, যারা প্রকল্পের প্রাথমিক নকশা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড নিশ্চিত করে। এই কাঠামোর কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি), ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্স (বিআইপি) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পেশাজীবী সংগঠনগুলো স্থপতি, নগর পরিকল্পনাবিদ এবং প্রকৌশলীদের পেশাগত সনদ প্রদান, নৈতিক আচরণবিধি প্রয়োগ এবং কারিগরি মান নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের তদারকি ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্নিনিরাপত্তা, ভূমিকম্প সহনশীলতা এবং আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয় ঘটে। এই পেশাদার কাঠামো কেবল ভবনের বাহ্যিক সৌন্দর্যই নয়, বরং আইনগত সামঞ্জস্যতা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করে আবাসন খাতকে একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

২.৩.১০ সিভিল সোসাইটি ও পরিবেশবাদী ওয়াচডগ প্রতিষ্ঠান

বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ (দুর্নীতি, অনিয়ম, পরিবেশ লঙ্ঘন ও গ্রাহক হয়রানি) বিষয়ে সাধারণত তিন ধরনের ওয়াচডগ প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল রয়েছে, যথা আইনি ও সুশাসন বিষয়ক (আইন ও শালিস কেন্দ্র, বাংলাদেশ মানবাধিকার ফোরাম ইত্যাদি), পরিবেশ ও নগর পরিকল্পনা বিষয়ক অ্যাডভোকেসি (বেলা, বাপা, বিআইপি, পবা ইত্যাদি) এবং ভূমি অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক (এএলআরডি, এসইএইচডি ইত্যাদি)। বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করা এই সংস্থাগুলো মূলত নজরদারি, আইনি লড়াই এবং নীতিগত সংস্কারের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ওয়াচডগ হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এদের একটি অংশ সরাসরি রাজউক বা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, অনিয়ম এবং সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে গবেষণা ও জনসচেতনতামূলক কাজ করে। অন্য একটি অংশ আবাসন প্রকল্পের নামে জলাশয় ভরাট, পাহাড় কাটা বা কৃষিজমি দখলের মতো পরিবেশ আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে জনস্বার্থে মামলা পরিচালনা এবং আইনি নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠান ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ভূমিহীন মানুষের অধিকার রক্ষায় মাঠ পর্যায়ে কাজ করে এবং ভূমি আইনের অপব্যবহার রোধে সোচ্চার থাকে। পাশাপাশি পেশাজীবী ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মগুলো পরিকল্পিত নগরায়ণ ও মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে কারিগরি ত্রুটি ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতার ঘাটতিগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরে টেকসই আবাসন নিশ্চিত করতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি করে।

২.৪ উপসংহার

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে রিয়েল এস্টেট খাতের বিকাশ একটি বহুমাত্রিক, প্রেক্ষিতনির্ভর এবং ক্ষমতাকাঠামো-নির্ভর প্রক্রিয়া, যা ঐতিহাসিক প্রশাসনিক কেন্দ্রীয়তা, নগরায়ণের গতি, অভ্যন্তরীণ অভিবাসন, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বিকেন্দ্রীকৃত ও সমন্বিত নগর পরিকল্পনার অভাবে ঢাকা একটি ভারসাম্যহীন, শ্রেণিবিভক্ত ও সংকটসঙ্কুল নগর কাঠামোয় পরিণত হয়েছে, যেখানে অন্যান্য শহরের তুলনায় রাজধানীর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে রিয়েল এস্টেট খাতের সম্প্রসারণ কেবল আবাসন চাহিদা পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি উচ্চ ভূমিমূল্য, জমির স্বল্পতা, মুনাফাকেন্দ্রিক বিনিয়োগ, রেমিট্যান্স প্রবাহ, এবং মধ্যবিত্তের পরিবর্তিত আবাসন চাহিদার দ্বারা প্রভাবিত একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় রূপ নিয়েছে। একইসঙ্গে অংশীজন কাঠামোর বিশ্লেষণ নির্দেশ করে, নীতিনির্ধারণী সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, নাগরিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ডেভেলপারদের মধ্যে গড়ে ওঠা জটিল ও আন্তঃনির্ভরশীল সম্পর্ক খাতটির কার্যক্রম, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং নীতিগত প্রভাব নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বেসরকারি রিয়েল এস্টেট খাত সংক্রান্ত নীতি ও আইনি কাঠামো

বাংলাদেশে পরিকল্পিত নগরায়ন, ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং নাগরিকদের জন্য নিরাপদ ও টেকসই আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধান, জাতীয় নীতি, মহাপরিকল্পনা এবং বিভিন্ন আইন ও বিধিমালার সমন্বয়ে একটি নীতিগত ও আইনি কাঠামো গড়ে উঠেছে। জাতীয় গৃহায়ন নীতি, ২০১৬, ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫), ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান বা ড্যাপ (২০২২-২০৩৫) এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিল নগর উন্নয়ন ও আবাসন ব্যবস্থাপনার নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

বাংলাদেশে বেসরকারি রিয়েল এস্টেট খাতের কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিস্তৃত আইনি কাঠামো বিদ্যমান। এসব আইন ও বিধিমালা কেবল রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নয়, বরং এটি ক্রেতা ও ডেভেলপার উভয়ের অধিকার, কর্তব্য এবং নৈতিক দায়িত্বের সুষমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব আইন ও বিধিমালায় প্রকল্প অনুমোদন, ভূমি উন্নয়ন, পরিবেশগত ছাড়পত্র, অবকাঠামোগত মানদণ্ড, প্লট ও ফ্ল্যাট বিক্রয়, মালিকানা হস্তান্তর, এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে নীতি ও আইনি দলিলসমূহের ধারাবাহিক পর্যালোচনা এবং আবাসন খাতসংশ্লিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, পেশাজীবী এবং অন্যান্য অংশীজনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর প্রাসঙ্গিকতা, বাস্তব প্রয়োগ, সীমাবদ্ধতা, ঘাটতি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.১ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০

রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতকে সুশৃঙ্খল, নিয়ন্ত্রিত ও জবাবদিহিমূলক কাঠামোর আওতায় আনতে প্রণীত একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। এ আইনে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের নিবন্ধন, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অনুমোদন এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্রেতার অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সময়মতো ফ্ল্যাট বা প্লট হস্তান্তর, স্বচ্ছ চুক্তি প্রণয়ন এবং প্রতারণামূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনটি ডেভেলপারদের কার্যক্রম তদারকি, অনিয়মের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান এবং ক্রেতা-ডেভেলপার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও নির্ধারণ করে। তবে এই আইন পর্যালোচনায় যেসব সীমবাদ্ধতা, ঘাটতি ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

- **'জমির মালিক'-এর কোনো সংজ্ঞা না থাকা:** রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এ "জমির মালিক" শব্দটির কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান না করায় মাঠপর্যায়ে ও বিচারিক ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক প্রায়োগিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। আবাসন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংশীজন হওয়া সত্ত্বেও ঠিক কোন ক্ষেত্রে নিবন্ধিত মালিক, সহ-মালিক, পৈতৃক ওয়ারিশ, আইনগত প্রতিনিধি কিংবা পাওয়ার অব অ্যাটর্নিপ্রাপ্ত ব্যক্তি 'জমির মালিক' হিসেবে গণ্য হবেন তা স্পষ্ট করা হয়নি। এই ঘাটতির সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি অনেক সময় যৌথ বা শরিকানা জমির সব অংশীদারের বৈধ সম্মতি ছাড়াই আংশিক মালিকের সাথে চুক্তি করে প্রকল্প শুরু করে দেয়, যা প্রকৃত মালিকদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে। সর্বোপরি, এই ফাঁকের কারণে মালিকানা যাচাই, ক্ষতিপূরণ বণ্টন এবং চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে দেওয়ানি ও ফৌজদারি দায়ের ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি হয়, যা আবাসন খাতে দীর্ঘমেয়াদি মালিকানা বিরোধ, মামলা-মোকদ্দমা এবং চূড়ান্ত বিচারে প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থবির হয়ে পড়ার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।
- **ডেভেলপার নিবন্ধন, নবায়ন ও নিয়ন্ত্রক তদারকির সীমাবদ্ধতা:** এই আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী ডেভেলপারদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হলেও এর বাস্তব প্রয়োগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। প্রথমত, নিবন্ধন প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে জটিল, সময়সাপেক্ষ, এবং পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ব্যবস্থার অভাবে নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা ব্যাহত হতে পারে, যা আবেদনকারীদের হয়রানি, বিলম্ব এবং অনিয়মের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়ত, নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে ডেভেলপারের পূর্ববর্তী

কার্যক্রম, যেমন আইন প্রতিপালন, প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি, চুক্তি প্রতিপালন এবং পূর্ববর্তী অনিয়ম বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ইতিহাস, বাধ্যতামূলকভাবে মূল্যায়নের কোনো বিধান নেই। ফলে অতীতে গুরুতর অনিয়মে জড়িত বা গ্রাহকের স্বার্থ ক্ষুণ্নকারী ডেভেলপারও একইভাবে নিবন্ধন নবায়নের সুযোগ পেতে পারে। তৃতীয়ত, নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের সূচক এবং নিবন্ধন বাতিল বা নবায়ন প্রত্যাখ্যানের সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড আইনে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রশাসনিক বিবেচনার সুযোগ বৃদ্ধি পায়, যা জবাবদিহি ও স্বচ্ছতাকে দুর্বল করতে পারে। এছাড়া, ধারা ৫(৭)-এ নিবন্ধন সনদ বাতিলের বিধান থাকলেও কোন পরিস্থিতিতে, কী প্রক্রিয়ায় এবং কত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন বাতিল করা হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে আইন প্রয়োগ বিলম্বিত হতে পারে এবং অনিয়মকারী ডেভেলপারের বিরুদ্ধে সময়মতো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও গ্রাহকের স্বার্থ সুরক্ষা বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

- **নিবন্ধন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে আইনি অস্পষ্টতা ও দ্বৈততার সম্ভাবনা:** ধারা ৫(১)-এ বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (যেমন রাজউক, সিডিএ, কেডিএ বা আরডিএ) নিকট নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে, ধারা ৫(২)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র বাংলাদেশে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা পরিচালনার জন্য সরকারের নিকট নিবন্ধিত হতে হবে। তবে এখানে "সরকারের নিকট নিবন্ধন" বলতে কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করবে, তা আইনে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে দুটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়। প্রথমত, ধারা ৪(১) ও ৪(২)-এর অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষ (রাজউক, সিডিএ, কেডিএ ও আরডিএ) যদি সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী নিয়ন্ত্রক সংস্থা হয়, তবে পৃথকভাবে "সরকারের নিবন্ধন"-এর প্রয়োজনীয়তা কেন উল্লেখ করা হয়েছে? দ্বিতীয়ত, ডেভেলপারকে কি একই ব্যবসা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের কাছ থেকে পৃথকভাবে দুটি নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে? আইনে এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার নাম উল্লেখ না থাকায় বাস্তব প্রয়োগে বিভ্রান্তি ও প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। একদিকে, যদি কর্তৃপক্ষ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে, তবে দ্বৈত নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা অযৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে, যদি সরকার ও কর্তৃপক্ষ পৃথক নিবন্ধনকারী সত্তা হিসেবে বিবেচিত হয়, তবে একই ব্যবসার জন্য একাধিক নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা প্রশাসনিক দ্বৈততা, অতিরিক্ত ব্যয় এবং সমন্বয়হীনতার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
- **রিহ্যাব/বিএলডিএ সদস্যপদ সংক্রান্ত বিধানের অসামঞ্জস্যতা এবং প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ:** ধারা ৫(৩) অনুযায়ী রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার হিসেবে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণের বিষয়টি ঐচ্ছিক হিসেবে প্রতীয়মান হলেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ধারা ১৩(১)-এর ক্ষমতাবলে জারিকৃত পরিপত্রে ডেভেলপারদের নিবন্ধনের জন্য রিহ্যাবের সদস্যপদকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[৬৪] অন্যদিকে, রিহ্যাবের নতুন সদস্যপদ গ্রহণের শর্তের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপ্রাপ্ত অন্তত একটি প্রকল্পে নির্মাণকাজ শুরু এবং তার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ একটি স্পষ্ট চক্রাকার আইনি অসামঞ্জস্যতা তৈরি হয়েছে – প্রকল্প অনুমোদন ও নির্মাণকাজ শুরুর জন্য সরকারি নিবন্ধন প্রয়োজন, অথচ সরকারি নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় রিহ্যাব সদস্যপদ পেতে হলে আবার প্রকল্প অনুমোদন ও কাজ শুরুর পূর্বশর্ত পূরণ করতে হয়। ফলে সরকারি নিবন্ধন লাভ, প্রকল্প অনুমোদন অর্জন, নির্মাণকাজ শুরু এবং ডেভেলপার সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ – এই প্রক্রিয়াগুলোর সঠিক পারস্পরিক ক্রম (কোনটি পূর্বশর্ত এবং কোনটি পরবর্তী ধাপ) নির্ধারণে আইনগত ও নীতিগত নির্দেশনার অস্পষ্টতা ও বাস্তব প্রয়োগিক জটিলতা বিদ্যমান। এর ফলে ডেভেলপার নিবন্ধন ও সদস্যপদ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তের ধারাবাহিকতা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া নিয়ে বাস্তব প্রয়োগে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
- **ক্রেতার তথ্যাভিগম্যতা ও নথি সরবরাহে ডেভেলপারদের আইনি বাধ্যবাধকতার ঘাটতি:** ধারা ৬(৪) অনুযায়ী ক্রেতার নিকট প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশ্লিষ্ট জমির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্র কেবল "প্রদর্শন" করার বিধান রাখা হয়েছে। তবে এসব গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদির সত্যায়িত অনুলিপি বা অনুমোদিত নকশার কপি ক্রেতাকে সরবরাহ করার বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট বাধ্যতামূলক নিয়ম রাখা হয়নি। ফলে একজন সাধারণ ক্রেতার পক্ষে কেবল প্রদর্শিত নথির ভিত্তিতে জমির সঠিক মালিকানা, হালনাগাদ রেকর্ড, কিংবা বন্ধকী দায়

[৬৪] *জাগো নিউজ*, 'রিহ্যাব সদস্য ছাড়া রিয়েল এস্টেট ব্যবসা নয়,' ২৫ মে ২০১৭, https://www.jagonews24.com/economy/news/277873 (০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'আবাসন প্রতিষ্ঠানের রিহ্যাবের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক,' ২২ জানুয়ারি ২০১৯, https://www.prothomalo.com/business/আবাসন-প্রতিষ্ঠানের-রিহ্যাবের-সদস্য-হওয়া (০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫); *চ্যানেল আই অনলাইন*, 'রিহ্যাব সদস্য ছাড়া কেউ রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করতে পারবে না,' ২৫ মে ২০১৭, https://www.channelionline.com/রিহ্যাব-সদস্য-ছাড়া-কেউ-রি/ (০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

ও অন্য কোনো আইনি বিরোধ বা জটিলতা রয়েছে কিনা তা স্বাধীনভাবে যাচাই-বাছাই করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে প্রতারণা, জাল দলিল বা ভুয়া নকশার ফাঁদে পড়ে সাধারণ ক্রেতারা চরম আর্থিক ক্ষতি ও দীর্ঘমেয়াদি আইনি ঝুঁকির মুখে পড়েন।

- **আইনগত ভাষার অস্পষ্টতা ও ক্রেতার অধিকার সুরক্ষার সীমাবদ্ধতা:** ধারা ৮(১)-এ বিক্রয়যোগ্য রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রসপেক্টাস অথবা বরাদ্দপত্রে প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ যথাযথভাবে উল্লেখ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এখানে "অথবা" শব্দের ব্যবহার প্রসপেক্টাস ও বরাদ্দপত্রের তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার বাধ্যবাধকতাকে শিথিল করে। ধারায় "প্রসপেক্টাস অথবা বরাদ্দপত্র" ব্যবহারের ফলে প্রসপেক্টাসে প্রতিশ্রুত আকর্ষণীয় সুবিধা চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রে অন্তর্ভুক্ত না করেও প্লট বিক্রয়ের সুযোগ থাকে। ফলে প্রতিশ্রুত সুবিধা থেকে ক্রেতা বঞ্চিত হলেও আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ সীমিত হতে পারে।
  একই ধরনের অস্পষ্টতা ধারা ১২(১), ১৩(১), ১৪(১) ও ১৪(২)-এও পরিলক্ষিত হয়, যেখানে অর্থ পরিশোধ, হস্তান্তর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে "অথবা" শব্দ ব্যবহারের কারণে ডেভেলপারদের জন্য বিকল্প পথ উন্মুক্ত থাকে। ফলস্বরূপ, এ ধরনের ভাষা বাস্তবে প্রতারণার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে এবং ক্রেতার সুরক্ষাকে দুর্বল করে।
  ধারা ৮(৩)-এ প্লট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্রেতা থেকে লিখিত সম্মতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকায় ডেভেলপার এই ধারা অপব্যবহারের সুযোগ পায়। এছাড়া এখানে ডেভেলপারদের পরিবর্তনের সুযোগ থাকলেও ক্রেতার নিজ উদ্যোগে প্লট বা ফ্ল্যাট পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, যা ক্রেতার স্বাধীনতা ও সম-অধিকারকে সীমিত করে।
- **আম-মোক্তারনামাভিত্তিক উন্নয়ন চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার ব্যবস্থার অস্পষ্টতা:** ধারা ৯(৩) অনুযায়ী, যদি কোনো ডেভেলপার আম-মোক্তারনামা (Power of Attorney) দলিলের মাধ্যমে ভূমি গ্রহণ করে, তাহলে ভূমির মালিক বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক এমনভাবে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে যাতে ডেভেলপার তার অংশে প্রাপ্ত রিয়েল এস্টেট বিক্রয় বা হস্তান্তর করতে পারে। কিন্তু এই ক্ষমতা অর্পণের পর ডেভেলপার বা ভূমির মালিকের কোনো পক্ষ চুক্তি লঙ্ঘন করলে তার প্রতিকার, বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায় নির্ধারণের বিষয়ে আইনটিতে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই। ফলে বাস্তব প্রয়োগে আইনি অনিশ্চয়তা, বিরোধ এবং দীর্ঘসূত্রতার ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

৩.২ বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২ ও ২০১৫)

এটি বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, মানসম্মত ও নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি বিধিমালা। এতে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া, প্লট বিন্যাস, রাস্তা, ড্রেনেজ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত মানদণ্ড, পরিবেশগত বিবেচনা, ডেভেলপারদের দায়িত্ব এবং তদারকি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি Town Improvement Act, 1953-এর অধীনে প্রণীত এবং নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যেমন রাজউকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

- **নিবন্ধন নবায়নের সিদ্ধান্তে বিলম্বকালীন কার্যক্রম পরিচালনার বিধানের সীমাবদ্ধতা:** বিধি ৩(ক)(৪) অনুযায়ী নিবন্ধন নবায়নের আবেদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নিবন্ধন বহাল থাকবে এবং তারা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এর ফলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে বিলম্ব হলে বা প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রতায় পড়ে গেলে অনিয়মে লিপ্ত বা দুর্নীতিগ্রস্ত কোম্পানিও বৈধভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।

- **অন্তর্বর্তীকালীন পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রক্রিয়াগত অস্পষ্টতা:** ভূমি উন্নয়ন বিধিমালায় প্রকল্প এলাকার উন্নয়নের সময় পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে উদ্যোক্তার নিজস্ব খরচে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে [বিধি ৬(ঠ)]। অন্তর্বর্তীকালীন পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের উৎস, প্রক্রিয়া ও তদারকি বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনার অভাব থাকার কারণে উদ্যোক্তাদের অবৈধভাবে সরকারি উৎস থেকে সংযোগ নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

- **জমির ন্যূনতম মালিকানার আইনি শর্ত এবং ক্ষুদ্র ভূমি মালিকদের অধিকার হরণের ঝুঁকি:** বিধিমালা অনুযায়ী বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের অনুমোদন ও নকশা পাসের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় সাধারণত ন্যূনতম ৭৫% ভূমির নিরঙ্কুশ মালিকানা বা উন্নয়ন চুক্তি থাকা বাধ্যতামূলক। কাগজে-কলমে এই নিয়মটি প্রকল্প শুরুর প্রাথমিক বৈধতা নিশ্চিত করলেও মাঠপর্যায়ে এটি অবশিষ্ট ২৫% ভূমির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মালিকদের জন্য চরম অস্তিত্বের সংকট তৈরি করে। বাস্তবে দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট জোনে বৃহৎ ডেভেলপার কোম্পানি যখন সিংহভাগ (৭৫%) জমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, তখন প্রকল্প এলাকার ভেতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাকি ২৫% জমি

অবিক্রিত বা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই ভৌগোলিক ও কৌশলগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী ডেভেলপাররা অবশিষ্ট ক্ষুদ্র জমির মালিকদের ওপর জমি বিক্রি করার জন্য নানামুখী মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও ক্ষেত্রবিশেষে পেশীশক্তির চাপ সৃষ্টির সুযোগ পায়। আইনের এই ফাঁকের কারণে একদিকে ক্ষুদ্র মালিকরা তাদের পৈতৃক সম্পত্তি ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারেন না, অন্যদিকে বেসরকারি আবাসন খাতের এই একচেটিয়া আগ্রাসন সাধারণ মানুষের ভূমির অধিকারকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

- **ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে প্রক্রিয়াগত অস্পষ্টতা:** বিধি ৭(২)-এ বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নির্ধারিত ভূমিমূল্য অথবা পুনর্বাসন প্লট প্রদানের বিধান রয়েছে। তবে কোন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসন প্লট দেওয়া হবে এবং কোন পরিস্থিতিতে কেবল জমির নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত ৫০% অর্থ প্রদান করা হবে সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট মানদণ্ড বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়নি। একইসঙ্গে জমি বা বসতবাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জীবিকা (যেমন কুটির শিল্প, কৃষিকাজ বা ক্ষুদ্র ব্যবসা) ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার জন্য কোনো পৃথক ক্ষতিপূরণের বিধান নেই।

  এছাড়া বিধি ৭(৩) অনুযায়ী বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত মালিককে পুনর্বাসন প্লট দেওয়ার আইনি বিধান থাকলেও পুনর্বাসন প্লট বরাদ্দের স্থান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মতামত গ্রহণ, প্লটের অবস্থান বা ক্ষতিপূরণ নিয়ে ভূমির মালিক ও ডেভেলপারের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে তা নিষ্পত্তির জন্য কোনো আলোচনা, সম্মতি গ্রহণ বা বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নির্ধারণে সিদ্ধান্ত অনেকাংশে ডেভেলপারের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের স্বার্থ সংরক্ষণ, স্বচ্ছতা এবং ন্যায়সংগত পুনর্বাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

- **ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ঘাটতি:** বিধি ৯(৪)-এ প্লট বা ভূমি ক্রেতার স্বার্থ রক্ষা এবং প্রকল্প প্রস্তাবনায় ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণসংক্রান্ত শর্তাবলি অন্তর্ভুক্ত করার বিধান থাকলেও এসব শর্তের প্রকৃতি, পরিধি, বিষয়বস্তু ও কাঠামো সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড বা ন্যূনতম আবশ্যকীয় শর্ত নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে প্রকল্প প্রস্তাবনায় ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি কীভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হবে সে বিষয়ে বাস্তব প্রয়োগে ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের ভিন্নতার সুযোগ থাকে। একইসঙ্গে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও ন্যূনতম মানদণ্ডের অনুপস্থিতিতে প্রকল্প উদ্যোক্তাদের নিজস্বভাবে শর্ত নির্ধারণের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে, যা ক্রেতার স্বার্থের সঙ্গে পর্যাপ্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বা কার্যকর নাও হতে পারে। এর ফলে বিধিতে ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য থাকলেও তা বাস্তবে কতটা কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হবে সে বিষয়ে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা থেকে যেতে পারে।

- **জনসুবিধা সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশার ঘাটতি:** বিধি ১০(৬)(ঙ) অনুযায়ী খেলার মাঠের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় জনসংখ্যা অনূর্ধ্ব ৫৫ হাজার হলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জায়গা অথবা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১.৬ একর জায়গা, কবরস্থানের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ন্যূনতম ৫০,০০০ হলে ন্যূনতম ০.৩৩ একর জায়গা সংরক্ষণ, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এসব সুবিধার আয়তন আনুপাতিক হারে বৃদ্ধির নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু একবার উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর পরিকল্পনার বাইরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই বাড়তি জনগোষ্ঠীর জন্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। এছাড়া খেলার মাঠ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নাগরিকদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা রাখার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই।

- **গণশুনানি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াগত ও অংশগ্রহণমূলক কাঠামোর ঘাটতি:** বিধি ১২(৪)-এ মালিকানা-সংক্রান্ত বিষয়ে গণশুনানির ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গণশুনানি কীভাবে আয়োজন করা হবে, কারা অংশগ্রহণ করবে, কীভাবে জনসাধারণকে অবহিত করা হবে, মতামত গ্রহণ ও নথিভুক্ত করার পদ্ধতি কী হবে এবং প্রাপ্ত মতামত প্রকল্প পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কীভাবে প্রতিফলিত হবে – এসব বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ও কাঠামোগত নির্দেশনা নেই। একইসঙ্গে প্রকল্প পরিকল্পনা, নকশা ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও অন্যান্য অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যও পৃথক কোনো বিধান নেই। ফলে গণশুনানি অনেক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকার ঝুঁকি তৈরি হয়, জনমত কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হয় না, এবং প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক সুশাসন দুর্বল হতে পারে।

- **পরিবেশগত সমীক্ষার পরিধিগত সীমাবদ্ধতা:** বিধি ১৪(১)(ঝ) অনুযায়ী প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (Initial Environmental Impact Assessment) প্রতিবেদন দাখিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা সকল

ধরনের পরিবেশগত প্রভাব সুনির্দিষ্ট ও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে যথেষ্ট সক্ষম নয়। এছাড়া কোন ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (Comprehensive EIA) প্রয়োজন হবে বা প্রাথমিক সমীক্ষায় গুরুতর পরিবেশগত ঝুঁকি শনাক্ত হলে পরবর্তী করণীয় কী, সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে শুধু প্রাথমিক সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব যথাযথভাবে মূল্যায়িত নাও হতে পারে। এর ফলে পরিবেশগত ঝুঁকি উপেক্ষিত থেকে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

- **প্রকল্প অনুমোদন ও নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণে বিধিমালার সীমাবদ্ধতা:** বিধি ১৪(২)-এ পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং সিটি করপোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ছাড়পত্রের শর্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা ২০১৫ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়। এর ফলে অনুমোদন প্রক্রিয়া কিছুটা সহজ হলেও বাস্তবে ইউটিলিটি সেবা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অনুমোদিত প্রকল্প পরবর্তীতে পানি, গ্যাস বা বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ার ঝুঁকিতে থাকে, যা প্রকল্প বাস্তবায়নকে অকার্যকর করে তুলতে পারে।

- **প্রকল্প অনুমোদন ফি কাঠামোর হালনাগাদ ও যৌক্তিকতার ঘাটতি:** বিধি ১৭(১)-এ উদ্যোক্তা নিবন্ধন, নবায়ন, নতুন প্রকল্প অনুমোদন, পুনঃঅনুমোদন ও সংশোধন আবেদনপত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ ফি নির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ফি কাঠামো দীর্ঘদিন (২০১২ সাল থেকে) হালনাগাদ না হওয়ায় বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে ভূমির মূল্য, নির্মাণ ব্যয় ও প্রকল্পের আকার অনুযায়ী ফি নির্ধারণ করা হয় না, ফলে বৃহৎ ও উচ্চ-মুনাফার প্রকল্পেও ফি তুলনামূলকভাবে কম থাকে, যা অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও নীতিগত ভারসাম্য নষ্ট করে। একইসঙ্গে নাগরিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণ বাধাগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি প্রকল্পের অবস্থান, জটিলতা ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় না নেওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় একই হারে ফি নির্ধারণ (যেমন গুলশান ও গাজীপুর) বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়ে।

৩.৩ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন ২০১২ এবং ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র গাইডলাইন ২০২০

বৃহত্তর ঢাকায় নগর পরিকল্পনার সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয় নিশ্চিত করতে বহুতল ভবন ও আবাসন প্রকল্পে যানবাহন প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচলসংক্রান্ত (Traffic Circulation) নকশা ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক অনুমোদন ও এসংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে [ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২, ধারা ৯(চ)]। এই কাজটি যথার্থভাবে করার জন্য ডিটিসিএর আওতাধীন এলাকায় বহুতল ভবন ও আবাসন প্রকল্পের জন্য 'ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র গাইডলাইন ২০২০' প্রকাশ করা হয়।

- **ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র গাইডলাইনের ভাষাগত অস্পষ্টতা ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা:** আবাসিক প্রকল্পের ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র গাইডলাইন, ২০২০ মূলত নির্দিষ্ট আকার বা বৈশিষ্ট্যের বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে গাইডলাইনের নির্দেশনা ২.২-এ আবেদনপত্রের সঙ্গে "নকশা" দাখিলের কথা উল্লেখ থাকলেও কোন ধরনের নকশা (যেমন ট্রাফিক সার্কুলেশন পরিকল্পনা, প্রবেশ-নির্গমন পরিকল্পনা, পার্কিং পরিকল্পনা বা অন্য কোনো প্রকৌশল নকশা) দাখিল করতে হবে এবং সেটি পূর্বানুমোদিত হওয়া বাধ্যতামূলক কিনা সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। ফলে উদ্যোক্তা ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভিন্নমুখী ব্যাখ্যার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে, যা ছাড়পত্র প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, অসামঞ্জস্য এবং প্রশাসনিক জটিলতার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

- **ট্রাফিক সার্কুলেশন পরিকল্পনা, ড্যাপ ও এসটিপির সমন্বয় কাঠামোর সীমাবদ্ধতা:** আবাসিক প্রকল্পের ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র গাইডলাইন, ২০২০-এর নির্দেশনা ২.৪.১ ও ২.৪.২-এর অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো ট্রাফিক সার্কুলেশন প্ল্যান (টিসিপি) তৈরির ক্ষেত্রে কারিগরি নির্দেশনা থাকলেও ড্যাপ এবং স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানের সঙ্গে এর বাস্তব সমন্বয় যাচাইয়ের কোনো স্পষ্ট পদ্ধতি নেই। ড্যাপ-এর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সঙ্গে টিসিপির সামঞ্জস্যতা এবং এসটিপির দীর্ঘমেয়াদি পরিবহন পরিকল্পনার সঙ্গে এর কারিগরি সংযোগ কিভাবে নিশ্চিত হবে, তা নির্ধারিত নয়। পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজাইন, যেমন শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও জরুরি যানবাহনের চলাচল বিষয়ক কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনাও অনুপস্থিত।

- **ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্রের ফি কাঠামো ও ফি ব্যবস্থাপনার নীতিগত সীমাবদ্ধতা:** নির্দেশনা ২.৭.১ অনুযায়ী নির্ধারিত ফি কাঠামো (নতুন প্রকল্পে একর প্রতি ৩,৫০০ টাকা এবং নবায়নে ৫০০ টাকা) প্রকল্পের প্রকৃতি ও জটিলতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নতুন ও

নবায়ন ফি'র মধ্যে অতিরিক্ত ব্যবধান এবং নবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পে বড় পরিবর্তন হলেও কম ফি নির্ধারণ দুটি নীতিগত অসংগতি তৈরি করে। পাশাপাশি নকশা পরিবর্তনের জন্য আলাদা ফি বা পুনঃছাড়পত্রের কোনো বিধান না থাকায় প্রশাসনিক ও কারিগরি ব্যয়ের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না, যা ব্যবস্থাপনাগত ঘাটতি নির্দেশ করে। নির্দেশনা ২.৭.২-এর প্রধান দুর্বলতা হলো আবেদন ফি ফেরতের বিষয়ে কোনো নীতিমালা বা প্রক্রিয়া নির্ধারণ না করা, ফলে আবেদন বাতিল হলেও ফি ফেরত পাওয়া যাবে কি না তা অনিশ্চিত থাকে। পাশাপাশি ফি-সংক্রান্ত পরিভাষায় অসামঞ্জস্যতা রয়েছে – নির্দেশনায় "আবেদন ফি" বলা হলেও তফসিল-৬-এ "ছাড়পত্র ফি" উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রশাসনিক ও আইনি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এছাড়া ফি'র উদ্দেশ্য (আবেদন, অনুমোদন বা ছাড়পত্র) স্পষ্ট না থাকায় এর প্রকৃতি ও প্রয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

- **মনিটরিং, জবাবদিহি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা:** নির্দেশনা ৫-এ মনিটরিং সংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় মনিটরিংয়ের সময়সূচি, পদ্ধতি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়। "সময় সময়" শব্দটি অনির্দিষ্ট হওয়ায় তদারকি অনিয়মিত ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এছাড়া মনিটরিংয়ের মানদণ্ড (যেমন ট্রাফিক প্রভাব, পার্কিং, নিরাপত্তা) নির্ধারিত না থাকায় কার্যকর মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। ফলাফল নথিভুক্তকরণ, রিপোর্টিং কাঠামো ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কেও কোনো নির্দেশনা নেই। পাশাপাশি ছাড়পত্র বাতিলের শর্ত, সতর্কতা, সংশোধনের সুযোগ বা আপিল প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট না থাকায় প্রতিরোধমূলক ও ন্যায়সংগত প্রক্রিয়ার অভাব রয়েছে। সর্বোপরি, জরিমানা বা আংশিক শাস্তির মতো বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বিধানটি অনমনীয় ও কঠোর হয়ে উঠেছে।

৩.৪ ভূমি সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩

এই আইনটি ভূমি-সংক্রান্ত জালিয়াতি, প্রতারণা, অবৈধ দখল, ভুয়া দলিল ও মালিকানা-সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দ্রুত আইনি প্রতিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত। এ আইনে ভূমি-সম্পর্কিত অপরাধের সংজ্ঞা, শাস্তি, তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া নির্ধারণের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার আইনি ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে।

- **রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের আইনি সংজ্ঞার অনুপস্থিতি:** রিয়েল এস্টেট ডেভেলপাররা ভূমি উন্নয়ন, প্লট ও ফ্ল্যাট নির্মাণ এবং ভূমি-সংক্রান্ত লেনদেনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ায় ভূমি সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু আইনটিতে "রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার" বা "রিয়েল এস্টেট কোম্পানি"র কোনো পৃথক সংজ্ঞা নেই। ফলে ভূমি-সংক্রান্ত অপরাধে ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের দায়, কর্পোরেট জবাবদিহি এবং দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগে আইনি অস্পষ্টতা ও জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

- **অনুমোদনবিহীন প্রকল্পের প্রচার ও বিক্রয়-সংক্রান্ত অপরাধের অনুপস্থিতি:** ধারা ৪(১)(ক)-এ অন্যের মালিকানাধীন ভূমিকে নিজের মালিকানাধীন বলে প্রচার করা, এবং ধারা ৪(১)(ঙ), (চ) ও (ছ)-এ মিথ্যা দলিল, জাল তথ্য বা মিথ্যা তথ্য ব্যবহারকে ভূমি-সংক্রান্ত অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এসব ধারা মূলত ভূমির মালিকানা ও দলিল-সংক্রান্ত প্রতারণাকে কেন্দ্র করে প্রণীত। কিন্তু বেসরকারি আবাসন খাতে ডেভেলপাররা অনেক ক্ষেত্রে রাজউক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই প্রকল্পের বিজ্ঞাপন, বিপণন বা প্লট/ফ্ল্যাট বিক্রয় করে, কিংবা প্রকল্পের অনুমোদন, ভূমির ব্যবহার ও পরিকল্পনাগত অবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করে। এ ধরনের অনুমোদনবিহীন প্রকল্পের প্রচার ও বিক্রয় অথবা অনুমোদনের অবস্থা গোপন করে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি এই ধারাগুলোতে পৃথক অপরাধ হিসেবে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে এ ধরনের প্রতারণামূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

- **ডেভেলপার কর্তৃক সংঘটিত বিশেষ ধরনের দলিল ও প্রকল্প-সংক্রান্ত প্রতারণার বিষয়ে আইনি শূন্যতা:** ধারা ৫(১)(ক)-(ঙ)-এ দলিল জালিয়াতির বিভিন্ন রূপ রয়েছে, কিন্তু বেসরকারি প্রকল্পে দলিল জালিয়াতির মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তিকে একই প্লট বিক্রির ঘটনা, জমির প্রকৃত মালিকানা গোপন করে বিক্রয়, বা ভুয়া স্কেচ/নকশা ব্যবহার করে বিক্রয়, জমির মালিককে চাপ দিয়ে অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (Irrevocable POA) করিয়ে নেওয়া – এসব অপরাধের জন্য আলাদা কোনো ধারা নেই। বিশেষ করে ধারা ৫(১)(গ)-এ "দলিলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবর্তন" বিষয়ক অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ডের বিষয়ে বলা হলেও ডেভেলপার কর্তৃক অনুমোদিত নকশা পরিবর্তন করে বিক্রয় বা ভূমির প্রকৃত ব্যবহার পরিবর্তন করে বিক্রয় – এসব অপরাধের জন্য স্পষ্ট বিধান নেই।

- **'যুক্তিসঙ্গত কারণ' নির্ধারণের মানদণ্ডের অস্পষ্টতা:** ধারা ৬(২) অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ যদি কোনো ভূমি-সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে "যুক্তিসঙ্গত কারণ" বিশ্বাস করে, তাহলে বিষয়টি মামলা দায়েরের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করতে পারে। কিন্তু "যুক্তিসঙ্গত কারণ" নির্ধারণের জন্য কী ধরনের প্রমাণ, তথ্য, তদন্ত বা মূল্যায়ন অনুসরণ করতে হবে সে বিষয়ে আইনে কোনো মানদণ্ড বা প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে একই ধরনের ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষ ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তিনির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে আইন প্রয়োগে একরূপতা ও পূর্বানুমানযোগ্যতা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি স্বেচ্ছাচারিতা, বৈষম্যমূলক প্রয়োগ এবং জবাবদিহির ঘাটতির ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

- **দলিল নিবন্ধনের পূর্বশর্ত নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা:** ধারা ৬(৩) অনুযায়ী, সর্বশেষ খতিয়ান এবং হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণ ছাড়া কোনো ভূমি হস্তান্তর, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বা দলিল নিবন্ধন করা যাবে না। তবে বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রকল্প অনুমোদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র, ভূমি উন্নয়ন বা লে-আউট পরিকল্পনার অনুমোদন এবং অন্যান্য আইনগত অনুমতির বিষয়গুলোকে দলিল নিবন্ধনের বাধ্যতামূলক পূর্বশর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে প্রয়োজনীয় প্রকল্প অনুমোদন বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া পরিচালিত প্রকল্পের প্লট বা ফ্ল্যাটের দলিলও নিবন্ধন করার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে অনুমোদনবিহীন বা আইনগতভাবে অসম্পূর্ণ প্রকল্পে ক্রেতারা বিনিয়োগের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন, এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন ব্যবস্থা ও দলিল নিবন্ধন ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি সৃষ্টি হতে পারে।

- **ভূমির পূর্বের শ্রেণি বা প্রকৃতি পুনরুদ্ধারের পদ্ধতিগত ঘাটতি:** ধারা ১৪(১)-এ "জমির পূর্বের শ্রেণি বা প্রকৃতি" পুনরুদ্ধারের কথা উল্লেখ থাকলেও এটি কীভাবে হবে তার কোনো প্রযুক্তিনির্ভর বা পরিবেশগত নির্দেশনা নেই। ফলে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া অকার্যকর, পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ব্যাহত হতে পারে।

- **সাক্ষী সুরক্ষা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াগত অস্পষ্টতা:** ধারা ২১-এ বিচারাধীন মামলার সাক্ষীর সুরক্ষা বা নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তা বা সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো স্পষ্ট প্রক্রিয়া বা প্রটোকল নেই। বড় বা প্রভাবশালী ডেভেলপারদের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের সুরক্ষা যথেষ্ট নিশ্চিত না হওয়ার কারণে সাক্ষীর আতঙ্ক বা হুমকির কারণে সঠিক তথ্য প্রদান ব্যাহত হতে পারে।

৩.৫ মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০

এই আইনটি মূলত নগর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, পার্ক ও প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য প্রণীত একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রধান বিষয়সমূহ হলো খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও জলাধারকে তাদের নির্ধারিত ব্যবহার ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা; এসব স্থানের শ্রেণি বা ব্যবহার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ; সরকারি অনুমোদন ছাড়া দখল, ভরাট বা রূপান্তর প্রতিরোধ; এবং আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান। এছাড়া স্থানীয় সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এসব সম্পদ সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সার্বিকভাবে আইনটি নগর পরিবেশের ভারসাম্য, জনস্বাস্থ্য ও বাসযোগ্যতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- **সংরক্ষিত উন্মুক্ত স্থান ও জলাধার সুরক্ষার বিধানের ব্যাখ্যাগত সীমাবদ্ধতা:** ধারা ৫-এর উদ্দেশ্য খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তন রোধের মাধ্যমে পরিবেশ ও জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা। তবে এ ধারায় কোন কোন কার্যক্রমকে "শ্রেণি পরিবর্তন" হিসেবে গণ্য করা হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা নেই। উদাহরণস্বরূপ, স্থায়ীভাবে জলাধার ভরাট, খেলার মাঠের অংশে স্থাপনা নির্মাণ, কিংবা উন্মুক্ত স্থানের ব্যবহার পরিবর্তনের মতো কার্যক্রম কীভাবে এ ধারার আওতায় মূল্যায়িত হবে, তা স্পষ্ট নয়। এছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান বা জলাধারের ক্ষেত্রেও এ বিধানের প্রয়োগের পরিধি ও সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। ফলে আইনটির বাস্তব প্রয়োগে ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে, যা সংরক্ষিত উন্মুক্ত স্থান ও জলাধার সুরক্ষার উদ্দেশ্যকে দুর্বল করতে পারে।

- **"জনস্বার্থ" নির্ধারণে অস্পষ্টতা ও বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের ঘাটতি:** ধারা ৬(২)-তে শ্রেণি পরিবর্তন "জনস্বার্থে সমীচীন" হলে অনুমোদনের সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু "জনস্বার্থ" শব্দটির কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা, মূল্যায়ন মানদণ্ড বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশিকা আইনটিতে

নেই। ফলে প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়িক স্বার্থকে "জনস্বার্থ" হিসেবে উপস্থাপন করার সুযোগ পেতে পারে। ধারা ৬(২)(খ) অনুযায়ী শ্রেণি পরিবর্তনের ফলে এলাকার পরিবেশ ও বসবাসকারীদের সম্ভাব্য ক্ষতি বিবেচনা করতে হবে। তবে এই ক্ষতি কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, কোন বৈজ্ঞানিক বা কারিগরি তথ্যের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা হবে, কিংবা পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (যেমন ইআইএ), বিশেষজ্ঞ মতামত বা স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক কি না সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে ক্ষতির মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। এছাড়া "ক্ষতিকর প্রভাব" নির্ধারণের কোনো পরিমাপযোগ্য মানদণ্ড বা মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারিত না থাকায় একই ধরনের প্রকল্পে ভিন্নধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তদুপরি, ধারাটি দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়েও নীরব, যা পরিবেশ সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত ঘাটতি।

৩.৬ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ দেশের পরিবেশ সুরক্ষা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত একটি মূল আইন। এতে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের বিধান; শিল্প ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি) (Environmental Clearance Certificate - ECC) বাধ্যতামূলক করা; পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) প্রক্রিয়া; বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের মান নির্ধারণ; প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) (Ecologically Critical Area-ECA) ঘোষণা; পরিবেশ অধিদপ্তরকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষমতা প্রদান; এবং আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জরিমানা ও শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সার্বিকভাবে, আইনটি পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশবান্ধব করার একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান করে।

- **পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ঘোষণার মানদণ্ড নির্ধারণে অস্পষ্টতা:** আইনের ধারা ৫(১) অনুযায়ী "সরকার যদি সন্তুষ্ট হয়" ভিত্তিতে ইসিএ ঘোষণা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু ইসিএ ঘোষণার পূর্ববর্তী পর্যায়ে পরিবেশগত ঝুঁকি যথাযথভাবে শনাক্ত না হলে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ভূমি-রূপান্তরের মাধ্যমে এমন পরিবর্তন ঘটতে পারে যা পরবর্তীতে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারকে কঠিন করে তোলে। এছাড়া ইসিএ ঘোষণার জন্য কী কী পরিবেশগত সূচক, বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড বা মূল্যায়ন পদ্ধতির ভিত্তিতে সরকার সন্তুষ্ট হবে, সে বিষয়ে আইনে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেকাংশে প্রশাসনিক বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং একই ধরনের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এলাকাগুলোর ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে ইসিএ ঘোষণা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, পূর্বানুমানযোগ্যতা ও জবাবদিহি দুর্বল হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয় এবং পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে সময়মতো বা একই মানদণ্ডে মূল্যায়ন ও সুরক্ষার আওতায় আনা বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

- **"অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ" শর্তের সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা ও অপব্যবহারের ঝুঁকি:** ধারা ৬(ঙ)-এ "অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ" শর্তে জলাধার ভরাট বা শ্রেণি পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু এর কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা সীমা না থাকায় এবং "অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ" অস্পষ্ট হওয়ায় এই ধারার অপব্যবহার এবং জলাধারে আবাসিক প্রকল্প নির্মাণের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

৩.৭ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩

এটি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর অধীনে পরিবেশ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রণীত। এতে শিল্প ও উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত শ্রেণিবিন্যাস (সবুজ, কমলা, লাল ইত্যাদি) নির্ধারণ, ইসিসি প্রাপ্তির হালনাগাদ পদ্ধতি, ইআইএ ও প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষার (আইইই) নির্দেশনা, বায়ু, পানি, শব্দ ও বর্জ্য দূষণের মানদণ্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনলাইন আবেদন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া, এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের তদারকি ও প্রয়োগ ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত। সার্বিকভাবে, এই বিধিমালা পরিবেশগত শাসনকে ডিজিটাল, মানসম্মত ও জবাবদিহিমূলক করার একটি কাঠামো প্রদান করে।

- **প্রকল্প শ্রেণিবিন্যাস ও পরিবেশগত ঝুঁকি মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা:** এই বিধিমালার বিধি ৫ (১) (গ-ঘ) এবং তফসিল-১-এ ২৫ একরের কম হাউজিং ও নগরায়ন বা ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পকে কমলা শ্রেণি এবং ২৫ একরের বেশি প্রকল্পকে লাল বা কমলা শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকল্পের আকার ও প্রকৃত পরিবেশগত প্রভাবের বৈষম্য বিবেচনা করা হয়নি এবং প্রকল্পের আকারভেদে

যথাযথ পর্যবেক্ষণ বা শর্ত নেই। এখানে প্রকল্পের আকার ও প্রভাব ভিন্ন হলেও ছাড়পত্র প্রক্রিয়া প্রায় অভিন্ন হওয়ার ফলে পরিবেশগত ঝুঁকি উপেক্ষিত হতে পারে।

- **সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণে অস্পষ্টতা:** বিধি ১৬(৭)(গ) অনুযায়ী জনমত যাচাইয়ের সময় প্রকল্প উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব এবং "প্রযোজ্য ক্ষেত্রে" সামাজিক প্রভাব উপস্থাপন করতে হবে। কিন্তু কোন ধরনের প্রকল্প, কোন পরিস্থিতিতে বা কী মানদণ্ডের ভিত্তিতে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (Social Impact Assessment) প্রযোজ্য হবে, সে বিষয়ে বিধিমালায় কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা, মানদণ্ড বা নির্দেশনা নেই। ফলে "প্রযোজ্য ক্ষেত্রে" শব্দগুচ্ছটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নকে কার্যত বিবেচনানির্ভর করে তোলে। এর ফলে অনেক প্রকল্পে বাস্তুসংস্থান, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্থানচ্যুতি, জীবিকা, জীবনযাত্রার মান এবং সামাজিক বৈষম্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের বাইরে থেকে যেতে পারে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মতামত যথাযথভাবে বিবেচিত না হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়, যা জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির নীতিকে দুর্বল করতে পারে।

- **আপিলে ২৫% অর্থ জমার শর্তের আইনগত ও প্রায়োগিক অনিশ্চয়তা:** বিধি ২৭(২)(ঘ) অনুযায়ী, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ক্ষতির জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের ২৫% অর্থ জমা দিতে হয়। তবে এই অর্থের প্রকৃতি (জামানত নাকি অগ্রিম পরিশোধ), আপিলে সফল হলে অর্থ ফেরতের বিধান, ফেরতের প্রক্রিয়া এবং আপিল নিষ্পত্তির পূর্বে অর্থ জমা দেওয়ার আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে বিধিমালায় কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে বিধানটির বাস্তব প্রয়োগে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আপিলের অধিকার প্রয়োগে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর আপিল সংক্রান্ত বিধানের সঙ্গে এই শর্তের সম্পর্কও স্পষ্ট নয়। ফলে বিধানটির বাস্তব প্রয়োগে আইনি ব্যাখ্যা, প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা এবং আপিল প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৩.৮ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২

পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ মূলত একজন ব্যক্তি (ক্ষমতাদাতা) কর্তৃক অন্য একজন ব্যক্তিকে (ক্ষমতাগ্রহীতা/প্রতিনিধি) তার পক্ষে আইনগত, আর্থিক বা সম্পত্তি-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণের প্রক্রিয়া ও বিধান নির্ধারণ করে। এতে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলের প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যাহারের নিয়ম, সাধারণ ও অপ্রত্যাহারযোগ্য (Irrevocable) পাওয়ার অব অ্যাটর্নির ধরন, প্রতিনিধির ক্ষমতার সীমা ও দায়বদ্ধতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধে বিভিন্ন আইনি বিধান অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির প্রদত্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির বৈধতা, সত্যায়ন ও কার্যকরতার বিষয়েও এ আইনে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, আইনটি প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আইনি বৈধতা, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে।

বেসরকারি আবাসন খাতে এই আইন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি জমির মালিকের কাছ থেকে সরাসরি জমির মালিকানা ক্রয় না করে উন্নয়ন চুক্তির (Development Agreement) মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ ধরনের চুক্তিতে জমির মালিক তার জমির মালিকানা বহাল রাখলেও প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, প্লট বা ফ্ল্যাট বিক্রয়, দলিল সম্পাদন, নিবন্ধন এবং অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডেভেলপারকে অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (আইপিএ) (Irrevocable Power of Attorney-IPA) প্রদান করেন। দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিপুল বিনিয়োগ এবং একাধিক ক্রেতার সঙ্গে ধারাবাহিক লেনদেন নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করার জন্য সাধারণত আইপিএ প্রদান করা হয়, যাতে ডেভেলপার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা লাভ করেন, জমির মালিক প্রকল্প চলাকালে একতরফাভাবে ক্ষমতা প্রত্যাহার করতে না পারেন, এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত না হয়। জমির মালিক ও ডেভেলপারের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব এই দলিলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তবে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২-এর কয়েকটি বিধান বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে।

- **আইপিএর মেয়াদ নির্ধারণে অস্পষ্টতা:** আইনের ধারা ৪(১)-এ আইপিএর নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ তৈরি হয়, যা ভূমি মালিকের সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে দেয় এবং স্বার্থের সংঘাত, দলিলের অপব্যবহার ও জালিয়াতির ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

- **মেয়াদোত্তীর্ণের পর ক্ষমতা বহাল রাখার বিধানের ঝুঁকি:** ধারা ৪(২)-এ মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আইপিএর ক্ষমতা বহাল রাখার বিধান রয়েছে, যা ডেভেলপার বা ক্ষমতাগ্রহণকারীকে অতিরিক্ত ও অনির্ধারিত ক্ষমতা প্রদান করে। ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার, দলিল জালিয়াতি এবং আইনি বিরোধের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
- **আইপিএর মেয়াদ বৃদ্ধির সীমা নির্ধারণে ঘাটতি:** ধারা ৪(৫)-এ আইপিএর মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হলেও এর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে বারবার মেয়াদ বৃদ্ধি করে কার্যত স্থায়ী ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়, যা ভূমি মালিকের অধিকার ক্ষুণ্ন করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- **উত্তরাধিকারীদের ওপর দায়-দায়িত্ব স্থানান্তরের বিধানগত সীমাবদ্ধতা:** ধারা ৪(৬)-এ পাওয়ারদাতার মৃত্যু বা অক্ষমতার পর আইপিএর দায়-দায়িত্ব উত্তরাধিকারীদের ওপর বর্তানোর বিধান থাকলেও ওয়ারিশদের সম্মতি বা সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এর ফলে উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে বিরোধ, দলিল জালিয়াতি এবং সম্পত্তি-সংক্রান্ত আইনি জটিলতার ঝুঁকি তৈরি হয়।
- **ক্ষমতাগ্রহীতার জবাবদিহি ও তদারকি ব্যবস্থার ঘাটতি:** ধারা ৭ অনুযায়ী ক্ষমতাগ্রহীতার সম্পাদিত কার্যকে ক্ষমতাদাতার কার্য হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ক্ষমতাগ্রহীতার জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও ক্ষমতা ব্যবহারের ওপর কার্যকর নজরদারির কোনো পৃথক আইনি কাঠামো নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হলেও তার দায় অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাদাতার ওপর বর্তায় এবং ডেভেলপার বা ক্ষমতাগ্রহণকারী এ বিধান ব্যবহার করে নিজেদের কার্যক্রমকে বৈধ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। এতে ক্ষমতাদাতার জন্য কার্যকর আইনি প্রতিকার পাওয়া আরও জটিল হয়ে পড়ে।

সার্বিকভাবে, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হলো – আইপিএর মাধ্যমে উন্নয়ন চুক্তির আওতায় ডেভেলপার জমির মালিকানা হস্তান্তর ছাড়াই জমি উন্নয়ন, প্লট বা ফ্ল্যাট বিক্রয়, দলিল সম্পাদন, হস্তান্তর এবং অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু এ ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের মেয়াদ, পরিধি, জবাবদিহি এবং তদারকি নিশ্চিত করার জন্য আইনে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণমূলক বিধান নেই। ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বার্থের সংঘাত, দলিল জালিয়াতি এবং ভূমি মালিকের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে জমির মালিকানা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে জমি ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত স্ট্যাম্প ডিউটি ও নিবন্ধন ফি আদায়ের বিদ্যমান পদ্ধতিও পরিহার করা সম্ভব হয়, যা রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আহরণে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

৩.৯ রিহ্যাবের ব্যবসায়িক আচরণবিধি সম্পর্কিত উপ-আইনসমূহ (Bye-Laws on Code of Business Conduct)

উপরিউক্ত আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনার পাশাপাশি রিহ্যাবের Bye-Laws on Code of Business Conduct পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটি বাধ্যতামূলক আইন নয়, বরং একটি আচরণবিধি (code of conduct), যা সদস্যদের (রিয়েল এস্টেট কোম্পানি) জন্য মানদণ্ড ও নৈতিক দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে। এটি মানা বাধ্যতামূলক না হলেও সদস্যপদ, সুনাম ও পেশাগত চর্চার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি লঙ্ঘন করলে সাধারণত সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শাস্তি হতে পারে, কিন্তু সরাসরি রাষ্ট্রীয় আইনের মতো শাস্তি নয়। রিহ্যাবের Bye-Laws on Code of Business Conduct পর্যালোচনায় কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হলো।

- **সাংগঠনিক বাস্তবায়ন ও শাস্তির অভাব [বিধি এ(১)(২)]:** অনুমোদন ছাড়া কাজ, বিজ্ঞাপন বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর শাস্তি বা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই।
- **ভোক্তা সুরক্ষার ঘাটতি [বিধি এ(৩)]:** চুক্তি, প্রকল্প বিলম্ব বা বাতিলের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকার নেই।
- **অস্পষ্ট সংজ্ঞা ও শর্ত [বিধি এ (৭)(১৩)]:** গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সংজ্ঞা (Habitual Defaulter, Force majeure, Chronic Defaulter, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা) অস্পষ্ট, ফলে অপব্যাখ্যার সুযোগ থাকে ।
- **ক্ষতিপূরণ ও সুদের অভাব [বিধি এ(৭)(১৪)]:** বিলম্ব, বাতিল বা অর্থ ফেরতের ক্ষেত্রে সুদ ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণের সুস্পষ্ট বিধান নেই।

- **স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার অভাব [বিধি এ(৭)(৬)]:** ১০% কর্তন[৬৫], নোটিশ প্রক্রিয়া ও বরাদ্দ বাতিলের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি আছে।
- **ডেভেলপারের দায় এড়ানোর সুযোগ [বিধি এ(১৩)]:** Force Majeure-এর মতো শর্ত ব্যবহার করে ডেভেলপার সহজেই দায়মুক্ত হতে পারে।
- **বাজারভিত্তিক ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নেই [বিধি এ(৮)]:** "বাজারমূল্যে ভাড়া"[৬৬] নির্ধারণের নিরপেক্ষ পদ্ধতি অনুপস্থিত।
- **গ্রাহকের ওপর অতিরিক্ত শর্ত ও অসম শাস্তি [বিধি এ(৮)]:** গ্রাহকের জন্য কঠোর কিস্তির শর্ত থাকলেও ডেভেলপারের জন্য সমমানের দায়বদ্ধতা নেই। একইভাবে গ্রাহকের জন্য কঠোর শাস্তি থাকলেও ডেভেলপারের জন্য একই ধরনের শাস্তি নেই।
- **মধ্যস্থতা ব্যবস্থার অস্পষ্টতা [বিধি এ (৮)(১৩)]:** মধ্যস্থতার কাঠামো, সময়সীমা ও কার্যকরতা নির্দিষ্ট নয়।
- **স্বাধীন তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থার অভাব [বিধি এ(১৩)(১৪)]:** স্বাধীন তদন্ত কমিটি ও গ্রাহকের সরাসরি অভিযোগের স্পষ্ট ব্যবস্থা নেই।
- **বন্ধক ব্যবস্থার ঝুঁকি [বিধি এ(১৫)]:** গ্রাহকের সম্মতি ছাড়া সম্পত্তি বন্ধক রাখার বিষয়ে স্পষ্টতা নেই।

রিহ্যাবের এই আচরণবিধিতে আইনগত সংস্থার সাথে সমন্বয় ও প্রয়োগের সুস্পষ্ট বিধান নেই, জরিমানা ও শাস্তির নির্দিষ্ট হার বা কাঠামো নির্ধারিত নয়, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ভুক্তভোগী গ্রাহক বা ভূমি মালিকের বক্তব্য শোনার বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ সীমিত, তদন্ত, বিচার ও শাস্তি – সবই রিহ্যাবের নির্বাহী কমিটির ওপর নির্ভরশীল, যা পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতির আশঙ্কা তৈরি করতে পারে, এবং শুধু আর্থিক জরিমানা, সদস্যপদ স্থগিত বা বাতিল করার কথা বলা হলেও গ্রাহকের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা নেই। সার্বিকভাবে, রিহ্যাবের এই আচরণবিধিতে সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ভোক্তা সুরক্ষার উল্লেখযোগ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

৩.১০ বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভেলপার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএলডিএ)-এর আচরণবিধি (Code of Business Conduct)

এই আচরণবিধি মূলত বিএলডিএর সদস্যভুক্ত রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিকতা, সততা, ভাবমূর্তি ও সুনাম বজায় রাখা ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছে। বিএলডিএর আচরণবিধির ঘাটতিগুলো নিম্নে দেওয়া হলো।

- **শাস্তি, প্রয়োগ ও তদারকির দুর্বলতা (বিধি ১, ১৩, ১৮):** নিয়ম ভঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি কাঠামো নেই; মনিটরিং, অডিট, কমপ্লায়েন্স যাচাই বা এনফোর্সমেন্ট মেকানিজম অনুপস্থিত, ফলে আচরণবিধি মূলত ঘোষণামূলক থেকে যায়।
- **রাষ্ট্রীয় আইন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে সংযোগের ঘাটতি (বিধি ১, ৭, ৮):** রাজউক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ভোক্তা অধিকার আইন ইত্যাদি মানার স্পষ্ট বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে আইনগত দায়বদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা তৈরি হয়।
- **অস্পষ্ট নৈতিক ধারণা ও মানদণ্ড (বিধি ২, ৫):** "সুনাম", "মর্যাদা", "ক্ষতিকর কার্যকলাপ" ইত্যাদি শব্দের কোনো অপারেশনাল সংজ্ঞা নেই, ফলে ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি হয়।
- **ভোক্তা ও জনস্বার্থের অনুপস্থিতি (বিধি ২, ৪, ৫):** আচরণবিধি মূলত ডেভেলপারদের সুনাম ও ব্যবসায়িক স্বার্থকেন্দ্রিক; ক্রেতার অধিকার, অভিযোগ নিষ্পত্তি বা ক্ষতিপূরণ কাঠামো অনুপস্থিত।
- **পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নের ঘাটতি (বিধি ৩, ১৩):** সবুজ জায়গা, ড্রেনেজ, পরিবেশ সংরক্ষণ, ইআইএ/ টিআইএ বা টেকসই নগরায়নের নির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় সামাজিক ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতা উপেক্ষিত হয়েছে।
- **অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার অভাব (বিধি ৩):** স্থানীয় জনগণ, স্টেকহোল্ডার বা ক্রেতার অংশগ্রহণের কোনো প্রক্রিয়া নেই।

[৬৫] Chronic Defaulter-দের ক্ষেত্রে প্লট/ফ্ল্যাটের বরাদ্দ বাতিল হলে গ্রাহক প্রদত্ত অর্থ ফেরত পাবেন, তবে ১০% কর্তন হবে এবং তা ৬০ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে।

[৬৬] গ্রাহকের সাথে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে ফ্ল্যাট/প্লট হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হলে দেরি হলে গ্রাহককে মাসিক ভাড়ার হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে গ্রাহক ভাড়া বাসায় থাকলে, তাকে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বাজারমূল্যে বাসা ভাড়া দিবে।

- **স্বচ্ছতার অভাব (বিধি ৭, ৮, ৯):** প্লট বুকিং, মূল্য নির্ধারণ, অতিরিক্ত চার্জ, তথ্য প্রকাশ ও ঝুঁকি-সংক্রান্ত তথ্য সম্পূর্ণ প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই।
- **লুকানো চার্জ ও আর্থিক অপব্যবহারের ঝুঁকি (বিধি ৯, ১১):** রিজার্ভ তহবিল, ইউটিলিটি চার্জ, উন্নয়ন ব্যয় ইত্যাদির সীমা বা অডিট ব্যবস্থা না থাকায় আর্থিক স্বচ্ছতা ক্ষুণ্ন হয়।
- **ক্ষতিপূরণ কাঠামোর দুর্বলতা (বিধি ১০, ১২, ১৮):** বিলম্ব, বাতিল বা অসম্পূর্ণ প্রকল্পে সুদসহ বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই; জরিমানার মানদণ্ডও অনির্দিষ্ট।
- **ডেভেলপারের প্রভাবশালী অবস্থান (বিধি ৭, ১২, ১৩):** Mutual Agreement বা Force Majeure-এর মতো শর্ত ডেভেলপারদের একতরফা সুবিধা দেয় এবং ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করে। Force Majeure-এর সংজ্ঞা অস্পষ্ট হওয়ায় ডেভেলপাররা সহজেই দায় এড়াতে পারে।
- **বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার দুর্বলতা (বিধি ১৪):** স্বাধীন, নিরপেক্ষ, সময়সীমাবদ্ধ ও বাধ্যতামূলক বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution- ADR) কাঠামো নেই।
- **দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি (সামগ্রিক):** আইনগত সংস্থা বা সরকারকে রিপোর্টিং, সমন্বয়ের কোনো স্পষ্ট কাঠামো নেই।
- **শাস্তির অস্পষ্টতা (বিধি ১, ১০, ১৮):** জরিমানা, লাইসেন্স বাতিল বা অন্যান্য শাস্তির পরিমাণ, ধাপ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারিত নয়।

দেখা যাচ্ছে, এই আচরণবিধি মূলত স্ব-নিয়ন্ত্রিত ও ঘোষণামূলক, যেখানে ভোক্তা সুরক্ষা, আইনগত জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও আর্থিক নিরাপত্তা, স্বাধীন তদারকি ও প্রয়োগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিদ্যমান।

৩.১১ উপসংহার

উপর্যুক্ত আইন, বিধিমালা ও আচরণবিধিসমূহের বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয়, বেসরকারি আবাসন খাতে একটি বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক আইনগত কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও এর গঠনগত ও বিধানগত ঘাটতি "আইনের শাসন" প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। এসব ঘাটতির মধ্যে সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা ও ব্যাখ্যাগত দুর্বলতা উল্লেখযোগ্য, যা প্রায় সব আইন ও বিধিমালায় একটি সাধারণ সমস্যা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এর ফলে একই বিধান বিভিন্নভাবে প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠে, যা আইনের নিরপেক্ষতা ও স্থিরতা ক্ষুণ্ন করে। আইন ও বিধিমালার মধ্যে অসামঞ্জস্য ও সাংঘর্ষিকতা আরেকটি বড় কাঠামোগত সমস্যা, যা সমন্বিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা ও দ্বৈততা সৃষ্টি করে। অধিকাংশ আইন ও বিধিমালায় অনুমোদনপূর্ব শর্ত থাকলেও অনুমোদনপরবর্তী পর্যায়ে কার্যকর তদারকির সুস্পষ্ট কাঠামো অনুপস্থিত। ফলে আইনগত নির্দেশনা বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দুর্বল। শাস্তি, ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা আইনের প্রতিরোধমূলক ও সংশোধনমূলক কার্যকরতাকে ক্ষুণ্ন করে। অনেক ক্ষেত্রে শাস্তির ধরন, পরিমাণ বা প্রয়োগ পদ্ধতি নির্দিষ্ট নয়; আবার ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের জন্য ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকার পাওয়ার সুস্পষ্ট বিধানও অনুপস্থিত।

ভোক্তা সুরক্ষা ও অংশীজনের অধিকার সুরক্ষায় ঘাটতি বিদ্যমান। আইন ও আচরণবিধির অনেক ক্ষেত্রে ডেভেলপার-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়, যেখানে ক্রেতা, ভূমির মালিক বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অধিকার, মতামত ও স্বার্থ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এর সাথে অতিরিক্ত স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আইনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিকে দুর্বল করে। রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানগুলোর আচরণবিধিগুলো মূলত স্বেচ্ছাভিত্তিক, ঘোষণামূলক, এবং কার্যকর প্রয়োগ, শাস্তি, স্বাধীন তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির কাঠামো অনুপস্থিত। ফলে এগুলো নৈতিক নির্দেশিকা হিসেবে সীমাবদ্ধ থেকে যায়, এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করতে পারে না।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও আচরণবিধি বেসরকারি আবাসন খাত পরিচালনার জন্য একটি প্রাথমিক আইনি ভিত্তি প্রদান করলেও বিভিন্ন বিধানের অস্পষ্টতা, আইনসমূহের মধ্যে অসামঞ্জস্য, প্রক্রিয়াগত ঘাটতি, দুর্বল তদারকি এবং সীমিত প্রতিকার ব্যবস্থার কারণে আইন বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে একাধিক কাঠামোগত দুর্বলতা বিদ্যমান।

চতুর্থ অধ্যায়

সক্ষমতা, কার্যকরতা এবং স্বচ্ছতা

বেসরকারি আবাসন খাতের প্রেক্ষাপটে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকরতা কেবল দাপ্তরিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি আবাসন চাহিদা পূরণে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সামর্থ্য, উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ মানবসম্পদ এবং বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর কৌশলের এক সমন্বিত রূপ। অন্যদিকে স্বচ্ছতা সুশাসনের এমন এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ যা প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনআস্থা এবং অংশীজনদের মধ্যকার বিশ্বাসযোগ্যতাকে সুসংহত করে। নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ব্যবসায়িক লেনদেন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, তথ্যে সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা, হালনাগাদ তথ্য সংবলিত কার্যকর ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন কার্যক্রমে সত্যনিষ্ঠা বজায় রাখা একটি জবাবদিহিমূলক আবাসন সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান অধ্যায়ে বেসরকারি আবাসন খাতের বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকরতা এবং স্বচ্ছতার বিভিন্ন মাত্রা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.১ বেসরকারি আবাসন খাতের সক্ষমতা ও কার্যকরতা

৪.১.১ মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি

সরকারি প্রতিষ্ঠান: আবাসন খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা রাজউকসহ ঢাকা জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা ওয়াসা এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যা বেসরকারি আবাসন খাতের সুশাসন ও কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করার পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বিশেষ করে রাজউকের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবলের প্রায় ৩১% পদই শূন্য।[৬৭] ফলে রাজউকের অধীনে ঢাকার বিশাল নগর এলাকার (প্রায় ১,৫২৮ বর্গকিমি) উন্নয়ন কার্যক্রম এই সীমিত জনবল দিয়ে তদারকি করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তদারকি সক্ষমতার এই ঘাটতির প্রতিফলন ঘটে রাজউকের আওতাধীন এলাকার বিপুল সংখ্যক অনুমোদনহীন স্থাপনার পরিসংখ্যানে। রাজউকের অধীনে থাকা প্রায় ২১ লক্ষ স্থাপনার একটি বিশাল অংশই অনুমোদিত নকশাবহির্ভূত, যার মধ্যে ১৫-১৬ তলার বহুতল ভবনও অন্তর্ভুক্ত।[৬৮]

২০২২ সালের ড্যাপ অনুযায়ী ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে রাজউক এলাকায় ২০ লক্ষ ৬০ হাজার ১৬০টি অনুমোদনহীন ভবন নির্মিত হয়েছে।[৬৯] অনেক ক্ষেত্রে জলাশয়, বন্যাপ্রবাহ এলাকা কিংবা কৃষি জমি ভরাট করে এসব স্থাপনা গড়ে উঠেছে। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, পর্যাপ্ত জনবল ও কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থার অভাবে আবাসন খাতে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া প্রায় ভেঙে পড়েছে, যা পরিকল্পিত নগরায়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

> "আমাদের তো লিমিট আছে... আমাদের এই এলাকার ভিতরে ঢাকা ১,৫২৮ বর্গকিলোমিটার... আমার দুইজন অফিসার, এদের আন্ডারে সম্প্রতি চারজন নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে... এই ১,৫২৮ বর্গকিলোমিটারে কেবল পূর্বাচলেই ২৬ হাজার প্লাস প্লট আছে... ২৬ হাজার প্লটের ভিতরে যদি আপনার ৫ হাজার লোকের গ্যাঞ্জাম থাকে, আবার বসুন্ধরাতে ৩০ হাজার প্লট এবং অন্যান্য প্রজেক্ট মিলিয়ে প্রায় ৫৫ হাজারের মতো প্লট এই অ্যাপ্রুভড (অনুমোদিত) সেক্টরে আছে... এই অ্যাপ্রুভড সেক্টরগুলোর ভেতরে রেজিস্ট্রি বা অন্যান্য আইনি ঝামেলা সামলানোর

[৬৭] *প্রথম আলো*, 'সেবায় মনোযোগ কম, রাজউক যেন এখন 'ভাঙাভাঙি'র প্রতিষ্ঠান,' ৩১ আগস্ট ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/gdvvg3vml1 (৮ এপ্রিল ২০২৬)।

[৬৮] *বিজনেস বার্তা*, 'অবৈধ ২১ লক্ষ ভবনের বৈধতা দিতে নতুন নীতিমালা,' ০৩ অক্টোবর ২০২৫, https://businessbarta.net/অবৈধ-২১-লাখ-ভবনের-বৈধতা-দি/ (৮ এপ্রিল ২০২৬); *দৈনিক স্বাধীন কাগজ*, 'রাজউক নকশাবিহীন ভবনকে বৈধতা দিতে নতুন নীতিমালা রাজধানীতে অবৈধ বহুতল ভবন রয়েছে ২১ লক্ষ,' ০৩ অক্টোবর ২০২৫, https://swadhinkagoj.com/archives/23128 (৮ এপ্রিল ২০২৬)।

[৬৯] *প্রাগুক্ত*।

জন্য রাজউকের যে বর্তমান সক্ষমতা, তা যথেষ্ট নয়... এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য রাজউকের একটি আলাদা বা স্বতন্ত্র কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন...।"

– পরিকল্পনা উইং-এর একজন নগর পরিকল্পনাবিদ, রাজউক

জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত সংকট কেবল রাজউকের নয়, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্রকৌশল ও সমন্বয় উইং-এর একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সাক্ষাৎকার অনুযায়ী, বর্তমানে সারা দেশের অনিবন্ধিত আবাসন প্রকল্প তদারকি, আইন ও বিধি প্রয়োগ, উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক দায়িত্ব পালনের জন্য জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে মাত্র পাঁচজন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে একজন কর্মকর্তাকে একাধিক অঞ্চল বা জেলার দায়িত্ব একযোগে পালন করতে হয়,[৭০] যার কারণে নিয়মিত মাঠপর্যায়ের পরিদর্শন, আইন প্রয়োগ, অভিযোগ তদন্ত এবং কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করা অত্যন্ত কঠিন। এই সীমিত জনবল জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক সক্ষমতা ও কার্যকরতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করে তুলেছে এবং আবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রাতিষ্ঠানিক অন্তরায় হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

একইভাবে বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে (যেমন ডিটিসিএ, ওয়াসা, ঢাকা জেলা প্রশাসনের এসিল্যান্ড অফিস, ইউটিলিটি সেবা সরবরাহকারী সংস্থা) এ ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল ঘাটতির কারণে মাঠ পর্যায়ে বেসরকারি আবাসন প্রকল্পগুলোর সঠিক মনিটরিং নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল, বিশেষ করে পরিবেশবিদ বা সহকারী পরিবেশবিদ নিয়োগ না হওয়া এবং পরিবেশ সেলের কার্যক্রম কাগুজে পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা তদারকি ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে। একইসাথে রাজউকসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা এবং দায়িত্ব পালনে অনীহা বা সদিচ্ছার অভাবও লক্ষ করা যায়। ফলে ডেভেলপারদের ইউটিলিটি সেবা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় না। সার্বিকভাবে, ইউটিলিটি সেবা সরবরাহে এই দুর্বলতা নগর ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতিকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে এবং টেকসই নগর উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়।

রিয়েল এস্টেট কোম্পানি: জনবল ঘাটতি কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানেই নয়, বরং রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যেও বিদ্যমান। অনেক ডেভেলপার কোম্পানি কেবল নামমাত্র নিবন্ধন ফি জমা দিয়ে এবং নথিপত্র দেখিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও বাস্তবে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ ভূমি, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো কিংবা দক্ষ জনবল যেমন প্রয়োজনীয় স্থপতি, প্রকৌশলী ও নগর পরিকল্পনাবিদসহ দক্ষ কর্মীবাহিনী থাকে না।

৪.১.২ ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিচারিক কাঠামোতে বিচারক সংখ্যার ঘাটতি

ভূমি ও আবাসন-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার সীমিত সক্ষমতা এবং দীর্ঘসূত্রিতা বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়। আইন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী বিচারক সংকটের কারণে বাংলাদেশে মামলাজট ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৪৭,৪২,৭৩১টি।[৭১] একই সময়ে বাংলাদেশে গড়ে ৭৮,০২৩ জন মানুষের জন্য মাত্র একজন বিচারক দায়িত্ব পালন করছেন, যা বিচারপ্রার্থীদের দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে।[৭২]

আইন কমিশন (২০২৩) বিচারকস্বল্পতাকে মামলাজটের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গবেষণায় দেখা যায়, আইনজীবীদের একাংশের অসততা, দায়িত্বে অবহেলা, আইনি দূরদর্শিতার ঘাটতি, জবাবদিহিতার অভাব ও অসহযোগিতামূলক

[৭০] উদাহরণস্বরূপ, খুলনা জেলায় কর্মরত একজন কর্মকর্তাকে একাই ১৭টি জেলার ভূমি উন্নয়ন তদারকি কার্যক্রম দেখভাল করতে হয়।

[৭১] *বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, 'লাগামহীন মামলাজট,' ৩০ মার্চ ২০২৬, https://www.banglanews24.com/law-court/news/bd/1645342.details (৮ এপ্রিল ২০২৬)।

[৭২] ভারতে বিচারক প্রতি জনসংখ্যা ৬৮,৭৭৫ জন, পাকিস্তানে ৮১,৪১৭ জন, নেপালে ৬৩,০০০ জন, শ্রীলঙ্কায় ৫৫,০০০ জন, মালদ্বীপে ৪,৯৭৭ জন, ভুটানে ১৩,২৭৮ জন, আফগানিস্তানে ৫৯২,৩৬১ জন। এছাড়া যুক্তরাজ্যে বিচারক প্রতি জনসংখ্যা ১৩,১৪০ জন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৬,৬৬৭ জন। সূত্র: *দি ডেইলি স্টার*, 'আদালতগুলো বিচারকের ঘাটতি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে,' ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www-thedailystar-net./news/bangladesh/news/courts-grapple-shortage-judges-3981411 (৮ এপ্রিল ২০২৬)।

মনোভাবসহ আন্তরিকতার ঘাটতির কারণে অপ্রয়োজনীয় মামলার সংখ্যা প্রায় ৫০-৬০% বৃদ্ধি পায় এবং মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বাড়ে (আইন কমিশন, ২০২৩)। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব বেসরকারি আবাসন খাতেও পরিলক্ষিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট ও আদালত সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশের আদালতগুলোতে জমির শেয়ারভিত্তিক আবাসন প্রকল্পে প্রতারণার অভিযোগে ৯,৮২৩টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যেখানে প্রায় ৪০,০০০ ক্রেতা সরাসরি জড়িত এবং প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকার আর্থিক স্বার্থ অবরুদ্ধ রয়েছে (প্রতি মামলায় গড় আর্থিক স্বার্থ প্রায় ১.২২ কোটি টাকা)। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সারা দেশে বিচারাধীন এসব মামলার মধ্যে ৫,৯৪৮টি (প্রায় ৬০.৫%) ঢাকা মহানগর ও জেলা আদালতে বিচারাধীন, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৪,৫০০ কোটি টাকা। সে হিসাবে ঢাকার মহানগর ও জেলা আদালতে বিচারাধীন প্রতিটি মামলায় গড়ে প্রায় ৭৫.৬৫ লাখ টাকার আর্থিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে।[৭৩] অর্থাৎ, জাতীয় পর্যায়ে বিচারাধীন মোট মামলার প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক মূল্যের প্রায় ৩৭.৫%ই ঢাকা অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই পরিসংখ্যান ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভূমি-অংশীদারত্বভিত্তিক আবাসন বিরোধের ব্যাপকতা এবং ক্রেতাদের বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ দীর্ঘদিন ধরে আইনি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় অবরুদ্ধ থাকার বিষয়টি তুলে ধরে। ফলে কার্যকর ও সময়োপযোগী বিচারপ্রক্রিয়ার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেতাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ডেভেলপারদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা দীর্ঘ মেয়াদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৪.১.৩ দক্ষতার ঘাটতি ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতা

বেসরকারি আবাসন খাতের সুশাসন ও কারিগরি মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রযুক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি বিদ্যমান। প্রথমত, রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনাগত কৌশল, দীর্ঘমেয়াদী অভিজ্ঞতা এবং কর্মীদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে কারিগরি ও পরিবেশগত মূল্যায়নের মতো সংবেদনশীল কাজ অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের বদলে তুলনামূলকভাবে কম অভিজ্ঞ বা নবীন গ্র্যাজুয়েটদের দিয়ে সম্পন্ন করা হয়, যার ফলে পরিবেশগত ঝুঁকির প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না। তদুপরি, রিয়েল এস্টেট কোম্পানির চাপে এবং অধিক মুনাফার প্রলোভনে প্রয়োজনীয় সময়ের তুলনায় দ্রুত প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে ইআইএ ও টিআইএর গুণগত মান মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।

প্রযুক্তিগত সক্ষমতার এই সীমাবদ্ধতা বিশেষ করে টিআইএর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। বাংলাদেশে বর্তমানে টিআইএর জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা বা নির্ভরযোগ্য ডেটাবেইস নেই এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এটি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে এলাকা অনুপাতে যানবাহনের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য কোনো মানসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত মানদণ্ড না থাকায় টিআইএ প্রতিবেদনে ট্রাফিক বিশ্লেষণ অনেকাংশেই অনুমাননির্ভর।

এছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোতেও প্রশিক্ষিত এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের চরম অভাব রয়েছে। উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি এবং আধুনিক নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকায় ডিজিটাল মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না।

৪.১.৪ নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদা পূরণে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির কার্যকরতার অভাব

মানুষের আবাসন ব্যবস্থার চাহিদা মেটাতে সারা বিশ্বে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।[৭৪] নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদা পূরণে সাশ্রয়ী আবাসন সরবরাহের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির কার্যকরতা ও ভূমিকা নিয়ে একটি কোম্পানির প্রতিনিধি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন -

> "অবশ্যই, বেসরকারি খাত না থাকলে এটি সম্ভব হতো না। সরকারি খাত যেমন রাজউক বা জাতীয় গৃহায়ন প্রতিষ্ঠান আছে, তবুও তারা সব মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। একটি দেশ চলমান অবস্থায় বেসরকারি খাত বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সেবা প্রদান করছে। উদাহরণস্বরূপ, হাসপাতাল খাতও এক ধরনের সেবা খাত এবং একইসঙ্গে

[৭৩] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'জমির শেয়ার বিক্রির নামে প্রতারণা: ৪০ হাজার ক্রেতার ১২ হাজার কোটি টাকা নিয়ে দেশজুড়ে প্রায় ১০ হাজার মামলা', ২৫ অক্টোবর ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-556576 (২৬ অক্টোবর ২০২৬)।

[৭৪] *অ্যাশিওর গ্রুপ* (তারিখবিহীন), 'বাংলাদেশের রিয়ের এস্টেটের ভবিষ্যত', https://www.assuregroupbd.com/media/blog/future-of-real-estate-bangladesh (০৫ নভেম্বর ২০২৫)।

ব্যবসা। বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন খাতও মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেক্ষেত্রে বেসরকারি খাত এগিয়ে না আসলে সাধারণ মানুষের জন্য এটি কখনোই সম্ভব হতো না...।"

আরেকটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রতিনিধি সরকারি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা ও বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন কোম্পানি দ্বারা সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ বিষয়ে বলেন -

"মূলত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এটা করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে... এমনকি একটা শ্রেণির মানুষকে মালিকানো দিয়েছে। হয়তো যারা কখনো আশা করিনি যে ঢাকা শহর এক খন্ড জমি হবে। এটি কিন্তু বেসরকারি আবাসন প্রকল্পগুলোই করেছে। সরকারিতে তো সবাই পারে না...।"

এ বিষয়ে আরেকটি কোম্পানির প্রতিনিধি তাদের নিজস্ব প্রকল্পগুলোর বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলেন -

"আমাদের প্রকল্পগুলোর এমন, যে কেউ চাইলে এখনই সেখানে প্লট ক্রয় করে আবাসন গড়তে পারেন...."।

প্রচলিত আইন ও নীতিমালায় সাধারণত রিয়েল এস্টেট কোম্পানির উদ্দেশ্যকে "আবাসন চাহিদা পূরণ" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদা পূরণে সাশ্রয়ী আবাসন সরবরাহের ক্ষেত্রে তা কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়, সেটি বোঝার জন্য এই গবেষণায় বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট কোম্পানি থেকে প্রচারিত প্লট বিক্রয়ের ১৫০টিরও বেশি বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি পূর্ণাঙ্গ তিন ধাপের[৭৫] বিশ্লেষণ পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ কাঠামো তৈরি করে ঢাকা শহরের বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনের সামাজিক ও প্রতীকী বার্তা (Social-Semiotic meaning) উদাঘাটন করা হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিজ্ঞাপনগুলো নিরাপদ বিনিয়োগ, বিলাসবহুল জীবনধারা, আধুনিক সুযোগসুবিধা, এবং এলিট সামাজিক মর্যাদা কেন্দ্রিক নগরজীবনের প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনের মূল ফোকাস উচ্চ আয়ের ও আধুনিক জীবনধারার ক্রেতা। নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত আয়ের মানুষদের আবাসনের দিকে খুব কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংকেত/প্রতীকাত্মক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিজ্ঞাপনগুলো থেকে Semiotic অর্থে বলা যায় "অন্তর্ভুক্তিমূলক নগরায়ন (Inclusive Urbanism)" নয়, বরং "নির্বাচিত শহুরে আধুনিকতা (Selective Urban Modernity)" প্রচার করছে, যেখানে নিম্নবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি নেই। প্রতিটি বিজ্ঞাপন একটি "স্বপ্নের আধুনিক ও বিলাসবহুল নগর জীবন" এবং "লাভজনক বিনিয়োগ" ইমেজ তৈরি করছে, যা মূলত উচ্চ-আয়ের শ্রেণিকে লক্ষ্য করে পরিকল্পিত। এখানে বিজ্ঞাপনগুলো কী ধরনের "চিহ্ন বা প্রতীক" ব্যবহার করে তা দেখলে বোঝা যায়, নিম্নবিত্ত জীবনের বাস্তবতা থেকে দূরে থাকা একটি "কল্পিত অভিজাত জগৎ" (Imagined Elite World) তৈরি করা হয়েছে।

আর **গভীর অর্থ ও বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণে** দেখা যায় লাভ, বিনিয়োগের নিরাপত্তা, ছবিতে উচ্চবিত্ত পরিবার/ অভিজাত পরিবারের উপস্থিতি, সরকার অনুমোদিত প্রকল্প ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট বাজারকে শুধু বসবাসের স্থান নয়, বরং একটি বিনিয়োগ ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ বেসরকারি রিয়েল এস্টেট বিজ্ঞাপনগুলো "বসবাসের অধিকারের" পরিবর্তে "বিনিয়োগ ও মর্যাদার অধিকার"কে প্রাধান্য দিয়েছে। এতে করে নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি কার্যত বাজার ও ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই অদৃশ্য এবং তাদের প্রয়োজন, ভাষা বা বাস্তবতা উপেক্ষিত। পাশাপাশি ডিসকোর্সে নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের আবাসনের প্রয়োজন, ভাষা বা বাস্তবতা এবং তাদের জন্য সাশ্রয়ী আবাসন (Affordable Housing)-এর বিষয়গুলো অনুপস্থিত। বরং এখানে অভিজাত আকাঙ্ক্ষা (Elite Aspiration) ও বিলাসবহুল জীবনযাপনকেন্দ্রিক (Luxury Living) ভাষ্য প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির বিজ্ঞাপনগুলো শহরের উচ্চবিত্ত শ্রেণিকে কেন্দ্র করে একধরনের অনন্য বা বিশেষ শহুরে আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন (Exclusive Urban Dream) তৈরি করে, যেখানে উন্নয়ন মানে বিলাসিতা, নিরাপত্তা ও মর্যাদা। বিজ্ঞাপনের ভাষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,

[৭৫] আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis), সংকেত/প্রতীকাত্মক বিশ্লেষণ (Semiotic Analysis), এবং গভীর অর্থ ও বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণ (Discourse Analysis)।

এখানে একটি "আধুনিকতাবাদী উন্নয়ন ভাষ্য (Modernist-Developmental Discourse)" কাজ করছে, যেখানে শহুরে উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও আধুনিকতার সমন্বয়কে উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে উচ্চ আয়শ্রেণির মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনে মধ্যবিত্ত/নিম্নবিত্ত/নিম্ন-মধ্যবিত্তের উপস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায়

সারণি ৪. ১: বেসরকারি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনে নিম্নবিত্ত/নিম্ন-মধ্যবিত্তের উপস্থিতি

বিশ্লেষণের স্তর	মূল ফলাফল	মধ্যবিত্ত/নিম্নবিত্ত/নিম্ন-মধ্যবিত্তের উপস্থিতি	মূল অনুসিদ্ধান্ত
আধেয় বিশ্লেষণ	বিলাসবহুল জীবন, নিরাপদ বিনিয়োগ, আধুনিক নাগরিক সুবিধা	**প্রায় অনুপস্থিত**	নিম্নবিত্ত শ্রেণির জন্য কোনো স্পষ্ট অফার বা প্রকল্প নেই; প্রাধান্য উচ্চবিত্ত ও বিনিয়োগকারীদের
সংকেত/প্রতীকাত্মক বিশ্লেষণ	আধুনিকতা, নিরাপত্তা ও বিলাসিতার প্রতীকী চিত্র	**অনুপস্থিত**	প্রতীকের মাধ্যমে আধুনিকতা, নিরাপত্তা, বিলাসিতা তুলে ধরা হয়েছে; নিম্নবিত্ত অনুপস্থিত
গভীর অর্থ ও বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণ	উন্নয়ন, লাভজনক বিনিয়োগ ও মর্যাদা ভিত্তিক আবাসনের পুঁজিকেন্দ্রিক বয়ান	**সম্পূর্ণ বর্জিত**	আবাসন নয়, বরং বিনিয়োগ ও অভিজাত শ্রেণিকেন্দ্রিক ভাষা, যা শ্রেণিভিত্তিক বিভাজনকে আরও দৃঢ় করে

রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনে মধ্যবিত্ত/নিম্নবিত্ত/নিম্ন-মধ্যবিত্তের উপস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, কোম্পানিগুলোর বিপণন কৌশলে প্রধানত "আধুনিক ও বিলাসবহুল নগর জীবন" এবং "উচ্চ মুনাফাসম্পন্ন বা লাভজনক বিনিয়োগ"-এর বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু উচ্চ-আয়ের ও বিনিয়োগক্ষম ক্রেতাদের লক্ষ্য করে নির্মিত – এমন প্রবণতা প্রতীয়মান। এই প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয় বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পের জমি ও ফ্ল্যাটের বাজারমূল্য বিশ্লেষণে। দেখা যায়, অধিকাংশ প্রকল্পে প্রতি কাঠা জমি ও প্রতি বর্গফুট ফ্ল্যাটের মূল্য মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের গড় আয় ও ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ফলে প্রকল্পগুলোর অবস্থান, অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা এবং মূল্য কাঠামো মূলত উচ্চ-আয়ের ক্রেতাদের চাহিদাকে কেন্দ্র করেই বিন্যস্ত হয়েছে। এর বিপরীতে সাশ্রয়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আবাসন তুলনামূলকভাবে অনুপস্থিত। অর্থাৎ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের বিশাল জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার উপযোগী সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক মডেল ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং সামগ্রিক কার্যকরতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

৪.১.৫ ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকরতার সীমাবদ্ধতা

বেসরকারি আবাসন খাতে টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান অন্তরায় ইউটিলিটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকরতার ঘাটতি। ঢাকা ওয়াসার একজন উপ-সচিবের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডেভেলপার কোম্পানিগুলো স্থায়ী পয়ঃনিষ্কাশন প্ল্যান্ট (এসটিপি) নির্মাণের পরিবর্তে সাময়িকভাবে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার তৈরি করে কাজ চালিয়ে নেয়। পরবর্তীতে নিয়মিত নজরদারির অভাবে এসব রিজার্ভার থেকে বর্জ্যপানি অনেক সময় প্রকল্পের অভ্যন্তরে, পাশ্ববর্তী প্রকল্পে বা সংলগ্ন খোলা জায়াগায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে কিংবা অন্য প্রকল্পের ড্রেনেজ ব্যবস্থায় প্রবাহিত হয়, যার ফলে সীমান্ত অক্রিমকারী দূষণ (Cross-boundary Pollution), জলাবদ্ধতা এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এর ফলে মশার বিস্তারসহ স্থানীয় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর আশঙ্কাজনক ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা ওয়াসার এই কার্যকরতার ঘাটতি আরও স্পষ্ট হয় তাদের নীতিমালা প্রয়োগের ব্যর্থতায়। বেসরকারি আবাসন প্রকল্পে ইউটিলিটি ব্যবস্থাপনা তদারকির লক্ষ্যে ২০০৬ সালে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণীত হলেও দীর্ঘ সময় ধরে প্রশাসনিক সক্ষমতার অভাবে তার কোন রূপরেখা বাস্তবায়ন বা সময়োপযোগী হালনাগাদ করা হয়নি। ফলে যুগোপযোগী নীতিমালার অভাব এবং ক্ষেত্রপর্যায়ে কার্যকর মনিটরিং সক্ষমতা না থাকায় ঢাকা ওয়াসা বেসরকারি আবাসন খাতের অনিয়ন্ত্রিত পয়ঃনিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি অকার্যকর।

ফলে ইউটিলিটি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান ত্রুটিগুলো সময়মতো শনাক্ত ও সংশোধন করা সম্ভব হচ্ছে না, যা ঢাকা ওয়াসার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকরতার সীমাবদ্ধতাকেই নির্দেশ করে।

একইসাথে রাজউকসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা এবং দায়িত্ব পালনে অনীহা বা সদিচ্ছার অভাবও লক্ষ করা যায়। ফলে ডেভেলপারদের ইউটিলিটি সেবা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় না। সার্বিকভাবে, ইউটিলিটি সেবা সরবরাহে এই দুর্বলতা নগর ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতিকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে এবং টেকসই নগর উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪.১.৬ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংগঠনসমূহের (বিএলডিএ ও রিহ্যাব) প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অকার্যকরতা

বেসরকারি আবাসন খাতের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং এর প্রতিনিধিত্ব করতে রিহ্যাব ও বিএলডিএর মতো রিয়েল এস্টেট সংগঠনগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। এসব সংগঠনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সদস্যভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি, খাতভিত্তিক নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিত করা এবং ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করা। তবে এসব সংগঠনের ভূমিকা মূলত সদস্যভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও স্ব-নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রিক; সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতো এদের কোনো আইনগত প্রয়োগ ক্ষমতা নেই। রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের আইনি দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকায় সদস্য প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের ক্ষেত্রে সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ার সীমিত। ফলে এসব সংগঠন মূলত এই বলে দায় এড়িয়ে যায় যে, তাদের মূল কাজ সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সরকারের সাথে লিয়াজোঁ করা এবং নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ। অন্যদিকে, নিবন্ধনহীন রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, অনুমোদনহীন প্রকল্প, ভূমি উন্নয়ন আইন লঙ্ঘন কিংবা ক্রেতার আইনগত অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর মনিটরিং ও সদিচ্ছার ঘাটতি দেখা যায়।

বাজারে বৃহৎ ও প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া আধিপত্য পেশাজীবী সংগঠনগুলোর আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে বর্তমানে এক হাজারের বেশি নিবন্ধিত ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান থাকলেও মাত্র ১০ থেকে ১৫টি বৃহৎ কোম্পানি মোট আবাসন বাজারের প্রায় ৯৫% নিয়ন্ত্রণ করে (ইসলাম এবং আরেফিন, ২০০৯)। সংগঠনের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এই বৃহৎ কোম্পানিগুলোর প্রভাব এবং প্রতিনিধিত্ব বেশি থাকায় তাদের অনিয়ম, রাজউক অনুমোদিত নকশা লঙ্ঘন বা প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্লট হস্তান্তরে বিলম্বের বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা (যেমন সদস্যপদ বাতিল বা জরিমানা) গ্রহণ করার নজির বিরল, যা রিহ্যাব ও বিএলডিএর নিয়ন্ত্রণমূলক নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত রোডম্যাপের অভাব এবং অনিবন্ধিত ডেভেলপারদের তদারকি করতে না পারাও এসব সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতার চিত্র তুলে ধরে। জাতীয় গৃহায়ন নীতি ২০১৬ অনুযায়ী আবাসন খাতকে টেকসই ও সুশাসিত করার নির্দেশনা থাকলেও সংগঠনগুলোর সে ধরনের কোনো সুস্পষ্ট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নেই। এছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা রাজউকের মতো নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সমন্বয়হীনতার কারণে নিবন্ধনহীন বা অনুমোদনহীন ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বিরুদ্ধে এসব সংগঠন কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। ফলে সুনির্দিষ্ট মনিটরিং কাঠামোর অনুপস্থিতিতে আবাসন খাতে সুশাসন ও গুণগত পরিবর্তন আনয়নে রিয়েল এস্টেট সংগঠনগুলো কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

৪.১.৭ বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অকার্যকরতা

রিয়েল এস্টেট খাতে জড়িত সংস্থাগুলোর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োগে চরম অসমতা ও অকার্যকরতা পরিলক্ষিত হয়। রিহ্যাবের একটি 'মধ্যস্থতা সেল' (Mediation Committee) এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ও আপিল ব্যবস্থা থাকলেও বিএলডিএর কার্যকর ও প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধ নিষ্পত্তি সেল মূলত অনুপস্থিত। রিহ্যাবের সদস্যদের জন্য আচরণবিধি ও মানদণ্ড নির্ধারণের সুযোগ থাকলেও এর প্রয়োগ কেবল সংগঠনের সাংগঠনিক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে মধ্যস্থতা বা শালিসি ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রেতাদের দীর্ঘসূত্রতা ও প্রতারণা নিরসনে সংগঠনগুলো পূর্ণাঙ্গ সমাধান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর ধারা ৩৬ অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রথমে মধ্যস্থতা কমিটির মাধ্যমে এবং তা ব্যর্থ হলে 'রিয়েল এস্টেট ট্রাইব্যুনাল'-এ আপিল করার বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বতন্ত্র 'রিয়েল এস্টেট ট্রাইব্যুনাল' গঠিত না হওয়ায় এবং সাধারণ দেওয়ানি আদালতে মামলা স্থানান্তরিত হওয়ায় বিবাদ নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর সময় লাগে।

এই প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতার বড় কারণ গঠিত সেলগুলোর আইনি ক্ষমতা ও সদিচ্ছার ঘাটতি। উদাহরণস্বরূপ, রিহ্যাবের মধ্যস্থতা সেল কেবল তাদের সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর সীমিত সাংগঠনিক চাপ প্রয়োগ করতে পারে; কিন্তু কোনো অনিয়মকারী ডেভেলপার সদস্যপদ ত্যাগ করলে বা সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত অমান্য করলে রিহ্যাবের কোনো আইনি জরিমানা বা বাধ্যবাধকতা আরোপের ক্ষমতা থাকে না।[৭৬] অন্যদিকে, রাজউকের ক্ষেত্রে তদারকি ও অভিযোগ সেলের প্রশাসনিক কাঠামোর জটিলতার কারণে নিরপেক্ষ সমাধান পেতে গ্রাহকদের দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়। জাতীয় গৃহায়ন নীতি ২০১৬-তে স্বল্পব্যয়ী ও দ্রুততম সময়ে বিরোধ নিষ্পত্তির নির্দেশনা থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতি ও সমন্বয়হীনতার কারণে আবাসন খাতে গ্রাহক সুরক্ষা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অনানুষ্ঠানিক ব্যয় এবং জটিল আইনি প্রক্রিয়ার বাধ্যবাধকতা ভুক্তভোগী গ্রাহকদের জন্য আরেকটি বড় প্রতিবন্ধকতা। প্রাতিষ্ঠানিক দেওয়ানি মামলা পরিচালনা বা অপ্রাতিষ্ঠানিক মধ্যস্থতার বিভিন্ন ধাপে অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় হওয়ার কারণে অনেক ক্ষুদ্র প্লট ক্রেতা আইনি প্রতিকার চাওয়া থেকে বিরত থাকেন। একটি সুনির্দিষ্ট, দ্রুত ও বাধ্যতামূলক বিচারিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতির কারণে রিয়েল এস্টেট খাতের নিয়ন্ত্রক ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনাগত সক্ষমতার ঘাটতি ফুটে ওঠে, যা সামগ্রিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে।

৪.২ স্বচ্ছতার ঘাটতি

৪.২.১ প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

বেসরকারি আবাসন খাতের স্থায়িত্ব এবং জন-আস্থা মূলত সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক কার্যক্রমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং স্বচ্ছতার ওপর নির্ভরশীল। রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো তাদের প্রকল্পের প্রচার এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বহুমুখী বিপণন নীতি গ্রহণ করে থাকে। গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন আকর্ষণীয় অফার প্রদান করা হয়, যার মধ্যে বিনা মূল্যে হজ্জ বা ওমরাহ পালন প্যাকেজ, সহজ কিস্তি সুবিধা, বিশেষ নগদ মূল্যছাড়, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ প্যাকেজ এবং নানা ধরনের মূল্যবান উপহার সামগ্রী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কোম্পানিগুলো সাধারণত দুটি প্রধান লক্ষ্য সামনে রেখে এই ধরনের প্রচারণা চালায় – প্রথমত, প্রকল্পের ব্যাপক পরিচিতি নিশ্চিত করা, এবং দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন অফার ও প্রচারণার মাধ্যমে প্রকল্পের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করে গ্রাহকের আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা। সাধারণত নিম্নোক্ত ১৫টি সুনির্দিষ্ট মাধ্যমে বেসরকারি আবাসন কোম্পানিগুলো তাদের প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১. **ডিজিটাল ও সোশ্যাল মিডিয়া বিপণন:** আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে ফেসবুক, ইউটিউব, ইমেইল মার্কেটিং এবং এসএমএস বুস্টিংয়ের মাধ্যমে বিশাল জনবলকে টার্গেট করে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন প্রচার করা;
২. **বেতনভুক্ত বিক্রয় প্রতিনিধি:** সরাসরি বিপণনের জন্য কোম্পানিগুলো নিজস্ব প্রশিক্ষিত এবং বেতনভুক্ত বিক্রয় প্রতিনিধি (Sales Representative) নিয়োগ;
৩. **ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কিং:** কোম্পানির নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক যোগাযোগ, যেমন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত মহলের মাধ্যমে প্রকল্পের তথ্য প্রচার;
৪. **বিদ্যমান গ্রাহক রেফারেল:** সংশ্লিষ্ট প্রকল্প থেকে প্লট ক্রেতাদের অভিজ্ঞতা ও রেফারেলের মাধ্যমে সম্ভাব্য নতুন ক্রেতা আকৃষ্ট করা;
৫. **স্থানীয় মধ্যস্থতাকারী ও জনবল:** স্থানীয় জনগণ ও দালালদের মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা;
৬. **আবাসন মেলা:** আবাসন মেলার আয়োজন অথবা জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন আবাসন মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরাসরি ক্রেতাদের কাছে প্রকল্পের তথ্য পৌঁছে দেওয়া;
৭. **সংবাদপত্র ও প্রিন্ট মিডিয়া:** স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের অনলাইন ও অফলাইন সংবাদপত্রে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে প্রচার চালানো;
৮. **টেলিভিশন বিজ্ঞাপন:** জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে ব্র্যান্ড ইমেজ গড়ে তোলা;

[৭৬] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'Rogue realtors deceive buyers of land and money,' ২৭ নভেম্বর ২০২১, https://www.tbsnews.net/dropped/real-estate/rogue-realtors-deceive-buyers-land-and-money-335575 (২০ আগস্ট ২০২৬)।

৯. **অন-সাইট ব্র্যান্ডিং:** সরাসরি দৃশ্যমান প্রচারণার অংশ হিসেবে প্রকল্প এলাকায় এবং আশেপাশে বড় বড় সাইনবোর্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন স্থাপন করা;

১০. **লিফলেট ও ব্রোশিওর বিতরণ:** বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগমস্থলে সম্ভাব্য ক্রেতাদের হাতে লিফলেট বা প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য সংবলিত ব্রোশিওর বিতরণ;

১১. **তৃতীয় পক্ষ বা আউটসোর্সিং:** পেশাদার বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ থার্ডপার্টি মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সি নিয়োগ;

১২. **ভার্চুয়াল ট্যুর ও থ্রি-ডি ভিজুয়ালাইজেশন:** ক্রেতাদের সশরীরে প্রকল্প এলাকায় না গিয়েই ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকল্পের ভেতরকার ৩৬০-ডিগ্রি ভিউ বা থ্রি-ডি মডেল দেখার সুযোগ দেওয়া;

১৩. **ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং:** জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের মাধ্যমে প্রকল্পের ভিডিও রিভিউ বা ফিচার প্রচার করা, যা তরুণ প্রজন্মের ক্রেতাদের দ্রুত আকৃষ্ট করে। এছাড়া, সুপরিচিত পাবলিক ফিগার, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কিংবা প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের (যেমন: বড় ও জনপ্রিয় প্রকল্পের কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম বা ধর্মীয় বক্তা) সম্পৃক্ত করে প্রকল্প এলাকায় তাদের সফরের ছবি ও ভিডিও প্রচার:

১৪. **গুগল বিজনেস প্রোফাইল ও ম্যাপ:** গুগল ম্যাপে প্রকল্পের সঠিক অবস্থান, ছবি এবং পূর্ববর্তী গ্রাহকদের ইতিবাচক রিভিউ প্রদর্শন করা। এর মাধ্যমে স্থানীয় সার্চে প্রকল্পটি সবার আগে দৃশ্যমান হয়; এবং

১৫. **পেশাদার ব্লগ ও কন্টেন্ট মার্কেটিং:** আবাসন খাতের টিপস, বিনিয়োগ পরামর্শ বা নগরায়ন নিয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ (ব্লগ) লিখে গ্রাহকের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানোর মাধ্যমে কোম্পানির ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়ানো।

বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এবং বহুমুখী প্রচারণা পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রতিটি আবাসিক প্রকল্পের জন্য গড়ে মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৩% থেকে ৫% বিপণন বাবদ ব্যয় হয়ে থাকে। তবে এই ব্যয়ের হার সব কোম্পানির ক্ষেত্রে সমান নয়; বরং কোম্পানির পরিচিতি এবং প্রকল্পের আয়তনের ওপর ভিত্তি করে এতে ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, তুলনামূলক নতুন কোম্পানি এবং ক্ষুদ্রায়তন প্রকল্পের জন্য বিপণন ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ১০% থেকে ১৭% পর্যন্ত। এই উচ্চহারের বিপণন ব্যয় প্রকল্পের মূল্যের ওপর প্রভাব ফেলে, যা প্রকারান্তরে গ্রাহকের ক্রয়ক্ষমতার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে।

বিপণন ও বাজার সম্প্রসারণে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো ব্যাপক গুরুত্ব দিলেও তাদের ব্যবসায়িক পরিচালনায় তথ্যের পূর্ণাঙ্গতা, সত্যনিষ্ঠা ও প্রকাশযোগ্যতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে, প্লট বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ও প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রকল্পের বৈধ অনুমোদন, অনুমোদিত লে-আউট, প্রকল্পের অবস্থান, প্রতিশ্রুত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, জমির মালিকানা, খতিয়ান, দলিল, নামজারি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও সমন্বিত তথ্য সবসময় স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয় না। একইভাবে, ক্রেতারা জমির খতিয়ান, মূল দলিল, নামজারি কিংবা প্রকল্পসংক্রান্ত আইনগত বিরোধের তথ্য যাচাই করতে চাইলে পর্যাপ্ত ও যাচাইযোগ্য তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর প্রচারিত বিজ্ঞাপনসমূহে অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুমোদন, লে-আউট, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, মূল্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়, বুকিং বাতিল বা অর্থ ফেরতের শর্ত এবং রেজিস্ট্রেশনসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের তুলনায় ক্রেতাদের আকৃষ্টকারী বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে প্রকল্পের অবস্থান, মূল্য, ভবিষ্যৎ নাগরিক সুবিধা বা নগর-সীমার সঙ্গে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বিভ্রান্তিকর বা অবাস্তব তথ্য উপস্থাপন করা হয়, যেমন 'ঢাকার ভেতরে ২-৩ লক্ষ টাকায় প্লট' অথবা ভবিষ্যতে সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্তির মতো প্রচারণামূলক দাবি ক্রেতার সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। বিজ্ঞাপনে ও প্রাথমিক নথিপত্রে ইউটিলিটি উন্নয়ন ফি, রেজিস্ট্রেশন খরচ এবং বুকিং বাতিল বা অর্থ ফেরতের আইনি শর্তাবলি অস্পষ্ট রাখা হয়। একইসঙ্গে বিজ্ঞাপন ও প্রাক-বিক্রয় দলিলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, বুকিং বাতিল বা অর্থ ফেরতের শর্ত এবং ইউটিলিটি ও উন্নয়ন ফি-সংক্রান্ত তথ্যের পর্যাপ্ত ও সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে তা ক্রেতার জন্য প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও ঝুঁকি মূল্যায়নকে কঠিন করে তোলে।

অন্যদিকে, ব্যবসায়িক কার্যক্রমের এই তথ্যগত অস্পষ্টতা ভূমির মালিক ও ডেভেলপারের মধ্যকার চুক্তি এবং ক্রেতার নিকট প্রয়োজনীয় আইনগত নথিপত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। ক্রেতাদের পক্ষ থেকে খতিয়ান, নামজারি কিংবা আইনগত বিরোধের তথ্য দেখতে চাইলে সহযোগিতা প্রদানে অনীহা প্রকাশ করা হয়। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের এই অস্বচ্ছতা ভূমির মালিকের সাথে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। একইসঙ্গে ভূমির মালিকের সাথে ক্রয় চুক্তি, হস্তান্তর শর্তাবলি, আর্থিক লেনদেন, হস্তান্তরের শর্ত, আর্থিক লেনদেন এবং উভয় পক্ষের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতিও স্বচ্ছতার প্রশ্ন উত্থাপন করে। এসব তথ্যের অসম্পূর্ণতা বা অস্পষ্টতা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর জন্য চুক্তিগত অধিকার, দায়িত্ব ও আর্থিক স্বার্থ সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা অর্জনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে।

অধিকন্তু, কোম্পানিগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইটে প্রকল্পের অনুমোদনপত্র, আইনি ঝুঁকি বা বিরোধের তথ্য এবং নির্মাণের নিয়মিত অগ্রগতি সংক্রান্ত আপডেট প্রকাশ করার কোনো বাধ্যবাধকতামূলক ব্যবস্থা বা স্বচ্ছ নিয়ম চর্চা দেখা যায় না। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, সম্ভাব্য হস্তান্তরের সময়, অনুমোদনের পরিবর্তন বা নবায়ন এবং প্রকল্প-সংক্রান্ত কোনো আইনগত বিরোধ বা ঝুঁকি থাকলে সে বিষয়ে নিয়মিত ও হালনাগাদ তথ্য প্রকাশের ঘাটতি ক্রেতার জন্য প্রকল্পের প্রকৃত অবস্থা মূল্যায়নকে কঠিন করে তুলতে পারে। একইভাবে, কোম্পানির ওয়েবসাইট বা অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে প্রকল্প, অনুমোদন, যোগাযোগের ঠিকানা এবং প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ না হলে প্রকাশিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যবহারিক মূল্য কমে যায়। ফলে বিপণন কার্যক্রমে তথ্যের ব্যাপক ব্যবহার থাকলেও ক্রেতার সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল, হালনাগাদ ও যাচাইযোগ্য তথ্য এক জায়গায় সমন্বিতভাবে প্রকাশের সীমাবদ্ধতা রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর স্বচ্ছতার একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

উপরন্তু, তথ্যের এই ঘাটতির সঙ্গে সেবা-পরবর্তী জবাবদিহিতার বিষয়টিও সম্পর্কিত। গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ, পর্যালোচনা ও নিষ্পত্তির জন্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সুস্পষ্ট ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর তথ্য পাওয়া যায় না। এর ফলে তথ্য-সংক্রান্ত অসামঞ্জস্য বা প্রকল্প বাস্তবায়নসংক্রান্ত সমস্যায় সংক্ষুব্ধ ক্রেতাদের অভিযোগ উত্থাপন ও প্রতিকারপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া জটিল হতে পারে। এ ধরনের সীমাবদ্ধতা সেবা-পরবর্তী জবাবদিহিতা দুর্বল করার পাশাপাশি ক্রেতার আস্থা ও আবাসন খাতের প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতার ও সুশাসনকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করছে।

৪.২.২ আর্থিক তথ্য প্রকাশে স্বচ্ছতার ঘাটতি

রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ প্লট বা ফ্ল্যাটের মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি, মোট পরিশোধযোগ্য অর্থ এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক দায় সম্পর্কে ক্রেতাকে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঘোষিত মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে এবং এর সঙ্গে জমির প্রকৃত মূল্য, নির্মাণ ব্যয়, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য খরচের কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে প্রাক-বিক্রয় বিবরণীতে কোনো স্পষ্ট হিসাব প্রকাশ করা হয় না। প্রাক-বিক্রয় ধাপে তথ্যের এই অস্পষ্টতার কারণে বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত মূল্য এবং ক্রেতার চূড়ান্তভাবে পরিশোধযোগ্য মোট অর্থের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য দেখা যায়। বিশেষ করে প্লটের মূল্যের পাশাপাশি উন্নয়ন ফি, ইউটিলিটি সংযোগ ফি, রেজিস্ট্রেশন ব্যয়, হস্তান্তর ফি, নামজারি বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের পরিমাণ, পরিশোধের সময়সূচি এবং কোন পক্ষ তা বহন করবে – এসব অপ্রত্যক্ষ খরচ (Hidden Charges) বিজ্ঞাপন বা প্রাথমিক তথ্যপত্রে স্পষ্ট করা হয় না। ফলে বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত প্রাথমিক মূল্যকে কেন্দ্র করে ক্রেতা সিদ্ধান্ত নিলেও পরবর্তী পর্যায়ে আরোপিত অতিরিক্ত আর্থিক দায় ক্রেতার জন্য গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করে।

অন্যদিকে, কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে কিস্তির সংখ্যা, পরিমাণ, পরিশোধের সময়সীমা, বিলম্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জরিমানা এবং কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে বরাদ্দ বাতিলের আইনি শর্তাবলি শুরুতেই ক্রেতার কাছে স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এসব শর্ত বরাদ্দপত্র বা প্রাথমিক তথ্যের তুলনায় চুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রকাশ পাওয়ায় ক্রেতার পক্ষে প্রারম্ভিক ঝুঁকি মূল্যায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। একইভাবে, বুকিং বা বরাদ্দ বাতিলের ক্ষেত্রে কত শতাংশ অর্থ কর্তন করা হবে, কত সময়ের মধ্যে এবং কোন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় তা ফেরত দেওয়া হবে – এসব সংবেদনশীল আর্থিক তথ্য ক্রেতাকে আগে জানানো হয় না।

৪.২.৩ প্লটের মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতার ঘাটতি

গবেষণায় দেখা যায়, প্লটের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। ডেভেলপাররা সাধারণত জমির ক্রয়মূল্য, উন্নয়ন ব্যয়, অবকাঠামো (রাস্তা, পানি, বিদ্যুৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) এবং একটি নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে দাম নির্ধারণের দাবি করলেও বাস্তবে

কোনো একক, প্রমিত ও সুস্পষ্ট মানদণ্ড অনুসরণ করা হয় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই ধরনের প্লটের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়, যা মূল্য নির্ধারণের স্বচ্ছতা ও সঙ্গতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

উদাহরণস্বরূপ, বসুন্ধরা বারিধারা ল্যান্ড প্রজেক্ট-এর ২০০৯ সালের প্রকাশিত মূল্যতালিকায় একই ব্লক এন-এ একই ৩, ৪, ৫ ও ১০ কাঠা আয়তনের প্লটের জন্য এককালীন এবং বিভিন্ন মেয়াদের কিস্তিভিত্তিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কাঠাপ্রতি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতি কাঠা মূল্য প্লটের মুখ, অবস্থান এবং কিস্তির মেয়াদভেদে পরিবর্তিত হয়েছে। উত্তর/পশ্চিমমুখী প্লটের ক্ষেত্রে এককালীন ক্রয়ে প্রতি কাঠার মূল্য ১৭.১৫ লক্ষ টাকা হলেও ৫০ মাসের কিস্তিতে তা ১৯.৮০ লক্ষ টাকা এবং কর্নার প্লটের ক্ষেত্রে একই সময়সীমায় মূল্য ২৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। দক্ষিণ/পূর্বমুখী প্লটের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৮.৭৫ লক্ষ ও ২১.৪০ লক্ষ টাকা; আর কর্নার প্লটের ক্ষেত্রে ২০.১০ লক্ষ ও ২৩ লক্ষ টাকা। একই মূল্যতালিকায় ৪০, ৫০ ও ৬০ ফুট রাস্তার পাশে প্লটের জন্য সাধারণ মূল্যের সঙ্গে প্রতি কাঠায় অতিরিক্ত ১ লক্ষ টাকা যোগ করার কথাও উল্লেখ রয়েছে।[৭৭] ৮ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে প্রকাশিত এই প্রকল্পের আরেকটি মূল্যতালিকায় দেখা যায় ব্লক এম-এর ক্ষেত্রে উত্তর/পশ্চিমমুখী প্লটের এককালীন মূল্য ৩২.৫০ লক্ষ টাকা প্রতি কাঠা, ৩৬ মাসের কিস্তিতে ৩৭ লক্ষ টাকা; কর্নার/লেক সাইড প্লটের ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ৩৮ লক্ষ ও ৪২.৫০ লক্ষ টাকা। একই তালিকায় ৪০, ৫০ ও ৬০ ফুট রাস্তার পাশে প্লটের জন্য সাধারণ মূল্যের সঙ্গে প্রতি কাঠায় ৩ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল।[৭৮]

আবার, ২০২৬ সালে প্রকাশিত বিক্রয় বিজ্ঞাপনে বসুন্ধরা আবাসিক এরিয়ার বিভিন্ন ব্লকে প্রতি কাঠার মূল্যের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। যেমন এন ব্লকে ৫ কাঠা উত্তরমুখী প্লটের মূল্য ৮৫ লক্ষ টাকা, এম ব্লকে ৫ কাঠা উত্তরমুখী প্লটের মূল্য ৯০ লক্ষ টাকা এবং কে ব্লকে ৫ কাঠা উত্তরমুখী প্লটের মূল্য ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। একই তালিকায় জে ব্লকের ৫ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লটের মূল্য প্রতি কাঠা ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে।[৭৯]

তবে এসব মূল্য পার্থক্যকে এককভাবে অস্বচ্ছতার প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। কারণ প্লটের ব্লক, অবস্থান, রাস্তার প্রস্থ, মুখ, কর্নার অবস্থান ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে। বরং স্বচ্ছতার প্রশ্নটি হলো – মূল্য পার্থক্যের ভিত্তি ও মূল্য নির্ধারণকারী উপাদানগুলো ক্রেতার কাছে কতটা স্পষ্ট, পূর্ণাঙ্গ ও যাচাইযোগ্যভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। গবেষণায় বিশ্লেষিত বিজ্ঞাপন ও প্রকাশ্য তথ্যের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের এসব উপাদান সবসময় সমন্বিতভাবে উপস্থাপিত না হওয়ায় ক্রেতার পক্ষে ঘোষিত মূল্যের যৌক্তিকতা ও প্রকৃত আর্থিক দায় মূল্যায়ন করা কঠিন হতে পারে।

এছাড়া সরকারি ও জনগণের অর্থে নির্মিত অবকাঠামোর কারণে জমির মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও সেই মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত হিসাব বা অবদান নির্ধারণে কোনো স্বচ্ছতা থাকে না। এর ফলে উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি দামে প্লট বিক্রি করা হয়, যা অতিরিক্ত মুনাফার ইঙ্গিত দেয়। একইসাথে, বাজার চাহিদা, ক্রেতার সক্ষমতা এবং ডেভেলপারদের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ হওয়ায় পুরো প্রক্রিয়াটি অনেকটাই অস্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রণহীন রয়ে যায়। ফলে প্লটের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ, ব্যয় ও মুনাফার হিসাব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, যা বাজারে স্বচ্ছতার ঘাটতিকে নির্দেশ করে।

৪.২.৪ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সংগঠনসমূহের স্বচ্ছতার ঘাটতি

বেসরকারি আবাসন খাতের সুশাসন নিশ্চিতে রিহ্যাব ও বিএলডিএ প্রায়ই তাদের সদস্যভুক্ত রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অভিযোগসমূহের ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক অস্বচ্ছতা ও অস্বীকৃতির নীতি গ্রহণ করে। বিশেষ করে সরকারি খাস জমি বা সাধারণ মালিকের জমি দখল, জলাশয় ভরাট, জমি বিক্রয়ে বাধ্য করা এবং পেশিশক্তি প্রয়োগের মতো অভিযোগগুলোকে এসব সংগঠন সুকৌশলে এড়িয়ে যায় বা অস্বীকার করে। জমি দখলের অভিযোগের বিপরীতে এসব সংগঠনের পক্ষ থেকে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, তা

[৭৭] বসুন্ধরা বারিধারা ল্যান্ড প্রজেক্ট (২০০৯), *Price list of Block-N*. East West Property Development (Pvt.) Ltd. https://www.scribd.com/doc/35269665/Latest-Pricelist-Baridhara (২০ আগস্ট ২০২৬)।

[৭৮] ইস্ট ওয়েস্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) লিমিটেড (২০১০) *Bashundhara Baridhara Land Project: Price list, effective from 8 December 2010*, https://www.scribd.com/doc/51116782/P-Price-list-Effect-08-December-2010 (২০ আগস্ট ২০২৬)।

[৭৯] গোল্ডেন প্রপার্টি, (২০২৬). *Bashundhara Residential Area Plot Sale & Price List 2026*. BikriSohoj. https://www.bikrisohoj.com/details/bashundhara-residential-area-plot-sale-price-list-2026-l-193038 (২০ আগস্ট ২০২৬)।

অনেক ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতার মানদণ্ডে প্রশ্নবিদ্ধ। বিএলডিএর একজন প্রতিনিধির বক্তব্যে এই অনিচ্ছাকৃত জমি দখলের একটি ব্যবহারিক চিত্র উঠে এসেছে। তিনি বলেন –

> "ধরুন ৫০ বিঘা জমি ডেভেলপ করতে যাই, সেখানে মাঝেমধ্যে ৫-৬ বিঘা অন্য মালিকের জমি থেকে যায়... এখন পুরো এলাকাটি যখন ১৫ ফিট পর্যন্ত ভরাট করা হয়, তখন যতই চেষ্টা করি না কেন, ওই আলাদা মালিকের ৫ বা ১০ কাঠা জমিটা ফাঁকা রাখা সম্ভব হয় না... স্বাভাবিকভাবেই আশেপাশের বালু বা মাটি সেখানে ঢুকে পড়ে...।"

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়, প্রকৌশলগত বা নির্মাণগত সীমাবদ্ধতার দোহাই দিয়ে অন্যের জমি বা কৃষিজমি ভরাট করার বিষয়টি এখানে এক প্রকার বৈধতা পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একে 'অনিচ্ছাকৃত' হিসেবে বর্ণনা করা হলেও বাস্তবে তা ক্ষুদ্র ভূমি মালিকদের তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার একটি কৌশলী প্রক্রিয়া। তদুপরি, আবাসন খাতের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের 'ভূমিদস্যুতা' বা জোরপূর্বক দখলের অভিযোগকেও এই সংগঠনগুলো দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। বিএলডিএর উক্ত প্রতিনিধি এই ধরনের অভিযোগকে শুধুমাত্র 'সামাজিক ধারণা' হিসেবে অভিহিত করে বলেন –

> "এই কমপ্লেনটাকে (জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ) আমি গ্রাহ্য করি না... ভূমি দখল করা ইম্পসিবল (অসম্ভব)... বলা হয় আমরা যারা ডেভেলপ করি তারা সব ভূমি দখলকারী ভূমিদস্যু... এটা সম্পূর্ণভাবে সমাজের একটা প্রচলিত কথা...।"

সংগঠনসমূহের এই ধরনের অনমনীয় অবস্থান ও অভিযোগ আমলে না নেওয়ার প্রবণতা প্রমাণ করে, তারা সুশাসনের মূলনীতি 'স্বচ্ছতা'র চেয়ে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষাকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। যখন একটি দায়িত্বশীল সংগঠন বাস্তব অভিযোগগুলোকে 'সামাজিক ধারণা' বলে প্রত্যাখ্যান করে, তখন প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ক্ষুণ্ন হয় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিকার পাওয়ার পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

৪.৩ উপসংহার

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায়, বেসরকারি আবাসন খাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো কেবল কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতার ফল নয়, বরং নিয়ন্ত্রক সংস্থার জনবল ও কারিগরি সক্ষমতার ঘাটতি, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের দুর্বলতা, বেসরকারি কোম্পানির ব্যবস্থাপনাগত ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, বিরোধ নিষ্পত্তির দীর্ঘসূত্রিতা এবং তথ্য প্রকাশের অসম্পূর্ণতা – এসব বিষয় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে কাজ করছে। প্রথমত, রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের জনবল, কারিগরি দক্ষতা ও মাঠপর্যায়ের তদারকি সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের কার্যকর নিয়ন্ত্রণকে কঠিন করে তুলছে। একইভাবে, রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর মানবসম্পদ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার সীমাবদ্ধতা প্রকল্পের মান ও পরিকল্পিত উন্নয়নে প্রভাব ফেলতে পারে। দ্বিতীয়ত, কার্যকরতার ক্ষেত্রে আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপস্থিতি এবং বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান রয়েছে। অনুমোদন, পরিবেশ, ইউটিলিটি ও ক্রেতা সুরক্ষাসংক্রান্ত বিধান থাকা সত্ত্বেও এর কার্যকর বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একইসঙ্গে ভূমি ও আবাসন-সংক্রান্ত বিরোধের দীর্ঘসূত্রিতা দ্রুত প্রতিকার প্রাপ্তিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তৃতীয়ত, সাশ্রয়ী আবাসনের ক্ষেত্রে উচ্চতর জীবনযাপন, আধুনিক সুবিধা ও বিনিয়োগকেন্দ্রিক বার্তার প্রাধান্য দেখা গেছে। ফলে বিদ্যমান আবাসন সরবরাহ ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য-ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থত, প্রকল্পের অনুমোদন, ভূমির মালিকানা, উন্নয়ন ও ইউটিলিটি ব্যয়, রেজিস্ট্রেশন, কিস্তি, অর্থ ফেরত এবং অন্যান্য আর্থিক দায়সংক্রান্ত তথ্য অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ বা পর্যাপ্তভাবে হালনাগাদ নয়। বিশেষত, ঘোষিত মূল্যের পাশাপাশি মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি ও মোট পরিশোধযোগ্য অর্থ সম্পর্কে সমন্বিত ও যাচাইযোগ্য তথ্যের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অনিয়ম ও দুর্নীতি

বেসরকারি আবাসন খাতে বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যমান। এই অধ্যায়ে এ খাতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির নানাবিধ ধরন, কারণ এবং এর সাথে জড়িত বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের সম্পূর্ণ জীবনচক্র – জমি নির্বাচন, সংগ্রহ ও অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে নকশা অনুমোদন, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্লট হস্তান্তর, গ্রাহক ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনা – প্রতিটি ধাপে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। এতে জমি নির্বাচন ও সংগ্রহ, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন, প্লট বিক্রয় ও মালিকানা হস্তান্তর, গ্রাহকের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় এবং রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সঙ্গে সরকারি সংস্থার নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, সংবাদমাধ্যমের কৌশলগত ব্যবহার, বৃহৎ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্য, রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যবসায়িক স্বার্থের যোগসূত্র, 'মাফিয়াতন্ত্র' এবং 'স্টেট ক্যাপচার'-এর সম্ভাব্য প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৫.১ বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের স্থান নির্বাচন, জমি সংগ্রহ ও অধিগ্রহণ পর্যায়

৫.১.১ জমি নির্বাচন ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনিয়ম

> "আমাদের এখানে এমন অনেক আছে... তাদের সাথে কোম্পানি বায়না করেছে মৌখিকভাবে, কিন্তু টাকা দেয়নি... এমনও আছে যে হয়তো কিছু টাকা দিয়েছে, হয়তো এক লক্ষ বা দু-লক্ষ, এরপর জমি দখল করে নিয়েছে... কিন্তু পুরো টাকা আর দিচ্ছে না...।"
>
> *– একজন ভুক্তভোগী জমি মালিক*

মৌখিক চুক্তিভিত্তিক জমি ক্রয় প্রক্রিয়া: বেসরকারি আবাসন খাতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির শুরু জমি সংগ্রহের অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া থেকে। রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী জমির মালিকের সাথে যৌথ উন্নয়ন বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে লিখিত ও নিবন্ধিত চুক্তির বাধ্যবাধকতা থাকলেও সরাসরি জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডেভেলপাররা প্রায়শই মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে জমির পরিমাণ, মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পরিশোধের শর্তাবলী নির্ধারণ করে। জমির মালিকদের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো সুনির্দিষ্ট লিখিত চুক্তির পরিবর্তে কেবল মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে জমির পরিমাণ ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করার ফলে পরবর্তীতে মালিকানা ও পাওনা পরিশোধ নিয়ে বড় ধরনের বিরোধের সূত্রপাত ঘটায়।

আইপিএর অপব্যবহার: জমি সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় আর্থিক অনিয়ম ও আইনি ফাঁকফোকর হিসেবে ব্যবহৃত হয় আইপিএ। রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো জমির প্রকৃত রেজিস্ট্রেশন ফি এবং স্ট্যাম্প ডিউটি এড়াতে নামমাত্র (৫,০০০ – ৮,০০০ টাকা) সরকারি ফি দিয়ে এই আইপিএ সম্পাদন করে। এই আইনি ঢাল ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন রাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে আইপিএ স্বাক্ষরের পর জমির মালিকের সম্মতি ছাড়া ডেভেলপার তৃতীয় পক্ষের কাছে জমি বিক্রয় করতে পারলেও নিজের জমি বিক্রি করতে না পারায় জমির মালিকের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

সরকারি খাস ও নবাব এস্টেটের সম্পত্তি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি: জমি সংগ্রহের এই অনিয়ম কেবল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্পদের ওপরও সরাসরি আঘাত হানছে। অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি প্রভাব খাটিয়ে পার্শ্ববর্তী সরকারি খাস জমি কিংবা 'নবাব এস্টেট'-এর সম্পত্তি নিজেদের প্রকল্পের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে এবং সাধারণ গ্রাহকদের কাছে তা বৈধ সম্পত্তি হিসেবে বিক্রি করে।

উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠ ও সামাজিক অবকাঠামোর জমি জবরদখল ও অবৈধ ভরাট: মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এলাকার স্থানীয় জনপদ বা কমিউনিটির জন্য নির্ধারিত খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ের জমি জোরপূর্বক দখল ও ভরাট করার প্রবণতাও এই খাতে প্রবলভাবে বিদ্যমান, যা সামাজিক ও নৈতিকভাবে গুরুতর অনিয়মের দৃষ্টান্ত।

কৃষিজমি ও জলাশয় দখল ও ভরাট: অনেক ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক ও পেশীশক্তির দাপটে কৃষিজমি, প্রাকৃতিক জলাশয়/বন্যা প্রবাহ এলাকা ভরাট ও দখল করে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকার বাড্ডা, সাতারকুল ও গজারিয়া এলাকায় একটি বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের জন্য রাজউক কর্তৃক মাত্র ১১৯ একর জমির লে-আউট অনুমোদিত হলেও ওয়াচডগ প্রতিষ্ঠান 'বেলা'র একটি আইনি নোটিশ অনুযায়ী স্যাটেলাইট চিত্রে প্রায় ৪৩১ একর জমি ভরাটের প্রমাণ পাওয়া গেছে; অর্থাৎ অতিরিক্ত ৩১২ একর জমি ড্যাপ অনুযায়ী সংরক্ষিত জলাভূমি ও বন্যাপ্রবাহ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮০] রূপগঞ্জে প্রস্তাবিত আর্মি হাউজিং স্কিমের এলাকা ড্যাপ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী বন্যাপ্রবাহ অঞ্চল, জলাশয় ও গ্রামীণ বসতি হিসেবে চিহ্নিত, যেখানে কোনো ধরনের ভরাট বা নির্মাণ অনুমোদিত নয়। প্রকল্পটি ২৪টি মৌজা জুড়ে বিস্তৃত, যার প্রায় ৬৫% বন্যাপ্রবাহ অঞ্চল, ১২% জলাশয় এবং ১৩% গ্রামীণ বসতি।[৮১]

অনিয়মের এই সংস্কৃতি কেবল ব্যক্তিকেই নয়, বরং ঢাকা শহরের সামগ্রিক পরিবেশকেও খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছে। উল্লেখ্য, সিদ্দিকীর (২০১৯) গবেষণা অনুযায়ী, দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে আবাদযোগ্য জমি হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। খান, সুলতান এবং হাসানের (২০২৫) গবেষণায় ঢাকা শহরের বর্তমান জলাশয়, বৃক্ষাআচ্ছাদন এলাকা, তৃণভূমি ও কৃষিভূমির পরিমাণ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা নিম্নে দেওয়া হলো (সারণি ৫.১)। উক্ত গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৮০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে অপরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণের ফলে ঢাকা শহর তার ৬০% এরও বেশি জলাশয় হারিয়েছে। একই সময়ে মাথাপিছু গাছের আবরণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে মাত্র ৩.৪৪ বর্গমিটারে দাঁড়িয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী ন্যূনতম মানদণ্ড (৯ বর্গমিটার) থেকে অনেক নিচে।

সারণি ৫. ১: ঢাকা শহরে জলাশয়, বৃক্ষ আচ্ছাদন, তৃণভূমি/কৃষিজমি এবং বিল্ট-আপ এলাকার পরিমাণ (১৯৮০-২০২৪)

বছর	জলাশয়ের পরিমাণ		বৃক্ষ আচ্ছাদন		তৃণভূমি/কৃষিজমি		বিল্ট-আপ এলাকা	
	এলাকা (বর্গ কি.মি)	শতাংশ	এলাকা (বর্গ কি.মি)	শতাংশ	এলাকা (বর্গ কি.মি)	শতাংশ	এলাকা (বর্গ কি.মি)	শতাংশ
১৯৮০	৩৭.৩	**১২.৩**	৬৫.৭	**২১.৬**	১৬৮.৮	**৫৫.৪**	২০.৭	**৬.৮**
১৯৯০	২৪.১	**৭.৯**	৪৯.৯	**১৬.৪**	১৭৮.৩	**৫৮.৫**	৩৫.৮	**১১.৮**
২০০০	১৬.৮	**৫.৫**	৪৭.১	**১৫.৫**	১৫২.১	**৫০**	৭০.২	**২৩.১**
২০১০	১৯.৩	**৬.৩**	৪১.৯	**১৩.৮**	১১১.৩	**৩৬.৬**	১০৫.৭	**৩৪.৭**
২০২০	২০.১	**৬.৬**	৩৭.৫	**১২.৩**	৭৬.৬	**২৫.২**	১৩০.৬	**৪২.৯**
২০২৪	১৪.৭	**৪.৮**	৩৫.৩	**১১.৬**	৭৪.৪	**২৪.৪**	১৪৮.৮	**৪৮.৯**

[৮০] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'BELA serves legal notice to halt illegal 'Sunvalley housing' on wetlands,' ২২ জুলাই ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangladesh/environment/bela-serves-legal-notice-halt-illegal-sunvalley-housing-wetlands-1194331 (১২ এপ্রিল ২০২৬)।

[৮১] *দি ডেইলি স্টার*, 'Project area includes flood flow zone,' ২৮ অক্টোবর ২০১০, https://www.thedailystar.net/news-detail-160447 (১২ এপ্রিল ২০২৬)।

চিত্র ৫.১: ঢাকা শহরে জলাশয়, বৃক্ষ আচ্ছাদন, তৃণভূমি/কৃষিজমি এবং বিল্ট-আপ এলাকার পরিমাণ (১৯৮০-২০২৪)

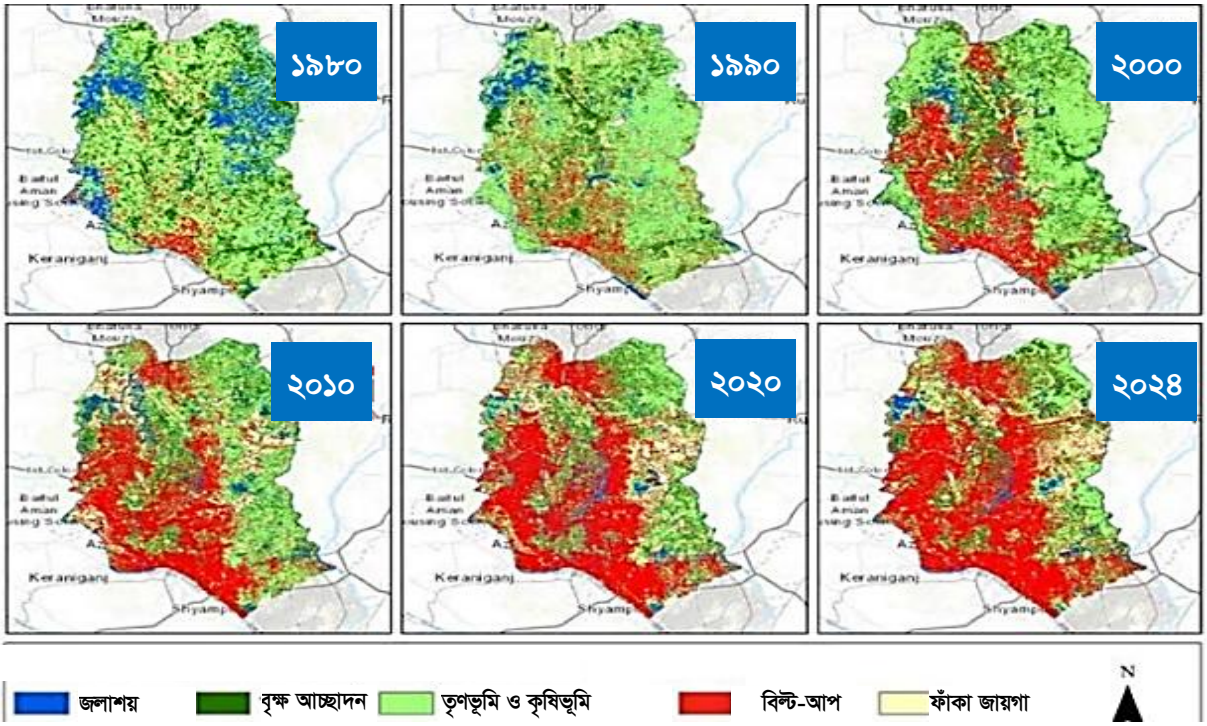

তথ্যসূত্র: খান, সুলতান এবং হাসান (২০২৫)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি)-এর ২০১৯ সালের এক গবেষণা অনুযায়ী, মাত্র এক দশকে ঢাকার মহানগর এলাকার ১,৮৭৯ একর ফ্লাড ফ্লো জোনের মধ্যে ১,০৭২ একর (প্রায় ৫৭%) বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, বিভিন্ন সংগঠন এমনকি সরকারি সংস্থার মাধ্যমেও এই ফ্লাড ফ্লো জোন দখল ও ভরাট করা হয়েছে। এছাড়া ২০১০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়ে ঢাকার ফ্লাড ফ্লো জোন, ওয়াটার রিটেনশন এলাকা ও জলাশয়ের মোট ৯,৫৫৬ একরের মধ্যে প্রায় ৩,৪৪০ একর জমি হারিয়ে গেছে।[৮২]

> "এই জমি থেকেই আমাদের পরিবারের খাওয়ার ধান আসতো... বিঘা প্রতি ১৫-২০ হাজার টাকা খরচ হতো... কিন্তু খাওয়া-দাওয়া এবং বিক্রি করার পর হতে ৫-১০ হাজার টাকা থাকতো...।"
>
> *– একজন ভুক্তভোগী জমি মালিক*

ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি জবরদখল, অবৈধ ভরাট ও জোরপূর্বক বিক্রয়ে বাধ্য করা: অনেক ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো প্রান্তিক জমি মালিকদের ন্যায্য মূল্য প্রদান না করে তাদের পৈতৃক ভিটা বা আয়ের উৎস থেকে উচ্ছেদ করে। বিশেষ করে নারী ভূমি মালিকদের ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন ও জনসমক্ষে অপমানের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়মিত ওঠে। এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় জমির ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর জীবনধারণের জন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। বেশিরভাগে ক্ষেত্রেই তারা সাধারণ মালিকদের নামমাত্র মূল্যে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করে।

[৮২] *দি ডেইলি স্টার*, 'Dhaka Flood Flow Zones: Urban sprawl eats up 57pc,' ২৫ এপ্রিল ২০১৯, https://www.thedailystar.net/frontpage/news/dhaka-flood-flow-zones-urban-sprawl-eats-57pc (১২ এপ্রিল ২০২৬); *দি ডেইলি স্টার*, 'Dhaka's disappearing flood-flow zones,' ০৭ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/dhakas-disappearing-flood-flow-zones-3770806 (১২ এপ্রিল ২০২৬)।

রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো কৃষিজমি ও জলাশয় জোরপূর্বক দখল বা ভরাট করার ফলে স্থানীয় ভূমি মালিকরা কেবল তাদের সম্পদই হারাচ্ছেন না, বরং দীর্ঘমেয়াদী পেশাগত সংকটের মুখে পড়ছেন। যে ভূমি মালিক একসময় কৃষিকাজ বা মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী ছিলেন, জমি হারানোর ফলে তিনি তার চিরাচরিত পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেন। পর্যাপ্ত কারিগরি দক্ষতা বা বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাব থাকায় এসব উচ্ছেদকৃত মানুষ পরবর্তীকালে অদক্ষ শ্রমিকে পরিণত হন, যা স্থানীয় অর্থনীতিতে চরম অস্থিরতা ও দারিদ্রের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

> "যারা এসব জমিতে কৃষিকাজ করতো বা মাছ চাষ করতো, তারা এখন কেউ রিকশা চালায়, কেউ দোকানে কাজ করে... আমার এক চাচাতো ভাই আগে এইদিকেই ফিশারি ছিলো, এখন কেমিকেলের দোকানে আমার সাথেই বসে...."
>
> *– একজন ভুক্তভোগী জমি মালিক*

রিয়েল এস্টেট কোম্পানির দ্বারা জোরপূর্বক জমি দখলের কৌশলগুলো নিয়ে বিশ্লেষণে দেখা যায়, জমির মালিক জমি বিক্রয়ে অস্বীকৃতি জানালে বিভিন্ন কৌশলে জোরপূর্বক জমি দখলের ক্ষেত্রে সাধারণত নিচের ছয়টি কৌশল ব্যবহার করে থাকে।

১. ভৌত পরিবর্তন: জমি ভরাট, সাইনবোর্ড স্থাপন, বাউন্ডারি নির্মাণ বা রাস্তা কেটে দখল, জামির মালিকের স্থাপনা ভেঙে বা সম্পদ নষ্ট করা ইত্যাদি মাধ্যমে শারীরিক উপস্থিতি বা অবকাঠামো তৈরি করে জমিকে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির 'নিজস্ব' হিসেবে দেখানোর মাধ্যমে জমি দখল করা হয়। থিমেটিক ক্লাস্টারিং বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভৌত অবকাঠামোগত পরিবর্তনই ভূমি দখলের প্রধান হাতিয়ার।

> "আমাদের ২০০ বছরের পুরানো বাড়ি, কবরস্থান - সেগুলোও তারা ভেঙ্গে সমান করে ফেলেছে... সমান করে তারা প্রোজেক্টের ভিতর নিয়ে আসছে...।"
>
> *– একজন ভুক্তভোগী জমি মালিক*

> "রাতের বেলা এসে আমার জমিতে যে ঘরটা ছিলো, সেটা ভেঙ্গে দিয়েছে..... আমার কিছু নির্মাণ সামগ্রী ছিলো সেগুলো চুরি করে নিয়ে গিয়েছে...।"
>
> *– একজন ভুক্তভোগী জমি মালিক*

২. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব খাটানো: এর পরেই শক্তিশালী অবস্থান লক্ষ করা যায় 'রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব বিস্তার' কৌশলের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, স্থানীয় প্রভাবশালী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, মিডিয়া ও দালাল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে।

৩. জালিয়াতি এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি: জবরদখলের উদ্দেশ্যে ভুয়া দলিল প্রাক্কলন, ভুয়া উত্তরাধিকারী সাজানো, আইনি/নথিগত জালিয়াতি এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের মতো নথিগত জালিয়াতির কৌশল অবলম্বন করে। এছাড়া মিথ্যা মামলা দায়ের, মিডিয়ার মাধ্যমে জনমত বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি ও নানা গুজব ছড়িয়ে চাপ সৃষ্টি ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করে জমি দখল করে থাকে।

৪. বলপ্রয়োগ, সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শন: এক্ষেত্রে সম্পদ ভাঙচুর, হুমকি, চাঁদাবাজি এবং ক্যাডার বাহিনী (মোটর সাইকেল বাহিনী, কিশোর গ্যাং, লাঠিয়াল বাহিনী, শুটার দল ইত্যাদি নামে বেতনভুক্ত সশস্ত্র) ব্যবহার করে এবং ভীতি প্রদর্শন করে মানসিক ও সামাজিক চাপের মাধ্যমে জমির মালিককে বাজার মূল্যের তুলনায় কম দাম এবং জমি ছাড়তে বাধ্য করে।

> "আমাকে ডেকে নিয়ে আমার ছেলে ও মেয়ের ছবি বের করে টেবিলের উপরে একটি রিভালবার রাখে... তারা বলেছে, তোর ছেলে-মেয়ের জন্য জমি রাখতে চাচ্ছিস?... তোর ছেলে-মেয়েই যদি না থাকে তাহলে তুই জমি দিয়ে কী করবি?.... তারপর একটি পর্যায়ে আমার সেই ১৮ কাঠা জমি ছেড়ে দেই.....।"
>
> *– একজন ভুক্তভোগী জমি মালিক*

৫. অর্থনৈতিক চাপ ও বাজার দখল: এক্ষেত্রে মালিকের আর্থিক দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে কম দামে জমি ছাড়তে বাধ্য করে, মালিককে বেশি মূল্যের লোভ দেখিয়ে বা চাপ প্রয়োগ করে ও কৃত্রিমভাবে বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে জমি দখল করে থাকে।

৬. মালিকানা ও প্রবেশাধিকারের কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ: এই কৌশল ব্যবহার করে আংশিক/নিকটবর্তী জমি ক্রয়, সহ-মালিককে চাপ, ইউটিলিটি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যাডারভিত্তিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে বেসরকারি আবাসন খাতের ভূমি দখল কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া। প্রথমে শারীরিক উপস্থিতি বা অবকাঠামো তৈরি করে জমির ভৌত দখল করা হয়। তারপর ভৌত দখল বজায় রাখতে এবং সেটিকে স্থায়ী ও

আইনি ঝামেলামুক্ত রাখতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমর্থন বা ছত্রছায়াই রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রধান শক্তি বা প্রতিরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে। একবার জমি ভরাট করে দখলে নেওয়ার পর মালিককে দমানোর জন্য একদিকে যেমন ভয়ভীতি দেখানো হয়, অন্যদিকে নথিপত্র জালিয়াতির মাধ্যমে মালিকানা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ ভৌত দখলের পর মালিকানা পাকাপোক্ত করতে নথিপত্র জালিয়াতি এবং ভীতি প্রদর্শন বা পেশীশক্তির প্রয়োগের কৌশলগুলো সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে জমির আইনি দখল নিশ্চিত করা হয়। সবশেষে জমির চারপাশ অবরুদ্ধ ও নানা উপায়ে জমির মালিককে আর্থিক সংকটে ফেলে বা জমি মালিককে সহায়সম্বলহীন করে জমি বিক্রিয়ে বাধ্য করা হয় (কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ)।

৫.১.২ জমির মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে অনিয়ম

ভূমি মালিকদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিককে প্রতিশ্রুত বাজারমূল্য প্রদান না করে নামমাত্র বা আংশিক মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সুকৌশলে জমির মূল দলিল বা মালিকানা হাতিয়ে নেয়। বাজারমূল্যের তুলনায় অনেক কম দামে জমি বিক্রয় করতে মালিকপক্ষকে নানাভাবে প্রলুব্ধ বা চাপের মুখে বাধ্য করার অভিযোগ এই খাতে নিত্যনৈমিত্তিক। চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে জমির পূর্ণাঙ্গ মূল্য পরিশোধ না করে নানা অজুহাতে বিলম্ব করা হয় এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক বা পেশীবল ব্যবহার করে মালিককে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।

> "তারা আমাকে অফিসে ডাকে এবং বলা হয় যে আমার জমি বিক্রির টাকাটা তারা দিয়ে দিবে... এরপর তারা বহুবারই আমাকে বলে - তোমার নামে চেক ইস্যু হয়ে গেছে, গিয়ে একাউন্টে দেখো... কিন্তু একাউন্টে গিয়েও আমি ফেরত এসেছি... এভাবে দিনের পর দিন আমাকে ঘুরিয়েছে... তাদের কাছ থেকে ১০ টাকাও আনতে পারি নাই... পরে আমি আর যাইনি...।"
>
> *– একজন ভুক্তভোগী জমি মালিক*
>
> "৬ লক্ষ টাকা করে প্রতি কাঠা হিসাবে আমার ১০ কাঠা জমির দাম আসে ৬০ লক্ষ টাকা... তারা আমাকে ২০ লক্ষ টাকা দিছে... আর আমাকে এটাসেটা বুঝিয়ে তারা আমার থেকে অরিজিনাল দলিলটা নিয়ে নেয়... তারপর তারা বাকি টাকা দিতে চায় না... আমরা এটা কখনো বিক্রির জন্য রাজি হইনি... তখন আমার এই জমির বাজার মূল্য ছিলো মিনিমাম ১০ লক্ষ টাকা... কিন্তু আমার মতো মানুষ ওদের ভয়ে ৬ লক্ষ করে বিক্রি করে দেয়... তারা ভয়-টয় দেখাইতো...।"
>
> *– একজন ভুক্তভোগী জমি মালিক*

বেসরকারি আবাসন খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির একটি চরমতম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভূমি মালিকদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে। যদিও রিয়েল এস্টেট (উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১০-এর ধারা ১২(১) অনুযায়ী সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক, অধিকাংশ কোম্পানি তদারকি এড়াতে এবং অবৈধ অর্থের সংস্থান করতে 'নগদ' টাকায় মূল্য পরিশোধকে প্রাধান্য দেয়। এই আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নগদ অর্থে লেনদেন করার ফলে একদিকে যেমন কর ফাঁকির সুযোগ তৈরি হয়, অন্যদিকে কোনো বিরোধের সৃষ্টি হলে ভুক্তভোগী মালিকের পক্ষে লেনদেনের প্রমাণ উপস্থাপন করা দুরূহ হয়ে পড়ে।[৮৩]

৫.১.৩ মধ্যস্বত্বভোগী নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অনিয়ম

বেসরকারি আবাসন খাতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালের নেটওয়ার্ক ব্যবহার একটি সুসংগঠিত অনিয়ম ও দুর্নীতির কাঠামো গড়ে তুলেছে। মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে যারা যুক্ত থাকে তাদের মধ্যে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, আইনজীবী, শিক্ষক, স্থানীয় মাস্তান, জমি বিক্রেতা, সাংবাদিক, পেশাদার দালাল, জনপ্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনার), দলিল লেখক, থানার সোর্স বা তথ্যদাতা, স্থানীয়/উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা ও দলীয় কর্মী, সিটি

[৮৩] একইভাবে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো পরবর্তীতে প্লট বিক্রির সময় অনেক ক্ষেত্রে প্লটের মূল্য নগদে গ্রহণ করে থাকে।

কর্পোরেশনের কর্মকর্তা এবং স্থানীয়/জাতীয় সরকারি সংস্থার নিম্ন থেকে মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মী উল্লেখ্যযোগ্য। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা বিভিন্ন অনিয়ম বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে, যা নিচে চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

চিত্র ৫. ২: বেসরকারি আবাসন প্রকল্পে মধ্যস্বত্বভোগীর কার্যক্রম



এই মধ্যস্বত্বভোগীরা মূলত চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে অনিয়ম বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। এই বহুস্তরীয় ক্ষমতাকাঠামো রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোকে জবাবদিহির ঊর্ধ্বে রেখে বড় ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম করার সুযোগ করে দেয়।

১. জমি অধিগ্রহণ: ভয়ভীতি প্রদর্শন ও জোরপূর্বক দখল এবং নামমাত্র মূল্যে জমি সংগ্রহের ক্ষেত্রে।

২. প্রকল্প বাস্তবায়ন: প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় বিরোধ দমন এবং প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত কাজ নির্বিঘ্ন করার ক্ষেত্রে।

৩. অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি: সরকারি দপ্তর থেকে অনৈতিক যোগাযোগ ও প্রভাব খাটিয়ে দ্রুত অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে।

৪. প্লট বিক্রয়: সাধারণ ক্রেতাদের কাছে প্রকল্পের বৈধতা নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও চটকদার তথ্য প্রচার করে প্লট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

> "আমি এদেরকে 'দালাল' বলবো না... আমি তাদেরকে বলবো "Enabler"... কারণ হচ্ছে এই দালাল শব্দটা কিন্তু একটু নেগেটিভ শোনায়...আপনি যদি বিদেশে যান আপনি বিদেশেও দেখবেন ব্রোকার হাউজ আছে... সো, আপনি ওদেরকে 'ব্রোকার' বলবেন... কিন্তু সেখানে দালাল বলবেন, এটা তো ঠিক না... মানে আমাদের আসলে একটা এইসব পরিবর্তন দরকার বুঝছেন... জমির ব্যবসা যারা করতেছে তাদেরকে 'ভূমিদস্যু' বলবেন, দালাল বলবেন... এই শব্দগুলো না আসলে আস্তে আস্তে আমাদের ভোকাবুলারি থেকে বের করে দেওয়া উচিত...।"
>
> *– একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রতিনিধি*

ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে অনিয়ম বাস্তবায়নের জন্য রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে, যা মূলত 'কমিশন' বা 'উপঢৌকন' হিসেবে প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর সাধারণত যে ব্যয় হয়ে থাকে তা নিচে তুলে ধরা হলো (সারণি ৫.৩)। আর্থিক কমিশনের বাইরেও মধ্যস্বত্বভোগীদের সন্তুষ্ট রাখতে এবং প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে কোম্পানিগুলো বিভিন্ন কৌশলী বিনিয়োগ করে। এর মধ্যে রয়েছে প্রকল্পে মধ্যস্বত্বভোগীদের ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব, আনুষঙ্গিক ব্যবসায়িক সুযোগ (যেমন দখলকৃত জমি ভরাটের জন্য বালু সরবরাহের চুক্তি), মেজবান বা ভোজের আয়োজন করা, দামী উপহার প্রদান এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের নানা উপায়ে তুষ্ট রাখা।

সারণি ৫. ২: মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের সহযোগিতা গ্রহণে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ব্যয়ের খাত ও আনুমানিক পরিমাণ

ব্যয়ের খাত	ব্যয়ের ধরন বা মানদণ্ড	আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ
জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কমিশনের পরিমাণ	• মোট ক্রয়মূল্যের ওপর (সর্বোচ্চ)	২-৩%
	• (অথবা) শতাংশ প্রতি	২-৫ হাজার টাকা

ব্যয়ের খাত	ব্যয়ের ধরন বা মানদণ্ড	আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ
	• (অথবা) কাঠা প্রতি	১০-১৫ হাজার টাকা
প্লট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কমিশন		৫০ হাজার - ১ লক্ষ টাকা
এছাড়া বিভিন্ন সময় ভোজনের ব্যবস্থা, উপহার, অন্য ব্যবসার সুযোগ ইত্যাদি		

৫.২ প্রকল্প পরিকল্পনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

৫.২.১ বিভিন্ন আইনি শর্ত পালনে অনিয়ম

বিভিন্ন আইনি শর্ত পালনের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম নিম্নে দেওয়া হলো।

- কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি রাজউক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বৈধ অনুমোদন ও ছাড়পত্র ছাড়াই কিংবা পুরনো তারিখে ও নিয়মবহির্ভূতভাবে অনুমোদন নিয়ে আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্লট বিক্রি করে।
- অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি রাজউকের সিল ও প্যাড জাল করে প্রকল্পের ভুয়া অনুমোদনপত্র ও লে-আউট প্ল্যান সাধারণ গ্রাহকদের কাছে প্রদর্শন করে। এমনকি কোম্পানির 'রেজিস্ট্রেশন নম্বর'কে প্রকল্পের 'নিবন্ধন নম্বর' হিসেবে উপস্থাপন করে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করে।
- পরিবেশগত শর্তাবলি এবং অনুমোদিত 'লে-আউট' বা পরিকল্পনা মানদণ্ড সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নির্ধারিত সীমানার চেয়ে অনেক বেশি জমিতে প্রকল্প পরিচালনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাজধানীর হোলান ও আশকোনা অঞ্চলে একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি উন্নয়নের জন্য অনুমোদিত ৪৩ একর ভূমিসহ প্রায় ২৩০ একর অননুমোদিত জলাভূমি ও নিচু জমি ভরাট করে প্রকল্পের সীমানা বর্ধিত করে বিপণন শুরু করে, যা পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেন।[৮৪]

> "ইআইএ'র জনমত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার বাইরের মানুষদের এনে জমায়েত করে একটা কনসালটেশন করে, ঐটার ছবি ইআইএ রিপোর্টে যুক্ত করে... যখন স্থানীয় লোকজন আমার কাছে আসছে তখন ওরা বলে যে ছবিতে থাকা এরাতো ওদেরই (রিয়েল এস্টেট কোম্পানি দ্বারা নিয়োজিত) লোক, আমরা ওদেরকে চিনি...।"
>
> *– ওয়াচডগ প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি*

- কোম্পানিগুলো নিয়মিতভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করা থেকে বিরত থাকে এবং কাজ শেষ হওয়ার পর তা বিধি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা রাজউকের কাছে হস্তান্তর করে না।
- ইআইএ এবং টিআইএর ক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা হিসেবে জনমত যাচাইয়ের (Public Consultation) কথা থাকলেও নানাভাবে (যেমন জনমত যাচাইয়ের নাম কৃত্রিম পরামর্শ সভা আয়োজন করে তার ছবি ব্যবহার করে) অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এছাড়া পছন্দমাফিক কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে সঠিক তথ্য গোপন এবং একই ইআইএ/ টিআইএ প্রতিবেদন সামান্য পরিবর্তন করে একাধিক প্রকল্পে ব্যবহার করে।

৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন পর্যায়

৫.৩.১ কমিউনিটি ফ্যাসিলিটি উপেক্ষা

রিয়েল এস্টেট (উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১০ অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যানে জনসংখ্যা অনুপাতে খেলার মাঠ, বিদ্যালয়, ধর্মীয় উপাসনালয় এবং পর্যাপ্ত প্রশস্ত রাস্তা রাখার সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে। তবে বাস্তবে অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি রাজউক থেকে নকশা অনুমোদনের সময় এসব সুবিধা কাগজের কলমে প্রদর্শন করলেও প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

[৮৪] *দি ডেইলি স্টার*, 'HC judgment goes against Ashiyan City,' ১৭ জানুয়ারি ২০১৪, https://www.thedailystar.net/hc-judgment-goes-against-ashiyan-city-7151 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যানে প্রদর্শিত খেলার মাঠ বা পার্কের জায়গাগুলো পরবর্তীতে সুকৌশলে বাণিজ্যিক প্লট হিসেবে বিক্রয় করে দেয়, যা সরাসরি গ্রাহক স্বার্থ ও নগর পরিকল্পনার পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ, হাতিরঝিল সংলগ্ন একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির আবাসন প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাজউক অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যানে বিদ্যালয় ও খেলার মাঠের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এসব জনসেবামূলক সুবিধার জন্য নির্ধারিত জমি প্লট আকারে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, অনুমোদিত নকশায় প্রকল্পের বি-ব্লকের ই-১০৬ প্লটটি বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত থাকলেও সেটি প্লট হিসেবে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।[৮৫]

অনেক ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী যেসব কমিউনিটি সুবিধা বিনামূল্যে থাকার কথা, পরবর্তীতে সেগুলোর উন্নয়নের অজুহাতে বা নতুন করে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার নামে প্লট ক্রেতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত 'সার্ভিস চাজ' বা ফি আদায় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকার একটি বৃহৎ বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পে খেলার মাঠসহ বিভিন্ন নাগরিক সুবিধার ব্যবস্থাপনা বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকায় বাসিন্দাদের কাছ থেকে গৃহকরের অনুরূপ সার্ভিস চার্জ আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়।[৮৬]

এই খাতের দুর্নীতির একটি কৌশলী দিক হলো আইনি বাধ্যবাধকতা এড়াতে প্রকল্পের আয়তন নিয়ে কারসাজি। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী, ঢাকা শহরে ৫ একর এবং ঢাকার বাইরে ১০ একর বা তদূর্ধ্ব আয়তনের প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ জমি কমিউনিটি সুবিধার জন্য বরাদ্দ রাখা বাধ্যতামূলক। এই শর্ত এড়াতে অনেক প্রভাবশালী ডেভেলপার তাদের বৃহৎ প্রকল্পগুলোকে কৃত্রিমভাবে একাধিক ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে দেখায় (যেমন ১০ একরের একটি প্রকল্পকে পৃথক দুটি ৫ একরের প্রকল্প হিসেবে দেখানো)। এই কৌশলের মাধ্যমে তারা বড় প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য বাধ্যতামূলক নাগরিক ও সামাজিক সুবিধা প্রদানের দায়বদ্ধতা থেকে সুকৌশলে নিজেদের মুক্ত রাখে।

৫.৩.২ নির্মাণ/উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনিয়ম

কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানির বিরুদ্ধে পরিবেশগত শর্ত এবং অনুমোদিত পরিকল্পনা বা প্রযোজ্য পরিকল্পনা মানদণ্ড উপেক্ষা করে নির্ধারিত জমির চেয়ে বেশি জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার অভিযোগ পাওয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমোদিত জমির পরিমাণের বাইরে ভূমি ভরাট ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগও ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালে ঢাকার বাড্ডা, সাতারকুল ও গজারিয়া এলাকায় একটি আবাসন প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদিত লে-আউট অনুযায়ী প্রকল্পের আয়তন প্রায় ১১৯ একর হলেও স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণে প্রায় ৪৩১ একর জমি ভরাটের তথ্য উঠে আসে। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পাঠানো লিগ্যাল নোটিশে অভিযোগ করে যে, অতিরিক্ত ভরাট করা প্রায় ৩১২ একর জমির পুরোটাই ড্যাপে চিহ্নিত জলাশয় ও সাধারণ প্লাবনভূমি এবং এসব এলাকায় বৈধ অনুমোদন ছাড়াই ভূমি ভরাট ও প্রকল্পের প্লট বিক্রির প্রচারণা চলছিল।[৮৭]

এছাড়া অনুমোদিত প্রকল্প পরিকল্পনা অনুসরণ না করে বাস্তবায়নের সময় প্রকল্পের নকশা, জমির ব্যবহার বা অবকাঠামোগত বিন্যাসে পরিবর্তন আনা হয়। এ ধরনের প্রকল্পে অনুমোদিত লে-আউট অনুযায়ী রাস্তা, নালা, উন্মুক্ত স্থান ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা বাস্তবায়ন না করা হলে প্রকল্পের পরিকল্পিত বিন্যাস ও পরিবেশগত ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং পরিকল্পিত নাগরিক সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। অন্যদিকে, নির্মাণাধীন প্রকল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী, নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ও কার্যকর তদারকি নিশ্চিত না করাও কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়। এ ছাড়া নির্মাণকাজের সময় ধুলাবালি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, পাইলিংয়ের উচ্চশব্দ এবং রাতে নির্মাণসামগ্রী ওঠানো-নামানোর মতো কার্যক্রম আশপাশের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে।

---

[৮৫] *দি ডেইলি স্টার*, 'তিন দশকেও স্কুল ও খেলার মাঠ বুঝে পাননি বাসিন্দারা,' ০৮ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২২, https://www.songbadprokash.com/national/17057 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[৮৬] *প্রথম আলো*, 'বসুন্ধরা যেন রাষ্ট্রের ভেতর আরেক রাষ্ট্র,' ২১ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/oqiieoq35d (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[৮৭] *দি ডেইলি স্টার*, 'জলাশয় ভরাট করে 'সানভ্যালী' আবাসন প্রকল্প, বেলার লিগ্যাল নোটিশ,' ২২ জুলাই ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-688046 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

৫.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন পর্যায়

৫.৪.১ প্লট বিক্রয় ও বরাদ্দ সংক্রান্ত অনিয়ম

বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট খাতে প্লট বিক্রয় ও বরাদ্দ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও নানা অনিয়ম, অস্বচ্ছতা এবং প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রকল্পের প্রচার-প্রচারণা থেকে শুরু করে প্লট হস্তান্তর এবং অর্থ ফেরতের প্রতিটি ধাপেই বিদ্যমান নানাবিধ প্রতারণামূলক কৌশল এই খাতের সার্বিক নির্ভরযোগ্যতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করছে। এই প্রক্রিয়ার প্রধান প্রধান অনিয়মগুলো নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

- **প্রকল্পের বৈধতা ও অনুমোদন সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান:** কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রকল্পের বৈধতা ও অনুমোদন সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্লট ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কিছু রিয়েল এস্টেট কোম্পানি প্রকল্পের বৈধতা প্রমাণের জন্য ভুয়া নিবন্ধন নম্বর, জাল দলিল কিংবা অনুমোদনসংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করে। প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পকে অনুমোদিত হিসেবে প্রচার করে প্লট বিক্রয়ের উদ্যোগ নেয়। এ ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোম্পানির মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি এবং অন্যের জমিতে বার্ষিক ভাড়ার চুক্তিতে (বছরে ১০-২০ হাজার টাকার) সাইনবোর্ড স্থাপন করে আবাসন প্রকল্পের জমি হিসেবে দেখিয়ে প্রচার ও প্লট বিক্রয়ের অভিযোগ রয়েছে।
- **এক প্লট একাধিক ব্যক্তির কাছে এবং জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার আগেই প্লট বিক্রয়:** প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার আগেই প্লট বিক্রয় বা বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জমির প্রকৃত মালিকানা ও দখল নিশ্চিত না করেই সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে প্লট বিক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া এবং তাঁদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই প্লট একাধিক ক্রেতার কাছে বিক্রয় বা বরাদ্দ দেওয়ার ফলে মালিকানা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- **বরাদ্দকৃত প্লট পরিবর্তন ও নিম্নমানের প্লট প্রদান:** ক্রেতাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বা পূর্বনির্ধারিত বরাদ্দের শর্ত উপেক্ষা করে প্লটের অবস্থান, আয়তন কিংবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্রেতা নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করা সত্ত্বেও পূর্বনির্ধারিত উন্নত অবস্থানের বা অধিক মূল্যের প্লটের পরিবর্তে নিম্নমানের বা কম মূল্যের প্লট গ্রহণে বাধ্য করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতার পূর্বসম্মতি ছাড়াই বরাদ্দকৃত প্লট পরিবর্তন করা হলে তাঁদের প্রত্যাশিত সুবিধা ও সম্পত্তির মূল্য প্রভাবিত হয়।
- **প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যায্য সুবিধা প্রদান:** প্লট বরাদ্দ ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অন্যায্য সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা কিংবা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাব ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে প্লট বরাদ্দে অগ্রাধিকার দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

৫.৪.২ প্লটের মালিকানা হস্তান্তর ও মূল্য পরিশোধে অনিয়ম

বেসরকারি আবাসন খাতে প্লট ক্রয়ের পর মালিকানা হস্তান্তর, পুনঃবিক্রয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ক্রেতাদের অধিকার ও আর্থিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

- **মালিকানা হস্তান্তরে কোম্পানির বাধ্যতামূলক অনুমতিপত্রের শর্ত:** ক্রয়কৃত প্লট অন্যের কাছে বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোম্পানির বাধ্যতামূলক অনুমতিপত্র (Permission Letter) গ্রহণের শর্ত আরোপের অভিযোগ রয়েছে। প্রকল্পের উন্নয়নকাজ সম্পন্ন হওয়ার পরও এ ধরনের শর্তের মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তনে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চুক্তি ও প্রযোজ্য আইনগত বিধানের বাইরে কোম্পানির অনুমোদনকে অপরিহার্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা প্লট মালিকদের সম্পত্তি হস্তান্তরের স্বাধীনতা সীমিত করে।
- **প্লট হস্তান্তরে দীর্ঘসূত্রতা ও বরাদ্দ বাতিল:** চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আর্থিক দায়বদ্ধতা পূরণ করা সত্ত্বেও প্লটের দখল বা মালিকানা হস্তান্তরে অযৌক্তিক বিলম্বের অভিযোগ রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দলিল সম্পাদন, নিবন্ধন বা প্লটের দখল বুঝিয়ে না দেওয়া এবং

পর্যাপ্ত কারণ বা পূর্বনোটিশ ছাড়াই বরাদ্দ বাতিল করার ঘটনাও ঘটে থাকে। বরাদ্দ বাতিলের পর জমাকৃত অর্থ ফেরত দিতে গড়িমসি বা ক্রেতাদের হয়রানি তাঁদের আর্থিক ক্ষতি ও ভোগান্তি বাড়ায় এবং চুক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

- **কিস্তি পরিশোধে কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও খেলাপি হিসেবে চিহ্নিতকরণ:** কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি কিস্তি পরিশোধের প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃত বা অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ক্রেতাদের নির্ধারিত সময়ে অর্থ জমা দেওয়া বাধাগ্রস্ত করে। পরবর্তী সময়ে এ বিলম্বের ভিত্তিতে ক্রেতাদের খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করা এবং চুক্তির শর্তের অপব্যাখ্যা করে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করার অভিযোগও রয়েছে। দাবি পূরণ না হলে প্লট হস্তান্তর বন্ধ রাখা বা বরাদ্দ বাতিলের হুমকি দিয়ে ক্রেতাদের ওপর আর্থিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়।
- **অর্থ ফেরতে গড়িমসি ও প্রতারণার মাধ্যমে ক্রেতাদের অর্থ আটকে রাখা:** আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন, লোভনীয় অফার ও প্লট হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ক্রেতাদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার পর চুক্তি অনুযায়ী প্লট হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হওয়া কিংবা বরাদ্দ বাতিলের পর জমাকৃত অর্থ ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়ায় অযৌক্তিক কর্তন, দীর্ঘসূত্রতা ও প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি করে ক্রেতাদের হয়রানি করা এবং প্রাপ্য অর্থের সম্পূর্ণ অংশ ফেরত না দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে অভিযোগ নিষ্পত্তি ও আইনি প্রতিকার গ্রহণের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করা হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। ফলে বহু ক্রেতার দীর্ঘদিনের সঞ্চয় আটকে থাকায় তাঁরা আর্থিক ক্ষতি, অনিশ্চয়তা ও ভোগান্তির শিকার হন। জানা যায়, রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর লোভনীয় অফারে আকৃষ্ট হয়ে প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের পর প্রতারণার শিকার হয়ে ২০ হাজারেরও বেশি ক্রেতা তাদের অর্থ ফেরতের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এসব কোম্পানি ক্রেতাদের প্রতারিত করেছে, ফলে বছরের পর বছর চেষ্টা, এমনকি মামলা করেও ভুক্তভোগীরা তাদের প্রাপ্য অর্থ উদ্ধার করতে পারছেন না।[৮৮]
- **ক্রেতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের আর্থিক হয়রানি:** কিস্তি পরিশোধ চলমান থাকা অবস্থায় কোনো ক্রেতার মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্লটের অধিকার প্রতিষ্ঠা, বরাদ্দ হস্তান্তর কিংবা জমাকৃত অর্থ ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে অযৌক্তিক জটিলতার মুখোমুখি হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও আইনি প্রক্রিয়ার অজুহাতে হস্তান্তর কার্যক্রম দীর্ঘায়িত করা কিংবা অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত ক্রেতার জমাকৃত অর্থ ফেরত দেওয়া বা বরাদ্দের অধিকার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও অযৌক্তিক বিলম্ব করা হয়।
- **নগদ লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ ও আর্থিক স্বচ্ছতার ঘাটতি:** আইন অনুযায়ী সকল প্রকার লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে হওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি নগদ অর্থে প্লটের মূল্য বা কিস্তির অর্থ গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়, অন্যদিকে লেনদেনের কোনো আনুষ্ঠানিক রেকর্ড না থাকায় আইনি বিরোধ তৈরি হলে প্লট ক্রেতা গ্রাহক আইনি ও আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার মুখে পড়েন।
- **প্লটের মূল্য ও কিস্তি পরিশোধের প্রমাণ ও আর্থিক নথি সংরক্ষণে ঘাটতি:** প্লটের মূল্য ও কিস্তি পরিশোধের বিপরীতে যথাযথ রসিদ, হিসাব বিবরণী বা লিখিত স্বীকৃতি প্রদান না করা এবং লেনদেনের তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করার অভিযোগ রয়েছে। ফলে ক্রেতাদের পরিশোধিত অর্থের সঙ্গে কোম্পানির সংরক্ষিত হিসাবের অসামঞ্জস্য দেখা দিলে অর্থ পরিশোধের প্রমাণ উপস্থাপন, বিরোধ নিষ্পত্তি ও প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া আর্থিক নথিপত্রের ঘাটতি প্রকৃত অর্থপ্রবাহ যাচাই বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি অর্থপ্রবাহ গোপন করা বা কর-সংক্রান্ত অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

৫.৫ প্লট বিক্রয় ও গ্রাহক ব্যবস্থাপনা পর্যায়

৫.৫.১ প্লট ক্রেতার কাছ থেকে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অতিরিক্ত অর্থ আদায় ও পদ্ধতিগত অনিয়ম

অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি প্লট হস্তান্তরের পর এবং আবাসন নির্মাণের সময় নানা অজুহাতে গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকে। জমি ক্রয়-বিক্রয় বা মালিকানা হস্তান্তরের সময় জমির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে মোটা অঙ্কের 'উন্নয়ন ফি'

[৮৮] *বাংলা রিপোর্ট*, 'হাজার কোটি টাকার প্লট ও ফ্ল্যাট কিনে প্রতারিত ক্রেতারা,' ২৮ নভেম্বর ২০২১, https://banglareport.net/exclusive/article/172/হাজার-কোটি-টাকার-প্লট-ও-ফ্ল্যাট-কিনে-প্রতারিত-ক্রেতারা (১২ এপ্রিল ২০২৬)।

(Development Charge) বা 'সার্ভিস চার্জ' এবং ক্ষেত্র বিশেষে 'ইউটিলিটি সরবরাহ চার্জ' দিতে বাধ্য করা হয়। এমনকি ক্রেতা যখন নিজের জমিতে বাড়ি নির্মাণ করতে যান, তখন কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জ না দিলে নির্মাণকাজে সরাসরি বাধা সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া প্লট বিক্রির সময় "মালিকানা হস্তান্তর ফি/ট্রান্সফার ফি" নেওয়ার পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারীদের কাছ থেকে প্রতি মাসে বাধ্যতামূলক "মাসিক ফি" আদায় করা হয়, যা পরিশোধ না করলে যাতায়াতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পে বিশেষ করে বড় বড় প্রকল্পে সীমানা প্রাচীর, ইউলিটির সংযোগ, ড্রেইন/কালভার্ট নির্মাণ ও সংযোগ, রাস্তা, লেক, পার্ক এবং ডেকোরেশনের অজুহাতে কোম্পানিগুলো কাঠা প্রতি বিশাল অংকের "উন্নয়ন ফি" চার্জ করে থাকে। চটকদার বিজ্ঞাপনে কোম্পানিগুলো কেবল প্লটের মূল দাম উল্লেখ করে গ্রাহককে আকৃষ্ট করলেও অনেক সময় চুক্তিতে এই ফি-র কথা উল্লেখ থাকে না বা থাকলেও "প্রযোজ্য ক্ষেত্রে" লিখে রাখা হয়। কিন্তু প্লট ক্রয়ের সময় এবং এর পরবর্তীতে গ্রাহকদের ওপর এই বর্ধিত অর্থের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা গ্রাহককে আর্থিক সংকটে ফেলে দেয়। নিচে গ্রাহকদের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত ব্যয়ের খাত ও আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কে দেওয়া হলো (সারণি ৫.৪)।

সারণি ৫. ৩: গ্রাহকদের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত ব্যয়ের খাত ও আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ

প্লট ক্রয় ও প্লটের মালিকানা বুঝে পাওয়া পর্যন্ত ক্রেতার অতিরিক্ত ব্যয়ের খাতসমূহ			
অতিরিক্ত ব্যয়ের খাতসমূহ	**অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)**		**পরিশোধের ধরন**
১. **উন্নয়ন ফি/সার্ভিস চার্জ**	কাঠাপ্রতি (টাকা)	২৫ হাজার - ৫ লক্ষ	এককালীন
২. **বিদ্যুৎ সংযোগ নির্মাণ ও খুঁটি স্থাপন**	কাঠাপ্রতি (টাকা)	৪ হাজার - ১০ হাজার	এককালীন
৩. **ইউটিলিটি ডিপোজিট**	প্লটপ্রতি (টাকা)	১ লক্ষ - ২.৫০ লক্ষ	এককালীন
৪. **পানির লাইন সংযোগ ও প্রসেসিং ফি**	প্লটপ্রতি (টাকা)	৩০ হাজার - ১.৫০ লক্ষ	এককালীন
৫. **রোড কাটিং ও পাইপ ফিটিং চার্জ**	প্লটপ্রতি (টাকা)	৫ হাজার - ২০ হাজার	এককালীন
৬. **প্লটের সীমনা প্রাচীর ও অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ চার্জ**	প্লটপ্রতি (টাকা)	৪ লক্ষ - ৫ লক্ষ	এককালীন
৭. **ড্রেইন, কালভার্ট নির্মাণ ও সংযোগ ফি**	প্লটপ্রতি (টাকা)	১.২০ লক্ষ - ১.৫০ লক্ষ	এককালীন
৮. **পজেশন হ্যান্ডওভার ও অবস্থান হস্তান্তর ফি**	প্লটপ্রতি (টাকা)	২০ হাজার - ৫০ হাজার	এককালীন
৯. **নামজারি ও মিউটেশন প্রসেসিং ফি**	প্লটপ্রতি (টাকা)	৩০ হাজার - ৮০ হাজার	এককালীন
প্লট ক্রয় পরবর্তী প্লটক্রেতার অন্যান্য অতিরিক্ত ব্যয়ের খাতসমূহ			
অতিরিক্ত ব্যয়ের খাতসমূহ	**অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)**		**পরিশোধের ধরন**
১০. **অবকাঠামো নির্মাণ অনুমতি/ ডেভেলপমেন্ট পারমিশন ফি** • **সংশ্লিষ্ট ডেভেলপার দিয়ে**	কাঠাপ্রতি (টাকা)	২ লক্ষ - ১০ লক্ষ	এককালীন
• **প্লট ক্রেতা নিজে**	কাঠাপ্রতি (টাকা)	৫০ হাজার - ১.৫০ লক্ষ	
১১. **মালিকানা হস্তান্তর ফি/ট্রান্সফার ফি**	কাঠাপ্রতি (টাকা)	২৫ হাজার - ১০ লক্ষ	প্রতিবার
১২. **সার্ভিস চার্জ (প্লট বিক্রয়)**	কাঠাপ্রতি (টাকা)	২৫ হাজার - ৫০ হাজার	প্রতিবার
১৩. **অন্য কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি/ব্যক্তিমালিকের থেকে প্লট ক্রয়ে**	কাঠাপ্রতি (টাকা)	৫ লক্ষ - ১০ লক্ষ	প্রতিবার
১৪. **প্রকল্প এলাকায় বসবাসের জন্য মাসিক ট্যাক্স** • **নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকলে**	বর্গফুট প্রতি (টাকা)	০.৬ - ১	প্রতি মাসে
• **ফ্ল্যাট ভাড়া দিলে**	বর্গফুট প্রতি (টাকা)	০.৮ - ১.৫০	প্রতি মাসে

এই অতিরিক্ত ব্যয়গুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

- **উন্নয়ন ও অবকাঠামো সংক্রান্ত এককালীন ব্যয়:** প্লট হস্তান্তরের আগে বা পরে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো উন্নয়ন ফি বা সার্ভিস চার্জ হিসেবে কাঠাপ্রতি ২৫ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা আদায় করে। এছাড়া রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের

জন্য আলাদাভাবে কয়েক লক্ষ টাকা নেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাথমিক মূল্যের মধ্যে এসব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা থাকলেও পরবর্তীতে গ্রাহককে তা দিতে বাধ্য করা হয়।

- **নির্মাণ ও মালিকানা পরিবর্তনজনিত ফি:** ক্রেতা যখন নিজের জমিতে বাড়ি নির্মাণ করতে যান, তখন কাঠা প্রতি নির্দিষ্ট চার্জ দিতে হয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, প্রতিবার মালিকানা পরিবর্তনের সময় কাঠাপ্রতি ২৫ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত "ট্রান্সফার ফি" দিতে হয়। ফলে সম্পদটি কার্যত কোম্পানির নিয়ন্ত্রণেই থেকে যায় এবং মালিকানা পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপেই কোম্পানি মুনাফা অর্জন করে।
- **বসবাসকালীন নিয়মিত শুল্ক বা মাসিক চার্জ:** প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে নিরাপত্তা ও কল্যাণ সমিতির সদস্য ব্যবস্থাপনার অজুহাতে ডেভেলপার বা হাউজিং সোসাইটি কর্তৃপক্ষ দ্বারা অবস্থানরত ভাড়াটেদের কাছ থেকে অননুমোদিতভাবে "ভাড়াটে নিবন্ধন ফি" আদায় করা হয়। প্রকল্প এলাকায় বসবাসের ক্ষেত্রে নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকলেও প্রতি বর্গফুটে নির্দিষ্ট হারে মাসিক চার্জ দিতে হয়। যদি কোনো মালিক তার ফ্ল্যাটটি ভাড়া দেন, তবে ভাড়ার ওপর ভিত্তি করে এই চার্জের হার আরও বেড়ে যায়। ফ্ল্যাটের মালিক ও ভাড়াটিয়া ভেদে এই মাসিক ফি এর পরিমাণ আনুমানিক প্রতি বর্গফুটে ০.৮ - ১.৫০ টাকা।

বেসরকারি আবাসন খাতের অন্যতম একটি অনিয়ম প্লটের মূল দামের বাইরে গ্রাহকের ওপর অন্যায্য ও বিশাল অঙ্কের অতিরিক্ত অর্থ চাপিয়ে দেওয়া। রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো উন্নয়ন ফি, ইউটিলিটি চার্জ, সমন্বয় ফি, সীমানা প্রাচীর, কালভার্ট ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং ড্রেনেজ সংযোগের প্রসেসিং ফিসহ বিভিন্ন নামে চুক্তির বাইরে প্রকল্পভেদে বিপুল অর্থ দাবি করে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্লট হস্তান্তর পর্যন্ত একজন ক্রেতাকে **প্লটের মূল্যের অতিরিক্ত প্রতি কাঠায় প্রায় ১৪.৫০ লক্ষ টাকা** পর্যন্ত ব্যয় বহন করতে হয়। আধুনিক ও বিলাসবহুল আবাসন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ ব্যয়ের পরিমাণ আরও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে প্লটের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে অতিরিক্ত ব্যয় একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না, কারণ এ-সংক্রান্ত কিছু ব্যয় প্লটপ্রতি নির্দিষ্ট হারে ধার্য করা হয়, অন্যদিকে কিছু ব্যয় প্লটের আয়তনের ওপর নির্ভরশীল। ফলে প্লটের আকারভেদে ক্রেতার মোট অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ও প্রতি কাঠায় গড় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী চুক্তির বাইরে অতিরিক্ত কোনো অর্থ আদায় করার সুযোগ নেই।

৫.৫.২ প্রকল্প এলাকায় পণ্য ও সেবা ক্রয়ে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ

গ্রাহককে জিম্মিকরণ প্রক্রিয়ায় কোম্পানির নিজস্ব পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসা নিশ্চিত করার প্রবণতাও দেখা যায়। প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী বা নির্মাণাধীন বাড়ির মালিকদের সেই কোম্পানির নিজস্ব ব্র্যান্ডের পণ্য (যেমন এলপিজি, ইন্টারনেট ও কেবল টিভি সংযোগ, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ইত্যাদি) ব্যবহারে বাধ্য করা হয়। এমনকি নির্মাণ-সংক্রান্ত পণ্য/সেবা (যেমন নির্মাণ সামগ্রী, রেডিমিক্স কংক্রিট, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং সামগ্রী ইত্যাদি) কেবল কোম্পানির অনুমোদিত ভেন্ডার থেকেই বাজারদরের চেয়ে ১০-২০% বেশি টাকা ব্যয় করে ক্রয় করতে হয়। অনেক প্রকল্পে ক্রেতা নিজে বাড়ি করলেও মাটি পরীক্ষা এবং স্থাপত্য নকশা কোম্পানির অনুমোদিত ফার্ম থেকে করানো বাধ্যতামূলক, যা বাজার দরের চেয়ে ২০% থেকে ৫০% বেশি। এছাড়া কোনো ভাড়াটিয়া প্রকল্প এলাকায় বাসা ভাড়া নিতে গেলে তাদের কাছ থেকেও অতিরিক্ত "রেজিস্ট্রেশন ফি" আদায় করা হয়।

৫.৫.৩ প্লটের মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য নানা অজুহাতে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা

কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানির বিরুদ্ধে প্লট বরাদ্দের পর চুক্তির শর্তের বাইরে গিয়ে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি বা উন্নয়নকাজের অতিরিক্ত খরচের অজুহাতে প্লটের মূল্য বাড়ানো এবং রেজিস্ট্রেশন, মামলা পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যয়ের নামে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করার অভিযোগ রয়েছে। এসব অর্থের পরিমাণ, হিসাবের ভিত্তি ও ব্যয়ের বিবরণ সম্পর্কে ক্রেতাদের যথাযথ তথ্য প্রদান না করায় আর্থিক স্বচ্ছতার ঘাটতি সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের জন্য কৃত্রিম জটিলতা সৃষ্টি এবং দাবি করা অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানালে প্লট হস্তান্তরে বাধা বা বরাদ্দ বাতিলের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৫.৬ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনিয়ম

গবেষণায় দেখা যায়, কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে চেয়ারম্যান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ ও নির্বাচনের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই; আবার যেসব প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের নীতিমালা রয়েছে, সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। কোম্পানির পরিচালনা

পর্ষদ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবের আধিক্যের কারণে সাধারণ সভার কার্যকর সম্মতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি উপেক্ষা করে পারিবারিক পর্যায়ে চেয়ারম্যান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্বাচন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এ ধরনের চর্চা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ ও জবাবদিহির ঘাটতি নির্দেশ করে এবং স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ায়।

একইভাবে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ধারা ১৩০ ও করপোরেট গভর্ন্যান্স উপেক্ষা করে পরিচালনা পর্ষদে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র পরিচালক (Independent Director) না রেখে পরিবারকেন্দ্রিক একক নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠান চালানোয় স্বার্থের সংঘাত, ক্রেতা স্বার্থক্ষুণ্ন হওয়া এবং অনিয়মের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। বিশেষত, গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে কার্যকর তদারকি এবং স্বাধীন পর্যালোচনার অভাব থাকলে অনিয়ম শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পক্ষপাত, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্নীতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে।

৫.৭ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ও সরকারি সংস্থার মধ্যে নিয়মবহির্ভূত লেনদেন

বেসরকারি আবাসন খাতের প্রকল্প অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রতিটি ধাপে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের এক সুসংহত দুর্নীতির জাল পরিলক্ষিত হয়। রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিশ্চিত করতে গিয়ে নিয়মিতভাবে যে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ ব্যয় করে, তা 'স্পিড মানি' (Speed Money) হিসেবে পরিচিত। এই লেনদেনের বিষয়টি এতটাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে যে, অধিকাংশ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি তাদের প্রকল্প বাজেটে এই অর্থকে 'বিবিধ ব্যয়ের' (Miscellaneous Cost) মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে রাখে। মূলত সরকারি দপ্তরে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা এড়ানো এবং আইনি শৈথিল্য নিশ্চিত করতেই এই অর্থ ব্যবহার করা হয়।

সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের অভ্যন্তরে এই ধরনের অনানুষ্ঠানিক লেনদেন মূলত 'টেবিল খরচ' ও 'মিটিং খরচ' – এই দুই নামে সম্পন্ন হয়। এখানে 'টেবিল খরচ' বলতে বোঝানো হয় ফাইলটি যেন দ্রুত এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে স্থানান্তরিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা যেন নথির ত্রুটিসমূহ উপেক্ষা করেন। অন্যদিকে 'মিটিং খরচ' বলতে অনুমোদন সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক সভাগুলোর আয়োজন এবং নীতিনির্ধারকদের কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্তের অনুকূলে আনার ব্যয়কে বোঝানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি শতভাগ আইন মেনে এবং উচ্চমানের কারিগরি নকশা জমা দেওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ফাইলটি ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রেখে আবেদনকারীকে অনানুষ্ঠানিক আর্থিক যোগাযোগ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বাধ্য করে।

নিচে বেসরকারি আবাসন খাতে জড়িত সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের একটি প্রাক্কলন তুলে ধরা হলো।[৮৯]

সারণি ৫. ৪: সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থায় নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের প্রাক্কলিত হিসাব

উদ্দেশ্য বা পর্যায়	নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের পরিমাণ (টাকা)	যে প্রতিষ্ঠানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়	ব্যয়ের দায়ভার (পর্যায়)	পরিশোধের ধরন
১. **জমির শ্রেণি/ মৌজা পরিবর্তন**	৫০ হাজার - ১ লক্ষ	উপজেলা/ জেলা ভূমি অফিস	কোম্পানি	প্রয়োজন অনুযায়ী
২. **জমির নামজারি (মিউটেশন)**	১০ হাজার - ২০ হাজার	এসি ল্যান্ড অফিস	কোম্পানি	এককালীন
৩. **আবাসিক প্রকল্পের লে-আউট/প্রকল্পের অনুমোদন**	১০ লক্ষ - ২ কোটি	রাজউক	কোম্পানি	এককালীন
৪. **অনিবন্ধিত প্রকল্পের বিরুদ্ধে আইন ব্যবস্থা এড়ানো এবং পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ (ইন্সপেক্টরকে প্রদত্ত)**	৩০ লক্ষ - ৪০ লক্ষ	রাজউক	কোম্পানি	প্রয়োজন অনুযায়ী
৫. **ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র**	৩০ লক্ষ - ১ কোটি	রাজউক	কোম্পানি	এককালীন
৬. **জমির মালিকানা পরিবর্তন (কোম্পানি-প্লট ক্রেতা)**	৫ লক্ষ - ১০ লক্ষ	রাজউক	কোম্পানি	প্রয়োজন অনুযায়ী

[৮৯] সাক্ষাৎকার, মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান, ভুক্তভোগী (ব্যক্তি ও রিয়েল এস্টেট কোম্পানি) এবং অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত হিসাব।

উদ্দেশ্য বা পর্যায়	নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের পরিমাণ (টাকা)	যে প্রতিষ্ঠানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়	ব্যয়ের দায়ভার (পর্যায়)	পরিশোধের ধরন
৭. রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নিবন্ধন প্রাপ্তি	১ লক্ষ - ১.৫০ লক্ষ	রাজউক	কোম্পানি	এককালীন
৮. বিদ্যুতের সংযোগ ও গ্রিড সাবস্টেশন স্থাপন (প্রকল্প)	১০ লক্ষ - ৫০ লক্ষ	ডিপিডিসি/ডেসকো	ব্যক্তি/কোম্পানি	এককালীন
৯. অভ্যন্তরীণ (অঞ্চলভিত্তিক) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং অন্যান্য লাইন তৈরি	৫০ লক্ষ - ১ কোটি	ঢাকা ওয়াসা	কোম্পানি	পর্যায়ক্রমিক ভিত্তিতে
১০. ডিপ টিউবওয়েল বা গভীর নলকূপ স্থাপন	১ কোটি - ১.২০ কোটি	ঢাকা ওয়াসা	কোম্পানি	এককালীন
১১. প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র (একর প্রতি)	১ লক্ষ - ১.৫০ লক্ষ	পরিবেশ অধিদপ্তর	কোম্পানি	এককালীন
১২. পরিবেশগত ছাড়পত্র (একর প্রতি)	৩ লক্ষ - ৬ লক্ষ	পরিবেশ অধিদপ্তর	কোম্পানি	এককালীন
১৩. ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র/টিআইএ অনুমোদন (একর প্রতি)	৩ লক্ষ - ৫ লক্ষ	ডিটিসিএ	কোম্পানি	এককালীন

উদাহরণস্বরূপ, নিচে একটি কাল্পনিক রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নিবন্ধন প্রাপ্তি থেকে শুরু করে ২৫ একর আয়তনের একটি বেসরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদাহরণ বিবেচনা করা হয়েছে।[৯০] গবেষণায় চিহ্নিত ১৩টি খাতের মধ্যে ১০টি খাতের ব্যয় প্রকল্পভিত্তিক এবং বাকি তিনটি খাতের ব্যয় একরপ্রতি নির্ধারিত। সে অনুযায়ী, প্রকল্পভিত্তিক খাতগুলোর ব্যয় একবার করে এবং একরপ্রতি নির্ধারিত খাতগুলোর ব্যয় প্রকল্পের মোট আয়তন (২৫ একর) দিয়ে গুণ করে হিসাব করা হয়েছে। প্রাক্কলনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য উভয় ধরনের ব্যয়ের হিসাব পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৫. ৫: একটি ২৫ একর আয়তনের বেসরকারি আবাসন প্রকল্পে সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থায় নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের প্রাক্কলিত হিসাব

ক. ২৫ একর আয়তনের প্রকল্পে ১০টি খাতের ব্যয় (প্রকল্পভিত্তিক নির্ধারিত)		
উদ্দেশ্য বা পর্যায়	প্রাক্কলিত পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	
	নিম্নসীমা	উচ্চসীমা
১. জমির শ্রেণি/ মৌজা পরিবর্তন	০.৫	১.০
২. জমির নামজারি (মিউটেশন)	০.১	০.২
৩. আবাসিক প্রকল্পের লে-আউট/প্রকল্পের অনুমোদন	১০.০	২০০.০
৪. অনিবন্ধিত প্রকল্পের বিরুদ্ধে আইন ব্যবস্থা এড়ানো এবং পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ	৩০.০	৪০.০
৫. ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র	৩০.০	১০০.০
৬. জমির মালিকানা পরিবর্তন	৫.০	১০.০
৭. রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নিবন্ধন প্রাপ্তি	১.০	১.৫
৮. বিদ্যুতের সংযোগ ও গ্রিড সাবস্টেশন স্থাপন	১০.০	৫০.০
৯. অভ্যন্তরীণ (অঞ্চলভিত্তিক) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং অন্যান্য লাইন তৈরি	৫০.০	১০০.০
১০. ডিপ টিউবওয়েল বা গভীর নলকূপ স্থাপন	১০০.০	১২০.০
প্রকল্পভিত্তিক ১০টি খাতের মোট ব্যয়ের পরিমাণ	**২৩৬.৬ লক্ষ ২.৩৭ কোটি**	**৬২২.৭ লক্ষ ৬.২৩ কোটি**
খ. ২৫ একর আয়তনের প্রকল্পে ৩টি খাতের ব্যয় (একরপ্রতি নির্ধারিত)		
উদ্দেশ্য বা পর্যায়	প্রাক্কলিত পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	
	নিম্নসীমা	উচ্চসীমা
১১. প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র	২৫.০	৩৭.৫
১২. পরিবেশগত ছাড়পত্র	৭৫.০	১৫০.০
১৩. ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র/টিআইএ অনুমোদন	৭৫.০	১২৫.০

[৯০] এ প্রাক্কলন গবেষণায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি; এটি কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানি বা প্রকল্পের নিরীক্ষিত হিসাব নয়।

ক. ২৫ একর আয়তনের প্রকল্পে ১০টি খাতের ব্যয় (প্রকল্পভিত্তিক নির্ধারিত)		
উদ্দেশ্য বা পর্যায়	প্রাক্কলিত পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	
	নিম্নসীমা	উচ্চসীমা
একরপ্রতি ৩টি খাতের মোট ব্যয়ের পরিমাণ	১৭৫.০ লক্ষ ১.৭৫ কোটি	৩১২.৫ লক্ষ ৩.১৩ কোটি
২৫ একর আয়তনের একটি বেসরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে নিয়মবহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ (ক+খ)	৪১১.৬ লক্ষ (৪.১২ কোটি)	৯৩৫.২ লক্ষ (৯.৩৫ কোটি)
অর্থাৎ একটি বেসরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে আনুমানিক নিয়মবহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ (একরপ্রতি)	১৬.৫০ লক্ষ (০.১৬৫ কোটি)	৩৭.৫ লক্ষ (০.৩৭৫ কোটি)

দেখা যায়, একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নিবন্ধন প্রাপ্তি এবং একটি বেসরকারি আবাসন প্রকল্প শুরুর প্রাথমিক পর্যায় (জমির শ্রেণি পরিবর্তন) থেকে শুরু করে ইউটিলিটি সংযোগ গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে একটি সুনির্দিষ্ট এবং বিশাল অংকের নিয়মবহির্ভূত লেনদেন বিদ্যমান। এর মধ্যে প্রকল্পের আওতাধীন ১০টি প্রকল্পভিত্তিক খাত এবং সরাসরি একরপ্রতি নির্ধারিত ৩টি ছাড়পত্র ও অনুমোদন সংক্রান্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রদত্ত তথ্য কোনো আনুষ্ঠানিক বা সরকারি নির্ধারিত ফি নির্দেশ করে না; বরং বেসরকারি আবাসন খাতে প্রচলিত অনানুষ্ঠানিক বা নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের একটি বাস্তবচিত্র তুলে ধরে। রাজউক, ভূমি অফিস এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই লেনদেনের পরিমাণ কয়েক হাজার থেকে শুরু করে কোটি টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতাধীন ১০টি প্রকল্পভিত্তিক খাত এবং সরাসরি একরপ্রতি নির্ধারিত তিনটি ছাড়পত্র ও অনুমোদন সংক্রান্ত ব্যয় একসঙ্গে যুক্ত করলে **স্বাভাবিক ক্ষেত্রে একটি বেসরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় একরপ্রতি সামগ্রিক নিয়মবহির্ভূত ব্যয়ের গড় পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬.৫০ লক্ষ থেকে ৩৭.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত**। অর্থাৎ ২৫ একরের বেসরকারি আবাসন প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নিয়মবহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় আনুমানিক ৪.১২ কোটি থেকে ৯.৩৫ কোটি টাকা পর্যন্ত।

তবে "বিশেষ ক্ষেত্রে" এই ব্যয়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। এখানে "বিশেষ ক্ষেত্র" বলতে বোঝানো হয়েছে অনুমোদন প্রক্রিয়া জটিল, বৃহৎ প্রকল্প এলাকা ও অতিরিক্ত মুনাফা লাভের সম্ভাবনা, ভূমির শ্রেণি ও মাস্টার প্ল্যানে বড় কোনো পরিবর্তন/ড্যাপ/স্ট্রাকচারাল প্ল্যানবহির্ভূত প্রকল্প, অবকাঠামোগত চাহিদা, কঠোর নিয়ন্ত্রণ, নীতিগত বাধা, আইনি ঝুঁকি, প্রকল্পের সংবেদনশীল ও কৌশলগত অবস্থান, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রক্রিয়া, দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চলাকালীন অবস্থা ইত্যাদি। দুর্নীতির এই অর্থনীতিতে 'ঝুঁকি' একটি বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বিশেষ প্রতিকূল সময়ে, যেমন দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চলাকালীন যখন প্রশাসনিক নজরদারি বৃদ্ধি পায়, তখন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা মধ্যস্থতাকারীরা এই বাড়তি ঝুঁকিকে সরাসরি আর্থিক মূল্যে রূপান্তর করেন। ধরা পড়ার ঝুঁকি (Risk Factor) যত বৃদ্ধি পায়, নিয়ম-বহির্ভূত লেনদেনের 'রেট' বা টাকার পরিমাণও তত বেশি দাবি করা হয়।

৫.৮ সংবাদমাধ্যমের কৌশলগত ব্যবহার

বেসরকারি আবাসন খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি আড়াল করার অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। গণমাধ্যমের মালিকানা ও ব্যবসায়িক স্বার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক কখনো কখনো সমালোচনামূলক সাংবাদিকতা, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনসাধারণের তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। এর মাধ্যমে তারা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ, প্রভাব বিস্তার এবং তথ্য নিয়ন্ত্রণে অনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে "মিডিয়া ক্যাপচার" করে।

বেসরকারি আবাসন খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের মালিকানাগত স্বার্থ এবং সম্পাদকীয় স্বাধীনতার সম্ভাব্য সংঘাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। ভৌমিক (২০২৬)-এর গবেষণায় সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে দেখা যায়, জমি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত গণমাধ্যমের মালিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংবাদ নির্বাচন ও সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে থাকে। গবেষণাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, জমি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত গণমাধ্যমের মালিকেরা নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জমি-সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশে আগ্রহ দেখানো, অথচ তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে – এমন

সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এ ধরনের প্রবণতা আবাসন খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে স্বাধীন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং জনসাধারণের তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচ্য। অন্যদিকে, আবাসন ব্যবসার সঙ্গে গণমাধ্যমের মালিকানা ও প্রভাব বিস্তারের সম্পর্ক নিয়ে ২০১৪ সালেও তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল।[৯১] সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ অনুযায়ী, কিছু আবাসন ব্যবসায়ীর নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্র থাকায় তাঁরা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের (যেমন জলাশয় ভরাট, জবরদখল ও বিক্রয়ের জন্য আবাসন প্রকল্পের সাইনবোর্ড স্থাপন) প্রতিবাদকারীদের গণমাধ্যমে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

> "ধরেন আমি যদি কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বিরুদ্ধে নিউজ করতে যাই, কোনো মিডিয়া পারসন আমাকে ফোন দিয়ে বলবে - ভাই, এটা তো আমাদের বিরুদ্ধে নিউজ, আমরা তো চাকুরি করি এখানে!!... আসলে এদেরকে রাখা হয়েছে এটাকে (এসব নিউজ প্রকাশ) ঠেকানোর জন্য...।"
>
> *– একজন সাংবাদিক*

উপরের উদাহরণ এবং বর্তমানে গবেষণার সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে বোঝা যায়, আবাসন ও ভূমি ব্যবসার সঙ্গে গণমাধ্যমের মালিকানা যুক্ত থাকলে স্বার্থের সংঘাত এবং তথ্যের স্বাধীন প্রবাহ সীমিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতে জড়িত একাধিক বৃহৎ ডেভেলপার গ্রুপ নিজস্ব গণমাধ্যম (সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রভাব কাঠামো গড়ে তুলেছে। নিচে নিজস্ব গণমাধ্যম আছে এমন রিয়েল এস্টেট কোম্পানির তালিকা দেওয়া হলো।

সারণি ৫. ৬: নিজস্ব গণমাধ্যম আছে এমন রিয়েল এস্টেট কোম্পানির তালিকা

গ্রুপ অব কোম্পানিজের নাম	রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নাম	গণমাধ্যমের ধরন		
		সংবাদপত্র (প্রিন্ট ও অনলাইন)	টেলিভিশন চ্যানেল	রেডিও চ্যানেল
বসুন্ধরা গ্রুপ	ইস্ট ওয়েস্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট প্রা. লি.	দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ডেইলি সান, বাংলানিউজটুয়েন্টিফোর ডট কম	নিউজ টুয়েন্টি ফোর, টি-স্পোর্টস	রেডিও কেপিটাল এফএম
রূপায়ন গ্রুপ	রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লি., রূপায়ন ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লি., রাতুল প্রপার্টিজ, রূপায়ন সিটি উত্তরা, রূপায়ন হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস	দেশ রূপান্তর		
যমুনা গ্রুপ	যমুনা বিল্ডার্স লি.	দৈনিক যুগান্তর	যমুনা টিভি	
এস. আলম গ্রুপ	হাসান আবাসান (প্রা.) লি.; এস. আলম প্রোপার্টিজ লি.		একুশে টেলিভিশন, নেক্সাস টিভি	
আশিয়ান গ্রুপ	আশিয়ান ল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড	দৈনিক মানবকণ্ঠ		
আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ	আমিন মোহাম্মদ ল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট	দৈনিক সময়ের আলো		
বিশ্বাস গ্রুপ	বিশ্বাস বিল্ডার্স লি.	দৈনিক কালবেলা		
বেক্সিমকো গ্রুপ	বেক্সিমকো হোল্ডিংস লি.	ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট	ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি	
ইউএস-বাংলা গ্রুপ	ইউএস-বাংলা অ্যাসেটস লি.	ঢাকা মেইল		
বেঙ্গল গ্রুপ	বেঙ্গল কনসেপ্ট অ্যান্ড হোল্ডিংস লি.		আরটিভি	
মোহাম্মদী গ্রুপ	এমজি প্রপার্টিজ লি.		নাগরিক টিভি	
ইউনিক গ্রুপ	বোরাক রিয়েল এস্টেট প্রাইভেট লি., ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস লি., ইউনিক প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লি.	আমাদের সময়		
মেঘনা গ্রুপ	মেঘনা রিয়েল এস্টেট লি.		মেঘনা টিভি, একাত্তর টিভি	

[৯১] *বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, 'PM tells land ministry to be 'tough on land grabbers',' ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪, https://bdnews24.com/bangladesh/pm-tells-land-ministry-to-be-tough-on-land-grabbers (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

গ্রুপ অব কোম্পানিজের নাম	রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নাম	গণমাধ্যমের ধরন		
		সংবাদপত্র (প্রিন্ট ও অনলাইন)	টেলিভিশন চ্যানেল	রেডিও চ্যানেল
এইচআরসি গ্রুপ	এইচআরসি প্রপার্টিজ লি., বাংলাদেশ ল্যান্ড লি., হামিদ প্রপার্টিজ লি.	দি নিউ এইজ, যায়যায়দিন		
কর্ণফুলী গ্রুপ	কর্ণফুলী গার্ডেন সিটি, এইচআর ভবন	ভোরের কাগজ	দেশ টিভি	
এশিয়ান গ্রুপ	এশিয়ান হাউজিং লিমিটেড		এশিয়ান টিভি	এশিয়ান রেডিও
-	রোজা প্রপার্টিজ, রোজা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক লি.		এনটিভি	
-	এজি গ্রিন প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টস লি., এজি প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লি.		ডিবিসি নিউজ	

উপরের সারণি হতে দেখা যায়, রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বিশেষ করে বড় ও প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর নিজস্ব গণমাধ্যম (সংবাদপত্র বা টেলিভিশন চ্যানেল) রয়েছে যা অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে বহুমাত্রিক সুবিধা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমত, নিজস্ব গণমাধ্যম ব্যবহার করে কোম্পানির ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রচার এবং অনিয়ম বা বিতর্কিত কার্যক্রম আড়াল করার সুযোগ তৈরি হয়।

দ্বিতীয়ত, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের উপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করা এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করার পাশাপাশি জনমতকে প্রভাবিত করার একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে গণমাধ্যম ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয়ত, অন্য কোনো স্বতন্ত্র গণমাধ্যম যেন কোম্পানির অনিয়ম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করতে না পারে, তা নিয়ন্ত্রণ বা বাধাগ্রস্ত করতে নিজস্ব এই প্রচারযন্ত্রকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চতুর্থত, প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলোর ওপর ব্যবসায়িক চাপ সৃষ্টি, জনমত গঠন বা বিরূপ প্রচারণা (প্রোপাগান্ডা), বাজারে প্রভাব বিস্তার এবং প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করার হাতিয়ার হিসেবে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়।

> "নিউজ করতে না পারার ক্ষেত্রে বিষয়টা হলো ধরেন যমুনা চাচ্ছে না যে বসুন্ধরা ক্ষেত্রে একটা নিউজ করে বসুন্ধরা তার শত্রু হোক বা বসুন্ধরাও আবার যমুনার বিরুদ্ধে নিউজ করুক... অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখবেন যে দেশ-রুপান্তর ডেভেলপার ব্যবসা করে, সেও এমন কোনো নিউজ করবে না... তারপর অন্যান্য যারা আছে তারাও করবে না... কারণ, তারা যদি নিউজ করতে যায়, দেখা গেলো তাদের বিরুদ্ধেও সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মিডিয়া ইচ্ছামত রিপোর্টিং করা শুরু করবে... মানে হলো, সাংঘর্ষিক যে ব্যাপারগুলো থাকে, সেই জায়গাগুলো থেকে কেউ কাউকে খোঁচাইতে চায় না...।"
>
> *—— একজন সাংবাদিক*

এক্ষেত্রে আরও যেসব অনিয়ম-দুর্নীতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তা নিচে দেওয়া হলো।

- রিয়েল এস্টেট কোম্পানি দ্বারা সংবাদ প্রকাশে বাধা প্রদান, সমালোচনামূলক প্রতিবেদন নিরুৎসাহিত করা কিংবা প্রকাশিত সংবাদ প্রত্যাহারের জন্য চাপ প্রয়োগের অভিযোগ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও জবাবদিহির প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। গবেষণায় দেখা যায়, কোনো কোম্পানির স্বার্থবিরোধী বা অনিয়ম সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশে বাধা প্রদান এবং ইতোমধ্যে প্রকাশিত খবর অনলাইন পোর্টাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সরিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট সংবাদ সংস্থাকে ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করা হয়।

- অনিয়ম ঢাকতে অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি অনুসন্ধানকারী সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে শত কোটি টাকার মানহানির মামলা দায়ের করে দীর্ঘমেয়াদী আইনি হয়রানিতে ফেলে তথ্য গোপন রাখতে বাধ্য করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১০ সালে ঢাকার একটি আবাসন প্রকল্প নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট রিয়েল এস্টেট কোম্পানির পক্ষ থেকে দেশের দুটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও

প্রকাশকদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে ৫০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা করা হয়।[৯২]

> "রিয়েল এস্টেট কোম্পনিগুলো আগে শুধু লাঠিয়াল বাহিনী পালতো... আর এখন লাঠিয়াল বাহিনীর সাথে সাংবাদিকও পালে...।"
>
> *– একজন সাংবাদিক*

- আবাসন প্রকল্প ও জলাশয় ভরাট সংক্রান্ত বা ভূমি উন্নয়ন কেন্দ্রিক ও আবাসন প্রকল্প সম্পর্কিত অভিযোগ অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের সময় সাংবাদিকদের রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী ও পেটোয়া বাহিনীর বাধা প্রদান ও ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার অভিযোগ পাওয়া যায়, যা সাংবাদিকদের নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকার কেরানীগঞ্জের একটি আবাসন প্রকল্পে ২০২৫ সালের ২২ জানুয়ারি রাজউকের জলাশয় ও কৃষিজমি উদ্ধার এবং অননুমোদিত সাইবোর্ড উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে দুটি রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশে ২০-২৫ জন ব্যক্তি পেশাগত দায়িত্ব পালনরত রাজউকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে মারধর করে, তাঁদের ক্যামেরা ভাঙচুর করে এবং তারেদ প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এতে দুইজন সাংবাদিক আহত হন।[৯৩] কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশ করায় সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে সরাসরি ভয়ভীতি প্রদর্শন, শারীরিক আক্রমণ, এমনকি চাকরি থেকে বরখাস্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মিডিয়া হাউজের ওপর চাপ প্রয়োগের মতো ঘটনা নিয়মিত পরিলক্ষিত হয়।

- অনেক ক্ষেত্রে মিডিয়া হাউজের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির পক্ষ থেকে সংবাদ সেন্সরশিপ নিশ্চিত করা হয়। এর বিপরীতে ইতিবাচক প্রচারণা বা অনিয়ম গোপন করার উদ্দেশ্যে সাংবাদিকদের নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান কিংবা আবাসন প্রকল্পে প্লট প্রদানের প্রলোভন দেখানো/প্লট দেওয়ার মতো 'অনৈতিক বাণিজ্যিক লেনদেন'-এর অভিযোগও পাওয়া যায়।

৫.৯ বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্য ও 'মাৎস্যন্যায়' বাস্তবতা

বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতে বড় ডেভেলপার কোম্পানিগুলোর প্রভাব ক্রমেই একটি "মাৎস্যন্যায়" বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে, যেখানে শক্তিশালীরাই বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। এই বৃহৎ কোম্পানিগুলো অর্থের বিনিময়ে এবং ক্ষমতার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সমান্তরালে একটি "সমান্তরাল ক্ষমতা কাঠামো" (Parallel Power Structure) গড়ে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, খোদ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এই বড় কোম্পানিগুলোর ভীতি বা প্রভাবের কারণে তাদের অবৈধ প্রকল্প সম্প্রসারণে বাধা না দিয়ে উল্টো সুযোগ করে দিচ্ছে।

> "বিল্ডিং এর নকশা দুই ধরনের হবে... একটাতে রাজউকের পারমিশন, আরেকটাতে বসুন্ধরার পারমিশন লাগবে... বসুন্ধরা পারমিশন না দেওয়া পর্যন্ত ওই বিল্ডিং আপনি করতে পারবেন না... রাজউক এর নকশা অনুযায়ী যদি করতে যান, বসুন্ধরা যদি এসে দেখে যে নকশায় বসুন্ধরার অনুমোদন নাই, সে বিল্ডিং ভেঙ্গে দিবে...এখানে অনেক বিল্ডিং আছে যেখানে রাজউকের নকশা নাই... কিন্তু বসুন্ধরার নকশায় বিল্ডিং করে ফেলেছে...।"
>
> *– একজন সাংবাদিক*

এই সমান্তরাল শাসনব্যবস্থার একটি ভয়াবহ রূপ ফুটে ওঠে ভবনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে। নিয়ম অনুযায়ী রাজউকের নকশা চূড়ান্ত হলেও একটি বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রকল্পের ভেতরে নিজস্ব অনুমোদন রাজউকের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়। ওপরের উদাহরণ থেকে সংশ্লিষ্ট বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানির আইন প্রতিপালনের ঘাটতি, কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রক সংস্থার অকার্যকরতা,

---

[৯২] *বিডিনিউজ টুয়েন্টি ফোরডটকম*, 'Kaler Kantho editor, publisher sued: A Dhaka court has summoned the editor and publisher of daily 'Kaler Kantho' in a defamation case,' ২৮ অক্টোবর ২০১০, https://bdnews24.com/bangladesh/kaler-kantho-editor-publisher-sued (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[৯৩] *প্রথম আলো*, 'কেরানীগঞ্জে রাজউকের অভিযানে ভূমিদস্যুদের হামলা, দুই সাংবাদিকসহ আহত ৩,' ২২ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/yzjktysspr (১০ অক্টোবর ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'রাজউকের অভিযানে হামলা, দুই আবাসন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা,' ০৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/n658y8jndl (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

রাজনৈতিক সমর্থন ও নিজস্ব বাহিনী ব্যবহার করে আধিপত্য বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন নয়, বরং কোম্পানির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত আইন হিসেবে কাজ করে। এই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে কোম্পানিগুলো নিচের কৌশলগুলো ব্যবহার করে:

- **প্রতিদ্বন্দ্বী দমন:** রাজনৈতিক সমর্থন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষমতা ব্যবহার করে ছোট বা উদীয়মান প্রতিদ্বন্দ্বী ডেভেলপারদের ওপর চাপ সৃষ্টি, আক্রমণ, প্রকল্প দখল কিংবা ভুয়া খবর ছড়িয়ে তাদের ব্যবসায়িক সুনাম ও গ্রাহক হ্রাস করা হয়।
- **একক নিয়ন্ত্রণ ও চাঁদাবাজি:** নির্দিষ্ট বৃহৎ এলাকায় নিজেদের একক আধিপত্য বজায় রাখা হয়। সেখানে অন্য কোনো কোম্পানিকে ব্যবসা করতে বাধা দেওয়া হয়, অথবা ব্যবসা করার অনুমতি দিলেও মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করা হয়।
- **ভীতি সঞ্চার:** টাকার বিনিময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রকল্পের ভেতরে অস্ত্রসহ আনসার বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ক্যাম্প বসিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও সাধারণ মানুষের মনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়।
- **রাজনৈতিক বিনিয়োগ:** বড় কোম্পানিগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নির্বাচনী কাজে বিপুল অর্থায়ন করে থাকে, যা পরবর্তীতে তাদের অনিয়ম ও ভূমি দখলকে দায়মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়।

সার্বিকভাবে, রিয়েল এস্টেট খাতে যে "সমান্তরাল ক্ষমতা কাঠামো" গড়ে উঠেছে, তা আবাসন খাতে বাজারের ন্যায্যতা, সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা এবং সুশাসনের জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে।

৫.১০ রাজনৈতিক প্রভাব, পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যবসায়িক স্বার্থের যোগসূত্র

বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতের বিকাশের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও অননুমোদিত আবাসন কাঠামোর সুরক্ষায় রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থের যোগসূত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকের রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা করাই যথেষ্ট নয়, বরং রাজনৈতিক অর্থায়ন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার, নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ, সরকারি জমির ব্যবহার এবং অননুমোদিত প্রকল্পের বৈধতা অর্জনের প্রক্রিয়াও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে অভিযোগ, নথিভুক্ত ঘটনা, প্রশাসনিক তদন্তের ফলাফল এবং আদালতে প্রমাণিত বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে বেসরকারি আবাসন খাতে রাজনৈতিক প্রভাব, পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যবসায়িক স্বার্থের যোগসূত্রকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর আলোকে বিশ্লেষণ করা যায়।

- **রাজনৈতিক অর্থায়ন ও ব্যবসায়িক পৃষ্ঠপোষকতার পারস্পরিক সুবিধাবাদী চক্র:** রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো নিয়মিত রাজনৈতিক অর্থায়ন, নির্বাচনকালীন চাঁদা এবং লজিস্টিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব তৈরি করে। এর বিনিময়ে কোম্পানিগুলো রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অনৈতিক সুবিধা অর্জন, আইনের শিথিল প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক ব্যবসায়িক সুরক্ষা আদায় করে নেয়। রাজনৈতিক দলগুলো রিয়েল এস্টেট খাতসহ ব্যবসায়িক স্বার্থগোষ্ঠীর কাছ থেকে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নির্বাচনী ব্যয়ের জন্য অর্থায়ন এবং অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতা তৈরি হয়, যা রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোকে নীতিগত ও ব্যবসায়িক সুবিধা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে।[৯৪] উদাহরণস্বরূপ, ২০১৩ সালে উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পের একটি অংশের (তৃতীয় পর্যায়) নির্মাণকাজ স্থানীয় কোম্পানি 'সিকদার রিয়েল এস্টেট', দুবাইভিত্তিক 'স্কর্ন' এবং দক্ষিণ কোরিয়ার 'ডঙ্গা'র সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ উদ্যোগকে দেওয়ার জন্য তৎকালীন আবাসন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী রাজউকের তৎকালীন চেয়ারম্যানের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।[৯৫]

  এছাড়া জাতীয় সংসদে রিয়েল এস্টেট ও নির্মাণ খাতের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারি আবাসন খাতের ওপর কঠোর আইন প্রণয়ন বা রাজউকের তদারকি জোরদারে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দেখা যায়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত ১০ জন সংসদ সদস্য আবাসন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বলে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) উল্লেখ করেছে। সংগঠনটি আশা প্রকাশ করেছে, তাঁরা আবাসন খাতের নীতিগত জটিলতা, কর কাঠামো,

[৯৪] *প্রথম আলো* (ইংরেজি), 'Bangladesh political financing and democratic crisis,' ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, https://en.prothomalo.com/amp/story/opinion/op-ed/qv8sdn1rdz (১০ অক্টোবর ২০২৬)।
[৯৫] *দি ডেইলি স্টার*, 'Rajuk boss resigns, retracts a day after,' ১৫ জানুয়ারি ২০১৩, https://www.thedailystar.net/news-detail-265261 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

নগর পরিকল্পনা, ড্যাপ বাস্তবায়ন, ইউটিলিটি সংযোগ ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন। বিষয়টি আবাসন ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং সংশ্লিষ্ট খাতের নীতিনির্ধারণে তাঁদের সম্ভাব্য প্রভাবের গুরুত্ব তুলে ধরে।[৯৬]

- **রাজনৈতিক প্রভাবে অবৈধভাবে (সরকারি) জমি দখল ও আবাসন সম্প্রসারণ:** রাজনৈতিক দলীয় ক্ষমতার দাপট ব্যবহার করে রাজউক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই কৃষিজমি, নদীসংলগ্ন সংবেদনশীল এলাকা এবং সরকারি খাসজমি নামমাত্র মূল্যে বা ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক দখল করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৬ সালে গুলশানে ১১৪ কাঠা ওয়াসার জমিতে আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাব নিয়ে টিআইবি অভিযোগ করে, একটি বেসরকারি হাউজিং কোম্পানির প্রস্তাবের ভিত্তিতে যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির মালিকানাধীন।[৯৭]

  আরেকটি উদাহরণে দেখা যায়, একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে কেরানীগঞ্জে একটি আবাসন প্রকল্পের আওতায় সাধারণ মানুষের শত শত বিঘা কৃষি জমি, খাস জমি এবং বুড়িগঙ্গা-ধলেশ্বরী নদীসংলগ্ন জমি নামমাত্র মূল্যে ও জোরপূর্বক দখল করে প্রকল্প সম্প্রসারণ করেন। তার আবাসন প্রকল্প এবং বাগানবাড়ি প্রসারের জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) সীমানা খুঁটি উপড়ে ফেলে বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর পার এবং সরকারি খাস জমি দখল করার অভিযোগও পাওয়া যায়। এমনকি তিনি স্থানীয় রাজেন্দ্রপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রম ও জমি নিবন্ধন দীর্ঘ ১০ বছর ধরে বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিলেন। সাধারণ ক্রেতারা জমি বিক্রি করতে চাইলে কেবল তাঁর আবাসন প্রকল্পের নামে নামমাত্র মূল্যে হস্তান্তরে বাধ্য করা হতো। সরকারি রেজিস্ট্রি কর্মকর্তারা ক্ষমতার ভয়ে সাধারণ মানুষকে ফিরিয়ে দিতেন। জানা যায়, কোনো মালিক জমি বিক্রি করতে না চাইলে রাজনৈতিক ক্যাডার ও স্থানীয় গুন্ডাবাহিনী দিয়ে জোরপূর্বক জমিতে বালি ভরাট করে ফেলা হতো। এভাবে নামজারি ও জমি মিউটেশন বন্ধ করে দিয়ে ৩ কোটি টাকার জমি মাত্র ৪৬ লক্ষ টাকায় এবং ২ কোটি টাকার সম্পত্তি পানির দামে লিখে নিতে বাধ্য করা হতো। সরকার পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়া সরে গেলে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ নিজেদের জমিতে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে জমি পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে, যা প্রমাণ করে ব্যবসায়িক সম্পর্কটি কোনো স্বাভাবিক বাজার প্রক্রিয়া ছিল না, বরং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক নিপীড়ননির্ভর ছিল।[৯৮]

  এছাড়া রাজউকের অনুমতির তোয়াক্কা না করে অবৈধভাবে আবাসন প্রকল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকার উত্তরা-হলান, আশকোনা ও আশপাশের এলাকায় একটি আবাসন প্রকল্পে রাজউক ও জেলা প্রশাসনের প্রাথমিক অনুমোদন মাত্র ৪৩ একর জমির জন্য থাকলেও পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন ও পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে প্রকল্পের জমির পরিমাণ ১,১৯৭ একর (প্রায় ৩০ গুণ) পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়।[৯৯]

- **নিয়ন্ত্রক সংস্থার তদারকি ও আইন প্রয়োগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ:** রাজউকের মতো রাষ্ট্রীয় তদারকি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে তাদের স্বাধীন তদারকি ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়। ক্ষমতাসীন দলের বলয়ে থাকা কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা বা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে রাজউক ও অন্যান্য সংস্থাকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেকসময় রাজনৈতিক চাপের মুখে রাজউকের উচ্ছেদ অভিযান বাধাগ্রস্ত হয়।

- **প্রভাবশালী ব্যবসায়িক স্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রভাবের ধারাবাহিকতা:** রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে কোম্পানিগুলোর মালিকানা ও প্রকাশ্য রাজনীতিতে রদবদল ঘটলেও অসাধু প্রভাব খাটিয়ে বিধি-বিধান লঙ্ঘনের ধারা অব্যাহত থাকে। এটি প্রমাণ করে, রিয়েল এস্টেট খাতে দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী 'রাজনৈতিক-ব্যবসায়িক স্বার্থগোষ্ঠী' তৈরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ,

---

[৯৬] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'নব-নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ১০ জন আবাসন ব্যবসায় যুক্ত,' ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-455431 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[৯৭] টিআইবি, 'TIB Calls for Halting WASA Initiative That Could Facilitate Land Grabbing in the Name of Constructing a Residential Building in Gulshan,' প্রেস রিলিজ, ২০ আগস্ট ২০২৬, https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/press-release/7535 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[৯৮] *ডেইলি সান*, 'Land grabbing expanded under Nasrul Hamid in Keraniganj,' ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.daily-sun.com/post/803235 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[৯৯] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'Ashiyan city: Dreams gone, so is money,' ০২ ডিসেম্বর ২০২০, https://www.tbsnews.net/companies/real-estate/ashiyan-city-dreams-gone-so-money-166417 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

ঢাকার খিলক্ষেত ও মাদানী অ্যাভিনিউ এলাকার দুটি আবাসন প্রকল্পকে কেন্দ্র করে রাজউকের নোটিশ, তদন্ত ও আইন প্রয়োগের উদ্যোগের বিষয়ে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এই দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কোম্পানির মালিকানা কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর বদল হলেও পূর্বতন মালিকের প্রভাব এবং রাজনৈতিক আঁতাত অক্ষুণ্ন রয়েছে। এই কোম্পানির বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সরকারি খাস জমি ও বন্যাপ্রবাহ এলাকা (ফ্লাড জোন) দখলের অভিযোগ রয়েছে। রাজউকের কাজ বন্ধের নির্দেশ উপেক্ষা করে সেখানে অবৈধ নির্মাণকাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[১০০]

- **রিয়েল এস্টেট কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্তি:** অননুমোদিত ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পগুলোকে আইনি ও প্রশাসনিক সুরক্ষা দিতে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, দলীয় উচ্চপদস্থ নেতা কিংবা তাঁদের নিকটাত্মীয়দের রিয়েল এস্টেট কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে শেয়ারধারক, পদধারী বা উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে সরকারি সংস্থাগুলো এসব কোম্পানির অনিয়মের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে ভয় পায়।

- **অসাধু প্রভাবের মাধ্যমে অবৈধ প্রকল্পের আইনি বৈধতাকরণ:** সম্পূর্ণ অবৈধভাবে জলাশয়, নদী ও নিচু জমি ভরাট করে গড়ে তোলা আবাসন প্রকল্পগুলোকে প্রাথমিক পর্যায়ে বাধা না দিয়ে পরবর্তীতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রশাসনিক চাপ ব্যবহার করে আইনি অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকার উত্তরা-হলান, আশকোনা ও আশপাশের এলাকায় একটি আবাসন প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অনুমোদন মাত্র ৪৩ একর জমির জন্য থাকলেও পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রভাবে ব্যবহার করে কোনো অনুমোদন ছাড়াই প্রকল্পের জমির পরিমাণ ১,১৯৭ একর (প্রায় ৩০ গুণ) পর্যন্ত সম্প্রসারণের অভিযোগ ওঠে। রাজউক ও পরিবেশ অধিদপ্তর প্রথমে প্রকল্পটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিলেও পরে ২০১২ সালে প্রকল্পটির অনুমোদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়।[১০১]

- **নীতিনির্ধারণী পদ ব্যবহার করে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাধাগ্রস্ত ও খাসজমি আত্মসাৎ:** নীতিনির্ধারণী পর্ষদ বা সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা ব্যবহার করে অসাধু ডেভেলপার সরকারি উন্নয়ন ও আবাসন প্রকল্পের অনুমোদন আটকে রাখেন। পরবর্তীতে কৌশলে পার্শ্ববর্তী সরকারি খাসজমি কিংবা প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের জমি নিজ নিজ বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের সঙ্গে একীভূত করে নেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও রিহ্যাব সভাপতি থাকার সুবাদে রাজউকের 'ঝিলমিল প্রকল্প-২য় পর্যায়'-এর নীতিগত অনুমোদন মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আটকে রাখেন। পরবর্তীতে ঝিলমিল প্রকল্পের শত শত একর সরকারি জমি দখল করে তাঁর নিজস্ব আবাসিক প্রকল্পে একীভূত করে নেন।[১০২]

- **রাজনৈতিক পদ-পদবি অর্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ:** রিয়েল এস্টেট কোম্পানির মালিকেরা কেবল পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সীমাবদ্ধ না থেকে সরাসরি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী পদ-পদবি ও সংসদ সদস্যপদ অর্জন করেন, এবং নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় ও কর্তৃত্বকে আবাসন ব্যবসার একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার, দুর্নীতি ঢাকা এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকার কেরানীগঞ্জে অবস্থিত দেশের অন্যতম বৃহৎ আবাসন প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির মালিকেরা ২০০৯ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। পরবর্তী সময়ে কেরানীগঞ্জের রাজনৈতিক বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সম্প্রসারণে উদ্যোগী হন। একপর্যায়ে কোম্পানিটির একজন মালিক সরাসরি ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং প্রথমে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও পরে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান। পরবর্তীতে তিনি দলীয় মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সময়ে কোম্পানিটির আবাসন কার্যক্রম কেরানীগঞ্জের

---

[১০০] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'How Swadesh Properties ownership changed with Awami League ouster,' ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangladesh/how-swadesh-properties-ownership-changed-awami-league-ouster-1070301 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[১০১] বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, আপিল বিভাগ, দেওয়ানি আপিল নং ৪৫৪-৪৫৫/২০১৭ [রায়]। ২২ নভেম্বর ২০২৩, https://supremecourt.gov.bd/translation/process.php?file=1222718_C_A_No_454_455_of_2017.pdf (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[১০২] *ডেইলি সান*, 'Land grabbing expanded under Nasrul Hamid in Keraniganj,' ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.daily-sun.com/post/803235 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রসারিত হয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কিংবা রাজউকের অনুমোদন ও প্রচলিত বিধিবিধান উপেক্ষা করে কৃষিজমি, জলাশয় ও অন্যান্য জমি বালু দিয়ে ভরাট করে প্লট তৈরি ও বিক্রির অভিযোগ ওঠে।[১০৩]

৫.১১ বেসরকারি আবাসন খাতে দুর্নীতির চূড়ান্ত ভুক্তভোগী গ্রাহক

বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতে গ্রাহক যখন একটি প্লট ক্রয় করেন, তখন দৃশ্যত তিনি কেবল জমির মূল্য পরিশোধ করছেন বলে মনে হলেও পর্দার আড়ালে তাঁকে এক বিশাল দুর্নীতির বোঝা বহন করতে হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো একদিকে যেমন দুর্নীতির ব্যবস্থার অংশ, অন্যদিকে তারাই আবার এই ব্যবস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারকারী। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ভুক্তভোগী সাধারণ গ্রাহক। নিম্নে বিষয়টি ব্যাখা করা হলো:

চিত্র ৫. ৩: বেসরকারি আবাসন খাতে দুর্নীতির ত্রিমাত্রিক বাস্তবতা এবং দুর্নীতির ইকোসিস্টেম চক্র

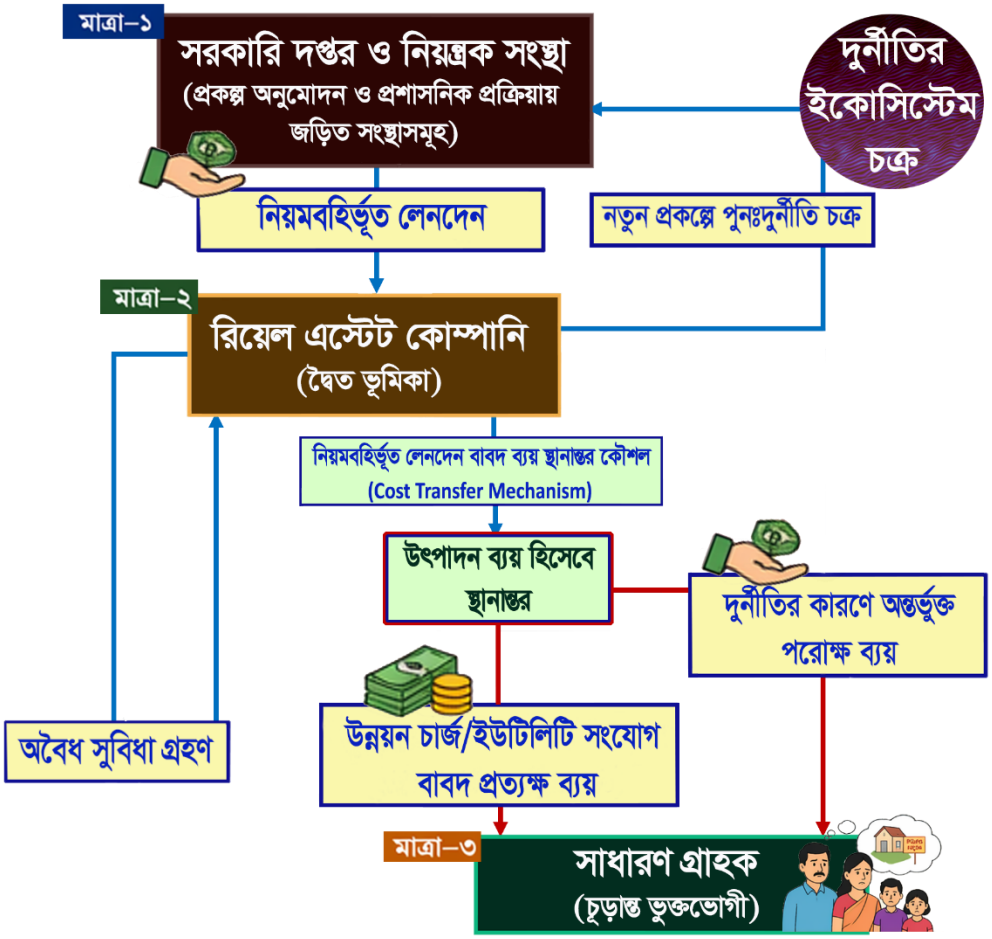

বর্তমান গবেষণায় একটি আবাসন প্রকল্প শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে প্রকল্প অনুমোদন, নকশা পাস, থেকে শুরু করে ইউটিলিটি সংযোগ নেওয়া এবং অন্যান্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে সম্পন্ন করতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের (যেমন "স্পিড মানি", "টেবিল খরচ", "মিটিং খরচ" ইত্যাদি

[১০৩] *দৈনিক কালবেলা*, 'কেরানীগঞ্জের দুঃখ মধুসিটি,' ১৫ অক্টোবর ২০২৩, https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/firstpage/31097 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

নামে) বাধ্যবাধকতা লক্ষ করা যায়। বর্তমান গবেষণার তথ্যানুযায়ী, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে একটি বেসরকারি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় একরপ্রতি সামগ্রিক নিয়মবহির্ভূত ব্যয়ের গড় পরিমাণ দাঁড়ায় সর্বনিম্ন ১৬.৫০ লক্ষ থেকে ৩৭.৫০ লক্ষ টাকা।

সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও ছাড়পত্র দ্রুত পেতে কিংবা অবৈধ সুযোগ-সুবিধা অর্জনে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো নিয়মবহির্ভূত লেনদেনকে (স্পিড মানি বা টেবিল খরচ) একটি কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। আর এই হাতিয়ার ব্যবহার করে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো মূলত তিন ধরনের কৌশলগত সুবিধা আদায় করে থাকে (সারণি ৫.৭)।

সারণি ৫. ৭: নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর অর্জিত কৌশলগত সুবিধা

ক্রম	অর্জিত কৌশলগত সুবিধা		অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
	সুবিধার শ্রেণি	সুবিধার ধরন	
০১	**প্রশাসনিক সুবিধা অর্জন**	**প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত ও সিদ্ধান্তে অনৈতিক সুবিধা অর্জন**	• ভূমি ব্যবহার ও প্রকল্পের নকশা অনুমোদন এবং ছাড়পত্র প্রাপ্তিতে অনৈতিক সুবিধা অর্জন। • পরিবেশগত ছাড়পত্র ও অন্যান্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা। • নিয়ম ও শর্ত শিথিল করানো। • নীতি প্রণয়ন ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করা।
০২	**নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি এড়ানো**	**নিয়মবহির্ভূত কার্যক্রমের দায় এড়ানো ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা প্রভাবিত করা**	• অনিয়ম সত্ত্বেও প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। • নিয়ন্ত্রক তদারকি ও আইন প্রয়োগ প্রভাবিত করা বা এড়িয়ে চলা। • সম্ভাব্য আর্থিক দায়, যেমন জরিমানা ও আইনগত দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাওয়া বা তা এড়িয়ে চলা। • অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ বিলম্বিত বা প্রভাবিত করা। • আইনি বিরোধ এড়ানো। • অবৈধ প্রকল্পের আইনি বৈধতাকরণ।
০৩	**বাণিজ্যিক সুবিধা ও প্রকল্প সম্প্রসারণ**	**প্রকল্প সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিক সুবিধা অর্জন**	• প্রকল্পের পরিধি বা বাণিজ্যিক সুবিধা বৃদ্ধি করা। • অনুমোদন ছাড়াই বিজ্ঞাপন প্রচার ও প্লট বিক্রির সুবিধা নেওয়া। • প্রকল্প এলাকার মধ্যে খাসজমি ও সরকারি ভূমি একীভূত করা। • অনুমোদিত শর্তের বাইরে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের সুযোগ নেওয়া।

অর্থাৎ এই নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন প্রক্রিয়া কেবল একটি সাধারণ প্রশাসনিক দুর্নীতি নয়, বরং এটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর একটি 'কৌশলগত বিনিয়োগ' (Strategic Investment)। এর মাধ্যমে কোম্পানিগুলো কয়েকগুণ বেশি অবৈধ মুনাফা অর্জন করে এবং এই দুর্নীতির সম্পূর্ণ ব্যয় পরবর্তীতে সুকৌশলে গ্রাহকের ওপর স্থানান্তর করে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেসরকারি আবাসন খাতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো প্রধানত দুইভাবে দুর্নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

- **প্রথমত, নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের মাধ্যমে অনৈতিক সুবিধা অর্জন ও দুর্নীতির সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন।** সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের প্রেক্ষাপটে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোকে প্রাথমিকভাবে এমন একটি পক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে 'দুর্নীতির শিকার' হয়। তবে এসব লেনদেনের মাধ্যমে যখন তারা প্রশাসনিক সুবিধা অর্জন, নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি এড়ানো, বাণিজ্যিক সুবিধা ও প্রকল্প সম্প্রসারণের মতো কৌশলগত আদায় করে আর্থিক মুনাফা অর্জন করে, তখন তারা আর কেবল দুর্নীতির শিকার থাকে না। বরং তারা দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থার 'সক্রিয় সহায়ক' ও 'সুবিধাভোগী অংশীদার' হিসেবে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ, এ খাতে বাধ্যতামূলক ও কৌশলগত দুর্নীতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে একটি 'পারস্পরিক স্বার্থনির্ভর একটি ব্যবস্থা', যেখানে কোম্পানিগুলো একই সঙ্গে দুর্নীতির প্রত্যক্ষ সহায়ক এবং সুবিধাভোগী অংশীদার।

- **দ্বিতীয়ত, নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের ব্যয় গ্রাহকের ওপর স্থানান্তর।** কোম্পানিগুলো নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের আর্থিক দায় নিজেরা বহন না করে তা প্রকল্পের 'উৎপাদন বা পরিচালনা ব্যয়' হিসেবে গণ্য করে, যা সরাসরি মূল প্লটের দামের সঙ্গে এবং বিভিন্ন হস্তান্তর খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে গ্রাহকের ওপর স্থানান্তর করে বা চাপিয়ে দেয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উন্নয়ন ফি, ইউটিলিটি চার্জ কিংবা প্রশাসনিক ব্যয়ের নামে প্লটের মূল মূল্যের অতিরিক্ত কাঠাপ্রতি প্রায় ১৪.৫০ লক্ষ টাকা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও

বেশি অর্থ আদায় করা হয়। এর মাধ্যমে কোম্পানিগুলো কেবল দুর্নীতির ব্যয় গ্রাহকের ওপর স্থানান্তরই করে না, বরং দুর্নীতির চক্রকে টিকিয়ে রাখা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো দুর্নীতির ইকোসিস্টেমের নিছক কোনো নিষ্ক্রিয় পক্ষ বা অংশ নয়, বরং একাধারে এর সক্রিয় ধারক ও বাহক[১০৪] এবং সর্বোপরি এর এক অবিচ্ছেদ্য 'অংশ' বা 'কারিগর'[১০৫] হিসেবে আবির্ভূত হয়।

রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর দ্বিমুখী ভূমিকার কারণে সরকারি সংস্থায় প্রদত্ত অনানুষ্ঠানিক লেনদেনের ব্যয় সুকৌশলে 'উৎপাদন ব্যয়' হিসেবে ফ্ল্যাট বা প্লটের চূড়ান্ত দাম ও হস্তান্তরণ খরচে যুক্ত হওয়ায়, গ্রাহকদের মূল দামের পাশাপাশি নানাবিধ অতিরিক্ত ও পরোক্ষ আর্থিক বোঝা বহন করতে হয়। এই দুই ধরনের ব্যয় – (ক) গ্রাহকের ওপর প্রত্যক্ষ অতিরিক্ত চার্জ এবং (খ) রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নিয়মবহির্ভূত লেনদেনের পরোক্ষ প্রভাব – শেষ পর্যন্ত 'উৎপাদন বা পরিচালনা ব্যয়' হিসেবে একীভূত ও স্থানান্তর হয়ে সরাসরি মূল প্লটের দামের সঙ্গে এবং বিভিন্ন হস্তান্তরণ খরচের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, যা গ্রাহকের উপর প্রত্যক্ষ[১০৬] ও পরোক্ষ[১০৭] অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ সৃষ্টি করে। এভাবে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, মধ্যস্বত্বভোগী এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা – এই চক্রের মধ্যকার নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন বা সংঘটিত আর্থিক অনিয়মের চূড়ান্ত ভুক্তভোগীতে পরিণত হয় সাধারণ গ্রাহকগণ।

৫.১২ বেসরকারি আবাসন খাতে "মাফিয়াতন্ত্র"

বেসরকারি আবাসন খাতে সাধারণত সরকার, রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানির মধ্যে একটি পারস্পরিক স্বার্থনির্ভর সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অর্থনৈতিক স্বার্থ, রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রভাব এবং সরকারি সংস্থার নীতিগত অনুমোদন একত্রে কাজ করে একটি অবকাঠামো প্রকল্পকে নির্দিষ্ট আবাসন প্রকল্পের চাহিদা বৃদ্ধি এবং জমির মূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়ানোর লক্ষ্যে জনস্বার্থের পরিবর্তে গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ওপর প্রভাব, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক প্রভাব একত্রিত হয়ে নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াকে বিকৃত করে সীমিত প্রকল্পকে অবৈধভাবে সম্প্রসারিত করে এবং রাষ্ট্রীয় ও প্রাকৃতিক সম্পদ দখলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে কার্যত অকার্যকর করে দিতে পারে।

কেস স্টাডি ১: একটি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজনৈতিক প্রভাব

ঢাকার জোয়ারসাহারা ও কাঁঠালদিয়া মৌজায় দেশের একটি বৃহৎ ও প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ফ্ল্যাগশিপ আবাসিক প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৮ সালে। প্রথমে প্রায় ৩০৫ একর জমির অনুমোদন নিয়ে শুরু হলেও পরবর্তী প্রায় দুই দশকে বিভিন্ন অনিয়ম ও প্রভাবের মাধ্যমে প্রকল্পটি অনুমোদিত সীমা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে প্রায় ৭,০০০ একর জমিতে সম্প্রসারিত হয়, যার বড় একটি অংশ ছিল সরকারি খাস জমি,[১০৮] নদী-নালা, খাল ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি। ২০১২ সালে প্রকল্পটির একটি বড় অংশ, প্রায় ৪,৩০২ বিঘা (প্রায় ১,৪৩৪ একর) জমি শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন দেওয়া হলেও ড্যাপ ও ডিএমডিপির নির্দেশনা – বিশেষত বন্যাপ্রবাহ অঞ্চল ও সংরক্ষিত জলাধার রক্ষার বিষয় – উপেক্ষা করা হয় এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত শর্ত, যেমন শতভাগ জমির মালিকানা নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশগত বাধ্যবাধকতা, বাস্তবে পূরণ করেনি। বরং উক্ত কোম্পানির পক্ষ থেকে বায়না, আমমোক্তার নামা ইত্যাদি আইনত অগ্রহণযোগ্য কাগজপত্রের মাধ্যমে মালিকানা দেখানোর চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের ড্যাপ রিভিউ প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটানো, কার্যবিবরণীতে জালিয়াতি এবং অবৈধ লেনদেনের অভিযোগের মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্লক অনুমোদনের চেষ্টা করা হয়। এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পের প্রস্তাব পর্যালোচনা করা হলেও অধিকাংশ প্রকল্প জলাভূমি বা বন্যা

[১০৪] কোম্পানিগুলো 'ধারক' হিসেবে এই দুর্নীতিকে লালন করছে এবং 'বাহক' হিসেবে একে এক প্রকল্প থেকে অন্য প্রকল্পে বা এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

[১০৫] 'কারিগর' হিসেবে কোম্পানির উপস্থিতি নির্দেশ করে যে, এই দুর্নীতির কাঠামোটি কোম্পানিগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব হতো না–অর্থাৎ তারা নিজেরাই এই সিস্টেমের নকশাকার বা কারিগর।

[১০৬] উন্নয়ন ফি, ইউটিলিটি চার্জ, অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয়, সমন্বয় ফি, ট্রান্সফার ফি ইত্যাদি বাবদ গ্রাহকের ওপর প্রত্যক্ষ অতিরিক্ত ব্যয়।

[১০৭] প্রকল্প অনুমোদন, নকশা পাস, পরিবেশ ছাড়পত্র, ইউটিলিটি সংযোগ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে বিভিন্ন সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন বাবদ ব্যয়।

[১০৮] এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রায় ৮০০ একর সরকারি জমি এবং ২১৬ একর ভাওয়াল এস্টেটের জমি দখল করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।

প্রবাহ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বাতিল করা হয়। কিন্তু একই ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও উক্ত প্রকল্পকে বিশেষ প্রভাবে অনুমোদনের দিকে এগিয়ে নেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, এই পর্যায়ে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকার অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে মন্ত্রী, সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করা হয়। সভায় মূলত প্রকল্পটির 'ই' থেকে 'কে' ব্লক পর্যন্ত অনুমোদনের কথা থাকলেও পরবর্তীতে কার্যবিবরণীতে জালিয়াতির মাধ্যমে 'এল' থেকে 'পি' ব্লক পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একইসাথে অবকাঠামোগত পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে জলাধার সংকুচিত করা এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার যথাযথ মূল্যায়ন ছাড়াই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।[১০৯] তদুপরি, পানি নিষ্কাশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য বুয়েট, ওয়াসা ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতামত নেওয়ার শর্ত থাকলেও তা উপেক্ষা করা হয়। এরপর মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বিশেষ করে পূর্ত মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফাইল প্রক্রিয়াকরণেও তদবির, গোপন বৈঠক ও আর্থিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ ওঠে, যার মধ্য দিয়ে প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। শেষ পর্যন্ত অভিযোগ রয়েছে যে, বড় অংকের সুবিধা গ্রহণের পর ভূমিমন্ত্রীও প্রকল্পটির অনুমোদন দেন। এই অনুমোদনের ফলে সংশ্লিষ্ট রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান প্রায় ৮৬ হাজার কাঠা জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, যার প্রতি কাঠার মূল্য ৫০ লক্ষ থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত। ফলে মোট সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৫০,০০০ কোটি থেকে ৮৬,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সরকারি সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যক্তিখাতে স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।[১১০]

এই দুইটি কেস স্টাডি থেকে দেখা যায়, কীভাবে অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের সমন্বয়ে প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো প্রথমে ভূমি ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, এরপর নীতি ও অবকাঠামোকে নিজেদের অনুকূলে রূপান্তরিত করে এবং শেষপর্যন্ত বিপুল অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জন করে। ফলে জনস্বার্থ, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং সুশাসনের মৌলিক নীতিমালা উপেক্ষিত হয়। বেসরকারি আবাসন খাতে মাফিয়াতন্ত্র কেবল জমি দখল বা দুর্নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি সমন্বিত ক্ষমতার কাঠামো, যেখানে অর্থনৈতিক শক্তি (রিয়েল এস্টেট কোম্পানি), রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ একত্রে কাজ করে জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত/ গোষ্ঠীগত লাভ করে।

চিত্র ৫. ৪: বেসরকারি আবাসন খাতে 'মাফিয়াতন্ত্র'



[১০৯] ড্যাপ অনুযায়ী কুড়িল-পূর্বাচল সড়কের দুই পাশে ১০০ ফুট করে জলাধার রাখার কথা থাকলেও তা পরিবর্তন করে এক পাশে সীমাবদ্ধ করা হয় এবং কোথাও কোথাও তা ৫০ ফুটে নামিয়ে আনা হয়।

[১১০] *শীর্ষ নিউজ*, 'বসুন্ধরার নজিরবিহীন দুর্নীতি ও জালিয়াতি মন্ত্রী-সচিবদের হাজার কোটি টাকার ঘুষ কেলেংকারি,' ২৬ অক্টোবর ২০১৩, https://chairmanbd.blogspot.com/2013/10/blog-post_26.html (০২ আগস্ট ২০২৫); *শীর্ষ নিউজ*, 'বসুন্ধরার হাজার কোটি টাকার লেনদেনে অবশেষে ভূমিমন্ত্রীও ম্যানেজ,' ২৭ অক্টোবর ২০১৩, https://chairmanbd.blogspot.com/2013/10/blog-post_27.html (০২ আগস্ট ২০২৫)।

বেসরকারি আবাসন খাতে সরকার, বৃহৎ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এবং রাজনীতি – এই তিনটি প্রধান শক্তির পারস্পরিক গভীর আন্তঃসম্পর্ক ও প্রভাবের সমন্বয়ে একটি প্রভাবশালী ক্ষমতার বলয় গড়ে উঠেছে, যা খাতটির কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিনটি পক্ষের পদ্ধতিগত দুর্নীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বেসরকারি আবাসন খাতে একটি জটিল ক্ষমতা কাঠামো সৃষ্টি হয়েছে, যা সম্মিলিতভাবে খাতটিতে প্রভাব বিস্তার করছে এবং ধীরে ধীরে একটি প্রাতিষ্ঠানিক "মাফিয়াতন্ত্র"-এর রূপ নিয়েছে। এই সমন্বিত ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি ও কার্যপ্রণালী একটি ত্রিভুজাকার মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে (চিত্র ৫.৪)।

"বেসরকারি আবাসন খাতে মাফিয়াতন্ত্র" মূলত তিনটি পরাশক্তি – রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, সরকার (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা) এবং রাজনৈতিক শক্তি (দল ও রাজনীতিবিদ) – এদের মধ্যকার অসাধু আঁতাত ও পারস্পরিক স্বার্থসংরক্ষণের একটি চক্রাকার যোগসূত্রকে প্রতিফলিত করে। এই ত্রিভুজাকার কাঠামোটিতে প্রতিটি পক্ষই নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় অপর দুই পক্ষকে সুবিধা প্রদান করে এবং বিনিময়ে অনৈতিক সুযোগ আদায় করে, যা শেষ পর্যন্ত একটি অবিচ্ছেদ্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির রূপ ধারণ করে।

ত্রিভুজের প্রথম বাহুতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নির্দেশে করে যে, কোম্পানিগুলো নকশা অনুমোদন, ড্যাপ বা পরিবেশগত নিয়ম লঙ্ঘনের মতো অনিয়ম এড়িয়ে যেতে প্রশাসনকে ঘুষ, কমিশন কিংবা প্লট/ফ্ল্যাটের মতো বস্তুগত সুবিধা প্রদান করে। বিনিময়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো তাদের আইন প্রয়োগ ও নজরদারি শিথিল করে অনৈতিকভাবে ছাড়পত্র প্রদান করে, যার ফলে কোম্পানিগুলো অবৈধ প্রকল্প নির্বিঘ্নে পরিচালনা করার প্রশাসনিক সুবিধা পায়।

ত্রিভুজের দ্বিতীয় বাহুতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ও রাজনৈতিক শক্তির মধ্যকার পারস্পরিক স্বার্থের লেনদেন প্রতিফলিত হয়েছে। কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক দল ও নেতাদের বিপুল পরিমাণ রাজনৈতিক চাঁদা, লভ্যাংশ, নির্বাচনী অর্থায়ন এবং ব্যবসায়িক শেয়ার সরবরাহ করে। এর প্রতিদানে রাজনৈতিক শক্তি কোম্পানিগুলোকে পেশীশক্তি, স্থানীয় ভূমি দখলের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ এবং আইনি তদারকি থেকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক আইনি সুরক্ষা প্রদান করে।

ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুতে প্রশাসন ও রাজনৈতিক শক্তির আঁতাত দেখানো হয়েছে। রাজনৈতিক শক্তি নিজেদের প্রভাব ব্যবহার করে প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদ-সুরক্ষা নিশ্চিত করে, আর বিনিময়ে প্রশাসন রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশে নীতি পরিবর্তন, আইন পরিপালনে কৃত্রিম শিথিলতা ও পক্ষপাতদুষ্ট প্রকল্পের অনুমোদন দেয়।

সার্বিকভাবে, এই চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, ত্রিভুজের প্রতিটি বাহু একে অপরের ওপর নির্ভরশীল – এই তিনটি শক্তি আলাদা নয়, বরং তারা একে অপরের সাথে যুক্ত একটি স্বার্থনির্ভর সম্পর্কজালে আবদ্ধ। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতিতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, সরকার (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ), এবং রাজনৈতিক শক্তি (রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদ) – এই তিন পক্ষের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য একসাথে মিলে মাফিয়া-ধরনের সমন্বিত অভেদ্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামোতে রূপ নিয়েছে, যেখানে আইন, বাজার ও রাজনীতি একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। ফলে জমি অধিগ্রহণ থেকে অনুমোদন, নকশা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন এবং ব্যাংকিং ও অর্থায়ন থেকে বাজারজাতকরণ – সবকিছুই একধরনের সমন্বিত প্রভাবচক্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এভাবে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক শক্তি ও সরকারি সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসাজশের মাধ্যমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম-দুর্নীতির নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে বেসরকারি আবাসন খাতের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দখল করেছে। এই বহুমাত্রিক সমন্বিত ক্ষমতাকাঠামোর মাধ্যমে এ খাতে একটি সুসংগঠিত "মাফিয়াতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যার মূল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, তারপর সরকার বা প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং রাজনৈতিক শক্তি (রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদ)। এই তিন পক্ষের সুবিধাবাদী সমঝোতার ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ দখল হয় এবং বেসরকারি আবাসন খাতে অনিয়ম-দুর্নীতি সচল থাকে। আর শেষ পর্যন্ত এই পুরো অনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ আর্থিক ক্ষতি ও শোষণের শিকার হতে হয় অসহায় সাধারণ গ্রাহকদের।

৫.১৩ আবাসন খাতে প্রভাব বিস্তার, নিয়ন্ত্রণ এবং 'স্টেট ক্যাপচার'

৫.১৩.১ ড্যাপ সংশোধনে আবাসন ব্যবসায়ীদের প্রভাব

২০১০-২০১৮ সময়ে ড্যাপ বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ১৫৮ বার সংশোধন করা হয় এবং এসব পরিবর্তনের মাধ্যমে আবাসন ব্যবসায়ী, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী সুবিধা পেয়েছে – এমন অভিযোগ উঠে আসে। এসব সংশোধনের

মধ্যে ৩৪টি জলাশয় ভরাটের অনুমতি, ১৪টি বন্যাপ্রবাহ অঞ্চল ভরাটের অনুমতি, ২০টি কৃষিজমি ও গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিন্যাস বাতিল এবং ১৩টি ওভারলে জোনের ভূমি ব্যবহারের শ্রেণি পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।[১১১] পার্ক, খেলার মাঠ এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক অবকাঠামোর সংস্থান সংকুচিত করে উন্মুক্ত স্থান ও জলাশয় ভরাট করে ভবনের উচ্চতা ও ঘনত্ব বৃদ্ধির এই প্রবণতা স্পষ্ট করে যে, ডেভেলপারদের স্বার্থরক্ষা এবং নীতিগত পরিবর্তনের পেছনে বাণিজ্যিক লোভ, রাজনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থার নমনীয় অবস্থানের একটি গভীর ও অনৈতিক যোগসূত্র বিদ্যমান।

কেস স্টাডি ২: ড্যাপ সংশোধন

২০২২ সালে ড্যাপ অনুমোদনের পর থেকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে অন্তত চারবার দাপ্তরিক পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে দুই দফা (সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং ডিসেম্বর ২০২৫) গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।[১১২] এই চারবার দাপ্তরিক উদ্যোগের মধ্যে ২০২২ সালের আগস্টে ড্যাপ কার্যকরের অল্প সময়ের মধ্যেই আবাসন খাতের স্থবিরতা নিরসনের অজুহাতে রিহ্যাবসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের চাপের মুখে রাজউক প্রথম পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাজউক, রিহ্যাব এবং বিআইপির মধ্যে একাধিক কারিগরি বৈঠকের মাধ্যমে 'ফ্লোর এরিয়া রেশিও (এফএআর)' বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়, যা সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর সংশোধনী গেজেটে প্রতিফলিত হয়। এতে এফএআর বৃদ্ধি, সড়ক প্রশস্ততার শর্ত শিথিলকরণ এবং জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণের মানদণ্ডে সমন্বয় আনার মাধ্যমে বাস্তবে উন্নয়ন ঘনত্ব বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।[১১৩] পরবর্তীতে ২০২৪ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এবং 'ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০২৫'-এর সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ড্যাপ রিভিউ কমিটি দ্বিতীয় দফায় বড় ধরনের সংশোধন আনে, যা ডিসেম্বর ২০২৫-এ গেজেটভুক্ত হয়। এই সংশোধনীতে ভবনের উচ্চতা বৃদ্ধি, এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব পুনর্বিন্যাস এবং নির্মাণ সূচকসমূহ পুনর্নির্ধারণ করা হয়।[১১৪]

পরবর্তীতে ২০২২ সালে নতুন ড্যাপ (২০২২-২০৩৫) গেজেট আকারে প্রকাশিত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই আবাসন ব্যবসায়ীদের প্রবল দাবির প্রেক্ষাপটে এটি পরিবর্তনের জন্য একাধিক দাপ্তরিক উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং এর মধ্যে বড় ধরনের সংশোধনী গেজেট প্রকাশিত হয়।[১১৫] এই সংশোধনীতে কোনো রকম সুসংহত কারিগরি সুপারিশ ছাড়াই মূলত বাণিজ্যিক স্বার্থে ভবনের উচ্চতা ও এফএআর বৃদ্ধি করা হয় এবং সংরক্ষিত জলাভূমি ও বন্যাপ্রবাহ অঞ্চলকে আবাসন উপযোগী এলাকায় রূপান্তর করার পথ উন্মুক্ত করা হয়।

এর ধারাবাহিকতায় উচ্চতা, এফএআর বৃদ্ধি এবং জোনিং শিথিলের জোরালো দাবিতে রিহ্যাব, রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো এবং ল্যান্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন রাজউক ঘেরাও ও নানা ধরনের আলটিমেটামসহ বিভিন্ন কঠোর কর্মসূচি চালিয়ে রাজউকের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

---

[১১১] টিআইবি, 'RAJUK mired in corruption, finds study: TIB urges to form a separate influence-free regulatory authority to ensure good governance,' ২৯ জানুয়ারি ২০২০, https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/story/6034 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[১১২] *দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'DAP amended with increased floor area ratio,' ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, https://thefinancialexpress.com.bd/national/dap-amended-with-increased-floor-area-ratio (২০ এপ্রিল ২০২৬); *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'DAP amended approved, building height limits raised,' ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, https://www.tbsnews.net/bangladesh/dap-amendment-approved-building-height-limits-raised-1264561 (২০ এপ্রিল ২০২৬); *বাংলা ট্রিবিউন*, 'রাজউকের 'ড্যাপ' বাতিল নাকি সংশোধন,' ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/others/864133/রাজউকের-'ড্যাপ'-বাতিল-নাকি-সংশোধন (২০ এপ্রিল ২০২৬); *বণিক বার্তা*, 'ড্যাপ সংশোধন করে ভবনের উচ্চতা বাড়ানোর কথা ভাবছে রাজউক,' ৪ জানুয়ারি ২০২৩, https://www.bonikbarta.com/home/news_description/325926/www.isu.ac.bd (২০ এপ্রিল ২০২৬); *দেশকাল নিউজ*, 'DAP revision doubles floor units across Dhaka,' ২৩ অক্টোবর ২০২৫, https://www.deshkalnews.com/news/7764 (২০ এপ্রিল ২০২৬)।

[১১৩] রাজউক, *ড্যাপ সংক্রান্ত গেজেট (২৪-০৯-২০২৩)*, https://rajuk.gov.bd/pages/notices/6922f4b8dbfbab28ce0e42d7 (২০ এপ্রিল ২০২৬)।

[১১৪] রাজউক, *ড্যাপ ২০২২-২০৩৫ সংশোধনী গেজেট (১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫)*, https://ecps.gov.bd/wp-content/uploads/2026/02/Bidhimala-2025-and-DAP-2022-2035.pdf (০২ আগস্ট ২০২৫); রাজউক, *প্রজ্ঞাপন (ড্যাপ সংক্রান্ত)*, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, https://rajuk.gov.bd/pages/notices/695ba60c35ce18e1c05b0469 (২০ এপ্রিল ২০২৬)।

[১১৫] *দি ডেইলি স্টার*, 'Rajuk caves in to realtors' pressure,' ০৬ অক্টোবর ২০২৩, https://online.thedailystar.net/weekend-read/news/rajuk-caves-realtors-pressure-3436641 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

চাপ অব্যাহত রাখে।[১১৬] এর ফলে ২০২৫ সালের অক্টোবরে রাজউকের ড্যাপ সংক্রান্ত সংশোধনীতে নীতিগত অনুমোদন দিয়ে ভবনের উচ্চতা ও ঘনত্ব দ্বিগুণ করার আইনি সুযোগ তৈরি করা হয়। পরবর্তী সময়ে রাজউকের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের গণমাধ্যমের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, এই নীতিগত পরিবর্তনগুলো মূলত ডেভেলপারদের তীব্র চাপ ও অনুরোধেরই সরাসরি প্রতিফলন ছিল এবং নগর পরিকল্পনাবিদ ও বাসিন্দাদের মতামতের প্রভাব সীমিত ছিল।[১১৭]

এই পরিবর্তনগুলোর পক্ষে আবাসন খাতের প্রতিনিধিরা ভবন নির্মাণের সুযোগ বৃদ্ধি ও আবাসন ব্যবসার গতি সঞ্চারের যুক্তি তুলে ধরলেও নগর পরিকল্পনাবিদ ও পরিবেশবিদদের একাংশ ঘনত্ব বৃদ্ধি, যানজট, অবকাঠামোর ওপর চাপ এবং নগরের বাসযোগ্যতা হ্রাসের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। পরিকল্পনাবিদ ও পরিবেশবিদেরা সংশোধনীর মাধ্যমে এফএআর, আবাসন ইউনিটের অনুপাত, ভবনের উচ্চতা ও জনঘনত্ব বাড়ানোর সমালোচনা করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষজ্ঞ মতামত ও জনস্বার্থ যথাযথভাবে বিবেচিত হয়নি বলে অভিযোগ তোলেন।[১১৮] অংশীজনদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বিআইপির তথ্য অনুযায়ী, রাজউকের ড্যাপ পর্যালোচনা ও সংক্রান্ত বৈঠকগুলোতে প্রায় ৭০% অংশীজনই ছিলেন আবাসন খাতের ব্যবসায়ী বা প্রতিনিধি, যেখানে সাধারণ নগরবাসী, নগর পরিকল্পনাবিদ বা পরিবেশবিদদের প্রতিনিধিত্ব ছিল নগণ্য।[১১৯]

৫.১৩.২ অপ্রদর্শিত অর্থের সুরক্ষায় রিয়েল এস্টেট খাতের নীতিগত প্রভাব বিস্তার

বাংলাদেশের সংবিধানের ২০(২) ধারা অনুযায়ী "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হবেননা"।[১২০] এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'কালো টাকা' বা অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুযোগ সংবিধানের মূল চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক পাশাপাশি বেআইনি এবং অবৈধ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণে রিহ্যাব, বিএলডিএ এবং রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো ধারাবাহিকভাবে নীতিগত দাবি ও প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা চালিয়ে আসছে। রিয়েল এস্টেট খাতের সংগঠন রিহ্যাব ২০২০ সালে সরকারের কাছে বাজেট প্রস্তাব দিয়ে দেশের আবাসন খান ও অর্থনীতির উপকারার্থে উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন না করে অপ্রদর্শিত অর্থ আবাসন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানায়।[১২১] ২০২২ সালে সুবিধাটি বন্ধের প্রস্তাব আসার পরও রিহ্যাব প্রকাশ্যে আগের মতো শর্তহীনভাবে অপ্রদর্শিত অর্থ আবাসন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ বহাল রাখার দাবি জানায়। ২০২৩ সালেও তারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রাক-বাজেট আলোচনায় ৫-১০ বছরের জন্য শর্তহীন সুযোগ চায়।[১২২]

---

[১১৬] *দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'Revive Building Construction Rules 2008,' ২১ মে ২০২৫, https://thefinancialexpress.com.bd/national/revive-building-construction-rules-2008 (১০ অক্টোবর ২০২৬); *বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, 'Protest at RAJUK office demands scrapping of DAP rules,' ২০ মে ২০২৫, https://bdnews24.com/bangladesh/fccb667bc3a3 (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[১১৭] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'DAP amendment approved, building height limits raised,' ১৯ অক্টোবর ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangladesh/dap-amendment-approved-building-height-limits-raised-1264561 (১০ অক্টোবর ২০২৬); *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'DAP revision allows buildings twice as tall, experts fear more strain on liveability,' ২১ অক্টোবর ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangladesh/urbanisation/dap-revision-allows-buildings-twice-tall-experts-fear-more-strain (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[১১৮] *নিউ এজ*, 'Amended DAP blamed for favouring developers,' ০৫ নভেম্বর ২০২৫, https://www.newagebd.net/post/country/281208/amended-dap-blamed-for-favouring-developers (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[১১৯] *নিউ এজ*, 'Planners for no amendment to DAP under realtors' pressure,' ২৮ আগস্ট ২০২৫, https://www.newagebd.net/post/country/274360/planners-for-no-amendment-to-dap-under-realtors-pressure (১০ অক্টোবর ২০২৬)।

[১২০] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৭২; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367.html

[১২১] *দি ডেইলি স্টার*, 'Allow black money in housing: REHAB,' ১০ জুন ২০২০, https://www.thedailystar.net/business/news/allow-black-money-housing-rehab-1912353 (১২ অক্টোবর ২০২৬); *দি ডেইলি স্টার*, 'Realtors welcome budget but want cuts in registration fees,' ১৩ জুন ২০২০, https://www.thedailystar.net/business/news/realtors-welcome-budget-want-cuts-registration-fees-1914089 (১২ অক্টোবর ২০২৬)।

[১২২] *দি ডেইলি স্টার*, 'Continue amnesty for black money in housing,' ১৯ জুন ২০২২, https://www.thedailystar.net/business/economy/news/continue-amnesty-black-money-housing-3050681 (১২ অক্টোবর ২০২৬);

২০২৪ সালের এনবিআরের সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় আবাসন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক ধারায় অর্থের প্রবাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের[১২৩] কার্যক্রম সম্প্রসারণ – এমন যুক্তিতে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই রিহ্যাব ৫-১০ বছরের জন্য এমন সুযোগ দেওয়ার সুযোগ বা সময়সীমার দাবি জানায়।[১২৪] ২০২৪ সালে সংগঠনটি পূর্ববর্তী সুবিধার মাধ্যমে অর্থনীতিতে অর্থ ফেরার দাবিও তুলে ধরে।[১২৫] পরবর্তী সময়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটেও অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুযোগ পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নতুন ব্যবস্থায় নির্ধারিত কর পরিশোধের শর্তে অপ্রদর্শিত অর্থ ও সম্পদ ঘোষণার সুযোগ রাখা হয়েছিল; স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে কর এবং অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে ১৫% করের বিধান প্রস্তাব করা হয়।[১২৬] এ ব্যবস্থা নিয়ে অর্থনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা সমালোচনা করেন। তাঁদের উদ্বেগ ছিল এ ধরনের সুবিধা নিয়মিত করদাতা ও অপ্রদর্শিত সম্পদের মালিকদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করতে পারে এবং কর ফাঁকি ও দুর্নীতি নিরুৎসাহিত করার নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে।[১২৭] ২০২৬ সালের প্রাক-বাজেট আলোচনায় রিহ্যাব আবারও কম করহার এবং অর্থের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন না করে অপ্রদর্শিত অর্থ আবাসন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ পুনর্বহালের দাবি জানায়। এনবিআর ওই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এটি দেখায় যে সুবিধাটি নিয়ে রিহ্যাবের নীতিগত দাবি এককালীন ছিল না; বিভিন্ন সময়ে তা পুনরায় উত্থাপিত হয়েছে।[১২৮]

সামগ্রিকভাবে, অপ্রদর্শিত অর্থের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন না তোলার সুবিধা নিয়ে রিহ্যাবের ধারাবাহিক দাবি বেসরকারি আবাসন খাতে ব্যবসায়িক স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় করনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। দেখা যায়, রিহ্যাব প্রতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘোষণার আগে এনবিআর-এর প্রাক-বাজেট আলোচনা এবং নিজস্ব সংবাদ সম্মেলনে 'বিনাশর্তে' এবং 'উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে' অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকারের ওপর সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক চাপ সৃষ্টি করে আসছে। রিহ্যাব অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুবিধাকে বিনিয়োগ ও আবাসন বাজার চাঙ্গা রাখা, অর্থনীতিতে অর্থের প্রবাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং অর্থ পাচার রোধের একমাত্র উপায় ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট 'ন্যারেটিভ' বা প্রচারণার মাধ্যমে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য প্রকাশ্য জনমত ও নীতি-সমর্থন গড়ে তোলে। তাদের ধারাবাহিক লবিং ও দাবির মুখে ২০২০-২১ ও পরবর্তী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সরকার আয়কর আইনে সুনির্দিষ্ট সুবিধা প্রদান করে, যেখানে এনবিআর বা অন্য কোনো তদন্তকারী সংস্থা বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবে না মর্মে নজিরবিহীন "আইনি উৎস-সুরক্ষা" দিতে বাধ্য হয়। সরকার যখনই অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুবিধা বাতিল

দি ডেইলি স্টার, 'Realtors seek money whitening scope for 10 years,' ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, https://www.thedailystar.net/business/economy/news/realtors-seek-money-whitening-scope-10-years-3260021 (১২ অক্টোবর ২০২৬)।

[১২৩] সংশ্লিষ্ট শিল্প বলতে আবাসন খাতের সঙ্গে জড়িত নির্মাণসামগ্রী, সিমেন্ট, সিরামিকস, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ও পরিবহনসহ বহু সংযুক্ত শিল্পসমূকে বোঝানো হয়েছে।

[১২৪] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'REHAB for unconditional black money investment in housing sector,' ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, https://www.tbsnews.net/nbr/rehab-unconditional-black-money-investment-housing-sector-791146 (১৪ অক্টোবর ২০২৬)।

[১২৫] *দি ডেইলি স্টার*, 'Allow black money in housing: REHAB,' ১০ জুন ২০২০, https://www.thedailystar.net/business/news/allow-black-money-housing-rehab-1912353 (১২ অক্টোবর ২০২৬)।

[১২৬] *দি ডেইলি স্টার*, 'Pay 15% tax to whiten black money,' ৬ জুন ২০২৪, https://www.thedailystar.net/business/bangladesh-national-budget-fy2024-25/news/pay-15-tax-whiten-black-money-3628106 (১৪ অক্টোবর ২০২৬)।

[১২৭] *দি ডেইলি স্টার*, 'Whitening Black Money: 'Unethical, unjust and unacceptable',' ৬ জুন ২০২৪, https://www.thedailystar.net/business/bangladesh-national-budget-fy2024-25/news/whitening-black-money-unethical-unjust-and-unacceptable-3628811 (১৪ অক্টোবর ২০২৬)।

[১২৮] *দি ডেইলি স্টার*, 'Money whitening provision may return,' ২১ মে ২০২৬, https://online.thedailystar.net/business/bangladesh-budget-2026-27/news/money-whitening-provision-may-return-4180691 (১২ অক্টোবর ২০২৬); *দি ডেইলি স্টার*, 'Rehab seeks opportunity to invest undisclosed money in housing without question; NBR says no,' ০৮ এপ্রিল ২০২৬, https://www.tbsnews.net/economy/rehab-seeks-opportunity-invest-undisclosed-money-housing-without-question-nbr-says-no (১২ অক্টোবর ২০২৬); *দি ডেইলি স্টার*, 'National budget approved, money whitening provision dropped,' ২২ জুন ২০২৫, https://online.thedailystar.net/business/bangladesh-budget-2025-26/news/national-budget-approved-money-whitening-provision-dropped (১৪ অক্টোবর ২০২৬); *বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, 'কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল হল,' ২২ জুন ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/budget2025-26/38ac4c0a2043 (১৪ অক্টোবর ২০২৬); *বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, 'Against reform agenda': TIB blasts govt over black money legalisation scheme,' ৩ জুন ২০২৫, https://bdnews24.com/budget2025-26/62645a63145c (১৪ অক্টোবর ২০২৬)।

বা করের হার বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে (যেমন ২০২৫ ও ২০২৬ সালে) তখনই আবাসন ব্যবসা ধসে পড়ার অজুহাত দেখিয়ে তীব্র বিরোধিতা করে রিহ্যাবসহ রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো, এবং পুনরায় 'অনুকূল নীতি বহাল রাখার' জোর দাবি থেকে তাদের একই ধরনের নীতিগত দাবি বিভিন্ন সময়ে পুনরায় উত্থাপনের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয়। মূলত জাতীয় বাজেট প্রস্তাবনায় রিহ্যাবের এই ধারাবাহিক দাবি, উৎস-সুরক্ষার পক্ষে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক লবিং এবং পরবর্তীতে বাজেটে "প্রশ্নহীন আইনি সুরক্ষা" অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঘটনাটি প্রমাণ করে, আবাসন খাতে অপ্রদর্শিত অর্থ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা সরকারের কোনো স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বাধীন নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল না, বরং এটি ছিল রিয়েল এস্টেট খাতের সুসংগঠিত নীতিগত চাপের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল।

৫.১৩.৩ আবাসন খাতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির 'স্টেট ক্যাপচার' প্রক্রিয়া

বেসরকারি আবাসন খাতের সুশাসন নিশ্চিতকল্পে দেশের প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী এর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষায়িত নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের ওপর অর্পিত। তাত্ত্বিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামোর মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের কথা থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বড় ও প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক আধিপত্যের ফলে এই খাতটি বর্তমানে কোন অংশীজন দ্বারা এবং কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তা নিচের চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো।

চিত্র ৫. ৫: আবাসন খাতে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রভাব বিস্তার, নিয়ন্ত্রণ এবং 'স্টেট ক্যাপচার' প্রক্রিয়া

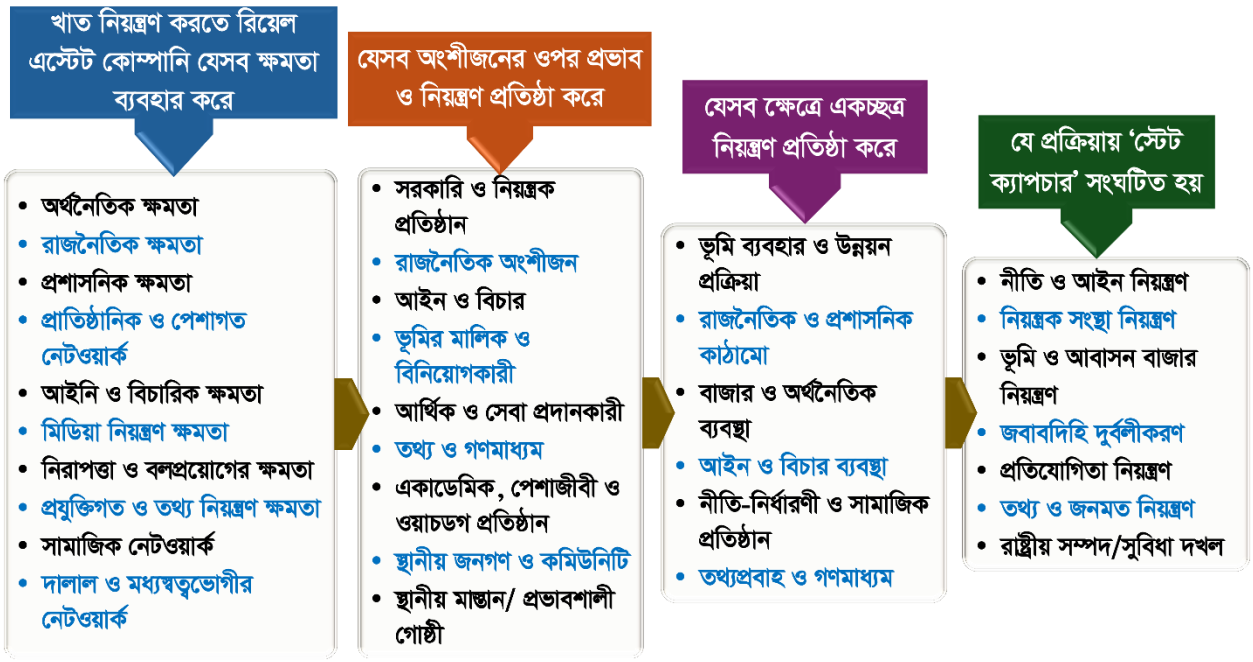

ওপরের চিত্রে বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতে প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বহুমুখী ক্ষমতার প্রয়োগ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পর্যায়ে 'স্টেট ক্যাপচার' বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের একটি ধারাবাহিক ও কাঠামোগত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি প্রধানত চারটি পর্যায়ক্রমিক ধাপের মাধ্যমে কার্যকর হয়।

প্রথম ধাপে, খাতটি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো তাদের ১০ ধরনের সুসংহত এবং বহুমুখী ক্ষমতা কাঠামো ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় ধাপে, এই বহুমুখী ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোম্পানিগুলো রাষ্ট্র ও সমাজের মূল অংশীজনদের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। তারা সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিচার বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ভূমি মালিক ও পেশাজীবীদের পাশাপাশি গণমাধ্যম ও স্থানীয় মাস্তান চক্রকে নিজেদের স্বার্থের অনুগামী করে তোলে।

তৃতীয় ধাপে, অংশীজনদের এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোম্পানিগুলো সামগ্রিক আবাসন খাতের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করে। এর ফলে ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামো, বাজার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইন-বিচার কাঠামো, নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান এবং তথ্যপ্রবাহ সম্পূর্ণভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

পরিশেষে, এই একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ ধাপে ঘটে প্রাতিষ্ঠানিক **'স্টেট ক্যাপচার'**। এই চূড়ান্ত পর্যায়ে কোম্পানিগুলো নীতি ও আইন পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে নিষ্ক্রিয়করণ, বাজার ও প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ, জবাবদিহিতা নস্যাৎ, জনমত নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি খাসজমি ও জলাশয় দখলের মাধ্যমে নিজেদের একচেটিয়া ব্যবসায়িক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক 'স্টেট ক্যাপচার' বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়াটি মূলত সাতটি সুনির্দিষ্ট কৌশলগত উপায়ে রূপ লাভ করে।

১. **নীতি ও আইন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ** (নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা);
২. **নিয়ন্ত্রক সংস্থা নিয়ন্ত্রণ** (রাজউক, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট তদারকি সংস্থাগুলোকে নিষ্ক্রিয় ও প্রভাবিত করার মাধ্যমে আইনি তদারকি ও পরিদর্শন ব্যবস্থা এড়িয়ে চলা);
৩. **ভূমি এবং আবাসন বাজার নিয়ন্ত্রণ** (জমি সংগ্রহ, এর ব্যবহার পরিবর্তন এবং ভূমি ও আবাসন বাজারের সামগ্রিক গতিপ্রকৃতি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ);
৪. **জবাবদিহি ব্যবস্থা দুর্বলীকরণ** (আইনি ফাঁকফোকর, রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে বিচারিক প্রক্রিয়া, সরকারি তদন্ত এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া);
৫. **প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ** (ছোট ও মাঝারি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোকে কোণঠাসা করে বাজারে একচেটিয়া সিন্ডিকেট ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা);
৬. **তথ্য ও জনমত নিয়ন্ত্রণ** (সুকৌশলে কর্পোরেট ভাবমূর্তি রক্ষা করা, গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা দমন, নিজেদের অনুকূলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জনমত গঠন করা এবং বিরুদ্ধ সংবাদ দমন করা);
৭. **রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সুবিধা দখল** (সরকারি খাসজমি, জলাশয় ও নদী দখল করে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা এবং রাষ্ট্রীয় ইউটিলিটি সুবিধা আত্মসাৎ করা)।

বেসরকারি আবাসন খাতের সুশাসনের সংকট প্রশাসনিক অনিয়মের বিষয় নয়; বরং এটি একটি গভীর, সুসংহত ও বহুস্তরীয় ক্ষমতা কাঠামোর সমস্যা। এই কাঠামোর প্রভাবে একদিকে সাধারণ নাগরিক ও ক্রেতারা শোষিত ও প্রান্তিক হয়ে পড়ে, অন্যদিকে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো রাষ্ট্রের সমান্তরালে গিয়ে পুরো খাতটির ওপর দীর্ঘমেয়াদি, কাঠামোগত ও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

৫.১৪ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যায়, বেসরকারি আবাসন খাতে কোনো প্রকল্প পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন শেষ হওয়ার পরও কিভাবে অনিয়ম-দুর্নীতির চর্চা বিদ্যমান থাকে। একটি প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমি নির্বাচন, সংগ্রহ ও অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অপব্যবহার, মৌখিক চুক্তি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ক্যাডার বাহিনী ও মধ্যস্বত্বভোগী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জোরপূর্বক জমি দখল এবং সরকারি খাসজমি, কৃষিজমি ও জলাশয় জবরদখলের মতো গুরুতর অনিয়ম বিদ্যমান। পরবর্তীতে প্রকল্প পরিকল্পনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত ও আইনি শর্ত লঙ্ঘন, ভুয়া অনুমোদনপত্র প্রদর্শন এবং রাজউকের তদারকি এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি সুবিধা উপেক্ষিত হওয়া এবং প্লট বিক্রয় ও গ্রাহক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি ও নানা অতিরিক্ত চার্জের মাধ্যমে ক্রেতাদের ওপর আর্থিক শোষণ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়মের ধারাবাহিকতায় রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো সরকারি দপ্তরে অনানুষ্ঠানিক লেনদেন বা 'স্পিড মানি'কে কৌশলগত বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবহার করে প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা অর্জন করে। পরবর্তীতে এই ব্যয়ের পুরো বোঝা 'উৎপাদন বা পরিচালনা ব্যয়' হিসেবে মূল প্লটের দাম এবং বিভিন্ন হস্তান্তরণ খরচের সঙ্গে যুক্ত করে সাধারণ গ্রাহকদের ওপর স্থানান্তর করা হয়, যার ফলে কোম্পানিগুলো দুর্নীতির কেবল শিকার বা নিষ্ক্রিয় পক্ষ থাকে না, বরং এর সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং সুবিধাভোগী অংশীদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

গবেষণার বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, সংবাদমাধ্যমের কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও ক্ষমতার যোগসূত্রের মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো আবাসন খাতে একধরনের 'মাৎস্যন্যায়' বাস্তবতা ও একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি করেছে। সর্বোপরি, রিয়েল

এস্টেট কোম্পানি, প্রশাসন এবং রাজনৈতিক শক্তির যোগসাজশে সৃষ্ট 'মাফিয়াতন্ত্র' এবং ড্যাপ সংশোধন কিংবা অপ্রদর্শিত অর্থের উৎস-সুরক্ষার মতো নীতিগত পদক্ষেপে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রীয় দখল' (State Capture) সংগঠিত হয়। সার্বিকভাবে, বেসরকারি আবাসন খাতের সুশাসন, বাজার কাঠামো এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি পর্যালোচনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি কোনো বিচ্ছিন্ন বা সাময়িক প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, বরং একটি সুসংহত ও গভীর কাঠামোগত সমস্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অংশগ্রহণ, সমন্বয় ও জবাবদিহি

একটি জনবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কেবল কাগজে-কলমে নীতিমালার অস্তিত্বই যথেষ্ট নয়, বরং সেই নীতিমালার সফল প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং একটি সুসংহত সমন্বিত কর্মপদ্ধতি নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য। বেসরকারি আবাসন খাতের সামগ্রিক গতিশীলতা অনেকাংশেই নির্ভর করে ভূমি মালিক, আবাসন নির্মাতা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়, তথ্য বিনিময়, পারস্পরিক জবাবদিহি এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতার ওপর। জবাবদিহির পরিমণ্ডলে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, সাড়াদান ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা এবং নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষণ একটি কার্যকর শাসনতাত্ত্বিক কাঠামোর অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এই ব্যবস্থা একদিকে যেমন রিয়েল এস্টেট কোম্পানির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, অন্যদিকে সাধারণ গ্রাহক ও অংশীজনদের অধিকার সুরক্ষার পথ প্রশস্ত করে।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতে অংশগ্রহণ ও সমন্বয় এবং জবাবদিহির বিদ্যমান পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অধ্যায়টির প্রথম অংশে 'অংশগ্রহণ ও সমন্বয়' সূচকের অধীনে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মধ্যকার আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি, জমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প সংশোধনে ভূমি মালিক ও প্লট ক্রেতাদের অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা, নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি ও প্রকৌশলীদের মধ্যে পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বে সমন্বয়ের অভাব এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা রাজউকের সাথে রিহ্যাব ও বিএলডিএর মতো বেসরকারি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর নীতিগত সংঘাত ও সমন্বয়হীনতা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে 'জবাবদিহি' সূচকের অধীনে রিয়েল এস্টেট আইনের শিথিল প্রয়োগ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ঘাটতি, জলাভূমি ভরাটে পরিবেশগত তদারকির ব্যর্থতা, কারিগরি পরামর্শক কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহির সংকট, ক্ষেত্রপর্যায়ে নিয়মিত তদারকির অভাব, প্রতারিত গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে পেশাজীবী সংগঠনগুলোর নিষ্ক্রিয়তা, প্রজেক্টের অনুমোদন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন চেইনে সার্বিক জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং অসাধু ডেভেলপারদের সুরক্ষায় ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক অস্বীকৃতির সংস্কৃতি ও যৌথ সুরক্ষাবাদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬.১ অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

৬.১.১ ভূমি মালিক ও প্লট ক্রেতাদের অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতা

বেসরকারি আবাসন খাতে ভূমি মালিক ও প্লট ক্রেতাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী পরিবর্তনসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমি মালিক ও প্লট ক্রেতাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কোনো বাধ্যতামূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণমূলক কাঠামো বিদ্যমান নেই। ফলে ভূমি মালিক ও ক্রেতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যান, এবং প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডেভেলপারকেন্দ্রিক হয়ে যায়। বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণের পর ক্ষতিপূরণের ধরন (যেমন নগদ অর্থ বা পুনর্বাসন প্লট) এবং ক্ষতিপূরণের শর্ত নির্ধারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকদের সঙ্গে কার্যকর আলোচনা, মতামত গ্রহণ বা বিকল্প পছন্দ প্রদানের সুযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হয় না। একইভাবে, ভূমির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও জমির মালিকদের সঙ্গে কার্যকর দর-কষাকষি বা আলোচনার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিদ্যমান নেই। ফলে মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ভূমি মালিকদের অংশগ্রহণ সীমিত থাকে এবং সিদ্ধান্তগুলো প্রধানত ডেভেলপারদের উদ্যোগে নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রভাবের কারণে ভূমি মালিকদের দর-কষাকষির সক্ষমতা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে প্লট ক্রেতাদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান, লে-আউট, রাস্তা, উন্মুক্ত স্থান বা অন্যান্য নাগরিক সুবিধাসংক্রান্ত নকশায় পরিবর্তন আনা হলেও অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতাদের পূর্বানুমোদন গ্রহণ বা যথাযথভাবে অবহিত করা হয় না। ফলে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে প্রাথমিক অংশীজন হিসেবে তাদের মতামত প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ সীমিত থাকে। উপরিউক্ত ক্ষেত্রে যদিও রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এ ডেভেলপার ও ভূমি মালিক বা ক্রেতার মধ্যে চুক্তির বিধান

রয়েছে, তথাপি অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পৃথক কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শ, পর্যালোচনা বা মতামত গ্রহণের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নেই। ফলে তথ্যের অসমতা এবং সীমিত অংশগ্রহণের কারণে ভূমি মালিক ও প্লট ক্রেতা উভয়েই অনেক ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারেন না। ফলস্বরূপ, ভূমি মালিক ও প্লট ক্রেতারা আবাসন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অংশীজন হওয়া সত্ত্বেও নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত থাকে।

৬.১.২ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি

বেসরকারি আবাসন খাতের টেকসই বিকাশে রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন যেমন– রিহ্যাব ও বিএলডিএ-এর মধ্যে একটি সুসংহত ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। তবে একটি গবেষণায় দেখা যায়, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নীতিগত ঐক্য ও কৌশলগত সহযোগিতার পরিবর্তে প্রায়শই এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান (কুলসুম, ২০২৩)। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এই সমন্বয়হীনতা প্রকট।

- রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প ও সেবা ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি বিদ্যমান, যার ফলে নগরীর আবাসন প্রকল্পগুলোতে চরম বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়।

- বিভিন্ন সরকারি সেবাদানকারী সংস্থা (যেমন তিতাস, ডিপিডিসি, ওয়াসা) ও রাজউকের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদানে স্বচ্ছতা ও সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হচ্ছে।

- অনিবন্ধিত আবাসন প্রকল্প এবং অনুমোদনহীন রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজউক ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রায়ই দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা এবং একে অপরের ওপর দায় চাপানোর সংস্কৃতি লক্ষ করা যায়।

- প্রকল্পভিত্তিক ইআইএ ও টিআইএ করা হলেও এই মূল্যায়নসমূহের তথ্য একত্রিত করে বিশ্লেষণ করার জন্য কোনো সমন্বিত জাতীয় বা নগর-স্তরের ডাটাবেইস বা ব্যবস্থা নেই। এর ফলে প্রতিটি প্রকল্প আলাদাভাবে মূল্যায়িত হলেও সমষ্টিগত প্রভাব, যেমন শহরের সামগ্রিক ট্রাফিক চাপ, বায়ু ও পরিবেশ দূষণ, এবং অবকাঠামোগত সক্ষমতার ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব যথাযথভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।

- জেলা প্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যথাযথ সমন্বয় না থাকায় অনিবন্ধিত প্রকল্পগুলো গ্রামীণ ও আধা-শহর অঞ্চলেও আশঙ্কাজনকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

- নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউকের মধ্যে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ড্যাপ বাস্তবায়ন ও আবাসন প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত, রাজউকের পরিকল্পনাগত অবস্থান এবং ডেভেলপারদের দাবির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে অনেক প্রকল্পের অনুমোদন, পুনর্মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছে।

- প্রকল্পের লে-আউট বা প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন ও বিভিন্ন ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী সংস্থার (যেমন বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস) পর্যাপ্ত ও বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। রাজউক নিজেকে শুধু ভূমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে সীমাবদ্ধ রাখায় পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি থেকে যায়, ফলে ইউটিলিটি সংস্থাগুলোর কার্যকর ও বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না।

- রাজউক মূলত ভূমি ব্যবহারকেন্দ্রিক পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করলেও সিটি কর্পোরেশনের সেবা প্রদান ও নগর ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এর কার্যকর সমন্বয়ের জন্য কোনো যৌথ প্ল্যাটফর্ম নেই।

- প্রকল্প পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে ডিপিডিসি এবং ডেসকোর মতো সংস্থাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত না করায় হঠাৎ করে অতিরিক্ত লোডের চাহিদা তৈরি হয়, যা বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং সেবা প্রদানে অদক্ষতা বাড়ায়।

- রাজউক ও ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ প্রদান বা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে, যা প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের সময় পরিকল্পনায় ইউটিলিটি লাইনের দিকনির্দেশনা বা অবকাঠামোগত সংযোগ যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় পরবর্তীতে সংযোগ স্থাপন জটিল হয়ে পড়ে।

- ঢাকা ওয়াসা, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং সিটি কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান, যার ফলে পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং গ্যাস ব্যবস্থাপনায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। ওয়াসা ও রাজউকের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে, এবং সিটি কর্পোরেশনের অপরিকল্পিত ইউটিলিটি পরিকল্পনার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি হয়। প্রকল্প এলাকায় রাস্তা কাটার অনুমতি ও ইউটিলিটি সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়াগত বিলম্ব প্রকল্পের সময়সীমা দীর্ঘায়িত করে এবং উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি করে।

৬.১.৩ খাতসংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি

বেসরকারি আবাসন খাতে নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি ও প্রকৌশলীদের মধ্যে পেশাগত অগ্রাধিকার ও কারিগরি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আবাসন প্রকল্পের পরিকল্পনা, নকশা ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা নিজ নিজ পেশাগত বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাহত হয়। নগর পরিকল্পনাবিদরা সাধারণত ড্যাপ, ভূমি ব্যবহার, উন্মুক্ত স্থান, জলাধার সংরক্ষণ, পরিবহন ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদি নগর ব্যবস্থাপনা ও জনস্বার্থের বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেন। অন্যদিকে, স্থপতি ও প্রকৌশলীরা প্রকল্পের নকশা, নির্মাণযোগ্যতা, অবকাঠামোগত বাস্তবায়ন, প্রযুক্তিগত কার্যকরতা এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ফলে প্রকল্প মূল্যায়ন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো আবাসন প্রকল্পে নগর পরিকল্পনাবিদরা ড্যাপ অনুসারে জলাধার ও উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করলেও প্রকৌশলী ও স্থপতিরা অনেক ক্ষেত্রে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, প্লটের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোর কার্যকরতাকে অগ্রাধিকার দেন। একইভাবে, পরিকল্পনাবিদরা ভবিষ্যৎ জনঘনত্ব, পরিবহন ব্যবস্থা, সামাজিক অবকাঠামো ও পরিবেশগত ভারসাম্যের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিলেও স্থপতি ও প্রকৌশলীরা প্রকল্পের কারিগরি বাস্তবায়ন, নির্মাণ ব্যয় এবং বাস্তবায়নযোগ্যতার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এর ফলে প্রকল্পের ঘনত্ব, ভূমি ব্যবহার, উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ এবং অবকাঠামো পরিকল্পনা নিয়ে ভিন্নমুখী অবস্থান তৈরি হয়।

এই সমন্বয়হীনতার কারণে আবাসন প্রকল্প মূল্যায়নে একটি সমন্বিত ও বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে না। ফলস্বরূপ, অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি নগর পরিকল্পনা, পরিবেশগত ভারসাম্য, জনস্বার্থ এবং প্রকল্পের অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে, যা টেকসই ও পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্য অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এছাড়া মহাপরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট সব পেশাজীবী সংগঠনের অংশগ্রহণের জন্য কোনো বাধ্যতামূলক বা প্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শ ব্যবস্থা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত না থাকায় বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর মতামত সমন্বিতভাবে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ সীমিত।

৬.১.৪ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বেসরকারি পেশাজীবী সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা

রাজউক এবং বেসরকারি আবাসন খাতের পেশাজীবী সংগঠনসমূহের (যেমন রিহ্যাব ও বিএলডিএ) মধ্যকার সম্পর্কটি একটি দ্বিমুখী প্রাতিষ্ঠানিক সংকটে জর্জরিত, যেখানে একদিকে নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণের ঘাটতি এবং অন্যদিকে নীতি বাস্তবায়নে আইনি ও স্বার্থের সংঘাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বর্জন সূচকের আলোকে দেখা যায়, ড্যাপ বা ইমারত নির্মাণ বিধিমালার মতো নীতি প্রণয়নের সময় বেসরকারি খাতের বাজারভিত্তিক মতামত উপেক্ষা করায় প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা তৈরি হয়। যার ফলে রাজউক যখন ড্যাপে এফএআর ও ভবনের উচ্চতা কমিয়ে দেয়, তখন রিহ্যাব রাজউকের নীতিকে সরাসরি বয়কট করে সংবাদ সম্মেলন ও উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়েরের মাধ্যমে প্রকাশ্য নীতিগত সংঘাতের জন্ম দেয়।

দ্বিতীয়ত, আইনি প্রতিরোধ সূচকের ক্ষেত্রটিতে রাজউকের সাথে ডেভেলপারদের চরম দ্বন্দ্ব দেখা যায়। যখন রাজউক জলাভূমি বা বন্যাপ্রবণ এলাকায় অননুমোদিত আবাসন প্রকল্পের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি বা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে, তখন কোম্পানিগুলো রাজউকের তদারকিকে "উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানি" দাবি করে উচ্চ আদালত থেকে স্থগিতাদেশ গ্রহণ করে।

তৃতীয়ত, তথ্যের অসামঞ্জস্য ও স্বার্থের সংঘাত সূচকের কারণে রাজউকের নিজস্ব আবাসন প্রকল্পের (যেমন পূর্বাচল বা ঝিলমিল) বাণিজ্যিক ভূমিকার জন্য বেসরকারি খাত রাজউককে নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রকের বদলে নিজেদের "ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী" হিসেবে দেখে।

চতুর্থত, আবাসন খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং পেশাজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক অসঙ্গতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এ পেশাজীবী সংগঠন বা সমিতির সদস্যপদ লাভকে সরকারি নিবন্ধনের জন্য ঐচ্ছিক হিসেবে উল্লেখ করা হলেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্রে [বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ধারা ১৩(১) অনুযায়ী] রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের সরকারি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে রিহ্যাবের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এই দ্বিমুখী সিদ্ধান্ত প্রাতিষ্ঠানিক নীতি-সমন্বয়হীনতাকে প্রকাশ করে। ফলে আইন এবং প্রশাসনিক নির্দেশনার মধ্যে সদস্যপদের অবস্থান নিয়ে একটি সমন্বয়গত প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। একদিকে সরকারি নিবন্ধনের পূর্বশর্ত হিসেবে রিহ্যাবের সদস্যপদ বিবেচনা করা হয়, আবার অন্যদিকে রিহ্যাবের নতুন সদস্যপদ লাভের শর্ত হিসেবে রাজউক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপ্রাপ্ত অন্তত একটি সক্রিয় প্রকল্পে বাস্তব নির্মাণকাজ শুরু ও দৃশ্যমান অগ্রগতির শর্ত আরোপ করা হয়। উল্লেখ্য, কোনো ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক নিবন্ধন ছাড়া আইনগতভাবে প্রকল্প অনুমোদন ও নির্মাণকাজ শুরু করতে পারে না। ফলে রিহ্যাবের সদস্যপদ পাওয়ার শর্ত পূরণ করতে গিয়ে কোম্পানিগুলো প্রাতিষ্ঠানিক নিবন্ধন ছাড়াই অবৈধ বা অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করতে বাধ্য হয়। ফলে সরকারি নিবন্ধন, প্রকল্প অনুমোদন, নির্মাণকাজ শুরু এবং রিহ্যাবের সদস্যপদ অর্জনের মধ্যে কোন ধাপটি পূর্বশর্ত এবং কোনটি পরবর্তী ধাপ – এ বিষয়ে আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনার মধ্যে সুস্পষ্ট সমন্বয়হীনতা দৃশ্যমান।

সার্বিকভাবে, আবাসন নীতি, ড্যাপ এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নের সময় অংশীজনদের সঙ্গে নিয়মিত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শ প্রক্রিয়া পর্যাপ্তভাবে নিশ্চিত না হওয়া, নীতিগত মতপার্থক্যের কার্যকর নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অভাব এবং নিয়ন্ত্রক ও বেসরকারি খাতের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার ঘাটতির ফলে সমন্বয়হীনতা ও আইনি বিরোধ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে সরকারি নিবন্ধন, প্রকল্প নকশা অনুমোদন, বাস্তব নির্মাণকাজ সূচনা এবং বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যপদ অর্জনের শর্তগুলোর মধ্যে অধিকতর সমন্বিত এবং আইনি ও ব্যবহারিক ক্রমবিকাশে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও সুস্পষ্ট নিদেশনা না থাকায় আবাসন খাতের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় চরম প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা ও নীতিগত অস্পষ্টতা লক্ষ করা যায়।

৬.২ জবাবদিহিতা

৬.২.১ আইন প্রয়োগে ঘাটতি

রিয়েল এস্টেট (উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১০ অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময় অন্তর দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি তা নিয়মিত পালন করে না। এই আইনি লঙ্ঘনের বিপরীতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা রাজউকের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর শাস্তিমূলক বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দায়বদ্ধতাহীনতা ফুটে ওঠে। এ ধরনের ক্ষেত্রে আইনটির তদারকি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরও সুস্পষ্ট ও কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়।

জবাবদিহিতার এই সংকট আরও ঘনীভূত হয় যখন বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগে এক ধরনের শৈথিল্য লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুমোদনের শর্ত ভঙ্গ বা দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক অনিয়ম সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনীহা পরিলক্ষিত হয়। এটি প্রকারান্তরে একটি 'দায়মুক্তির সংস্কৃতি' তৈরি করছে। এমনকি আদালতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে অনিশ্চিত করে তোলে। বেসরকারি আবাসন খাতে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার সংকট এবং 'দায়মুক্তির সংস্কৃতি'র একটি প্রত্যক্ষ বাস্তব উদাহরণ হলো আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের 'গ্রিন মডেল টাউন' প্রকল্প। ড্যাপ লঙ্ঘন করে জলাভূমি ও নিচু এলাকা ভরাটের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) কর্তৃক

দায়েরকৃত একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত এই প্রকল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও স্থিতাবস্থা জারি করেন (বেলা, ২০০৮)। এমনকি আদালতের নির্দেশ অমান্য করে অবৈধভাবে বালু ভরাট জারি রাখায় পরিবেশ অধিদপ্তর উক্ত ডেভেলপার কোম্পানিকে জরিমানাও করে। তা সত্ত্বেও রাজউক ও স্থানীয় প্রশাসনের মাঠপর্যায়ে তদারকি ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অনীহার কারণে প্রকল্পটির কার্যক্রম ও অননুমোদিত সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে, যা ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় ভূমি মালিকদের আইনি সুরক্ষাকে চরমভাবে ব্যাহত করেছে।[১২৯] মধুমতি মডেল টাউন প্রকল্প ২০০৫ সালে হাইকোর্ট এবং ২০১২ সালে আপিল বিভাগ কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়। ২০১৯ সালে আপিল বিভাগ জলাভূমি পুনরুদ্ধারের নির্দেশ পুনর্ব্যক্ত করলেও নির্ধারিত সময়ের পরও প্রকল্প এলাকায় পুনরুদ্ধার কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়নি এবং প্রকল্পটি অন্য নামে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে।[১৩০]

গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক সাড়াদানের অভাব এই খাতের আরেকটি বড় দুর্বলতা। সাধারণ গ্রাহকদের লিখিত বা মৌখিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে দ্রুত তদন্ত বা কার্যকর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের নজির অত্যন্ত সীমিত। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, আবাসন প্রকল্পসংক্রান্ত অভিযোগ, যেমন অনুমোদনহীন প্রকল্পে প্লট বিক্রয়, জলাশয় ভরাট বা আদালতের নির্দেশনা অমান্য করে প্রকল্প পরিচালনার ঘটনায় অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি এবং আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।[১৩১] এছাড়া জমি দখল বা অবৈধভাবে জলাশয় ভরাট সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা প্রায়শই প্রশ্নবিদ্ধ। তারা "এটি আদালতের বিষয়" বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অথবা দায়িত্ব বিভাজনের অজুহাতে দায়মুক্তি খোঁজে, যা অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে প্রভাবশালী অভিযুক্ত পক্ষকেই সুরক্ষা প্রদান করে। এছাড়া রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বিভ্রান্তিকর বিপণন কৌশল ও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর নীরবতা জনস্বার্থকে চরম ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। রাজউক ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মতো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মিথ্যা বিজ্ঞাপন বা চটকদার প্রচারণার বিরুদ্ধে নিয়মিত যাচাই ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে এই খাতে প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি ও জবাবদিহিতার কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিদ্যমান। এই অনুমোদনবিহীন বা অনুমোদনের সীমার বাইরে আবাসন প্রকল্পের বিজ্ঞাপন ও বিপণনের ঘটনাও গণমাধ্যমে উঠে এসেছে।[১৩২]

৬.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাত ও স্বার্থসংঘাত

বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের পথে অন্যতম গুরুতর অন্তরায় হলো নীতিনির্ধারণী ও কারিগরি তদারকি কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহির অভাব। বিশেষ করে, আবাসন প্রকল্পসমূহের ইআইএ ও টিআইএ প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কারিগরি পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞদের কার্যক্রমে নজরদারির কোনো সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামো নেই। বিদ্যমান ব্যবস্থায় আবাসন কোম্পানিগুলোর অনুকূলে ত্রুটিপূর্ণ কারিগরি প্রতিবেদন ও সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য গোপন করার মতো পেশাগত নৈতিকতা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তিমূলক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও গাইডলাইন নির্ধারিত নেই।

তাত্ত্বিকভাবে, এ ক্ষেত্রে পেশাগত নৈতিকতা ও বৈজ্ঞানিক সততা লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রাথমিক এখতিয়ার থাকে তাদের মূল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বা একাডেমিক কাউন্সিল) এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী নিয়ন্ত্রক সংস্থার (যেমন ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ - আইইবি)। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কারিগরি পরামর্শকদের প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা, দায় নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক বা পেশাগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোন কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালন করবে এবং কী প্রক্রিয়ায় তা সম্পন্ন হবে সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ও কার্যকর জবাবদিহি কাঠামো নেই।

বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রশাসনিক ও আইনি প্রক্রিয়া অকার্যকর থাকার কারণে পরামর্শকদের মধ্যে একটি কাঠামোগত দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি টিমের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে জলাভূমি এবং

---

[১২৯] *দি ডেইলি স্টার*, 'Amin Mohammad Group fined for illegal earth filling,' ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২, https://www.thedailystar.net/news-detail-124508 (০১ জুন ২০২৬)।

[১৩০] *দি ডেইলি স্টার*, 'Illegal Modhumoti Model Town: Still active in disguise,' ৯ জানুয়ারি ২০২১, https://www.thedailystar.net/frontpage/news/illegal-modhumoti-model-town-still-active-disguise-2025013 (১৮ জুলাই ২০২৬)।

[১৩১] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'Ashiyan City promotes land beyond approved area, defying Rajuk orders,' ২২ আগস্ট ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangladesh/ashiyan-city-promotes-land-beyond-approved-area-defying-rajuk-orders-1217736 (১৯ জুলাই ২০২৬); *দি ডেইলি স্টার*, ৯ জানুয়ারি ২০২১, *প্রাগুক্ত*।

[১৩২] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, ২২ আগস্ট ২০২৫, *প্রাগুক্ত*।

পরিবেশগত সংবেদনশীল বিষয়গুলো আড়াল করে একটি আবাসন প্রকল্পের অনুকূলে পক্ষপাতদুষ্ট ইআইএ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার অভিযোগ ওঠে। উক্ত পরামর্শক দল প্রকল্প মূল্যায়ন বাবদ বিশাল অঙ্কের কনসালটেন্সি ফি গ্রহণ করলেও (যার ২০% বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলে জমা দিয়ে অবশিষ্টাংশ ৮০% ব্যক্তিগতভাবে বণ্টন করা হয়) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান ফাঁকফোকর ও তদারকি দুর্বলতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোনো দৃষ্টান্তমূলক একাডেমিক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কারিগরি বিশেষজ্ঞদের এই প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিহীনতার সুযোগে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর (যেমন রাজউক বা পরিবেশ অধিদপ্তর) পক্ষে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ তারা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এই ত্রুটিপূর্ণ কারিগরি প্রতিবেদনের ওপরই নির্ভর করতে বাধ্য হয়।

৬.২.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি

কোনো একটি প্রকল্প অনুমোদনের সময় নির্ধারিত নকশা ও শর্ত বাস্তবায়নের পর্যায়ে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত ও কাঠামোবদ্ধভাবে যাচাই করার কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা দৃশ্যমান নয়। ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনুমোদিত পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুতি ঘটলেও তা সময়মতো শনাক্ত ও সংশোধন করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। বিশেষ করে, প্রকল্প অনুমোদনের পর অনুমোদিত লে-আউট, উন্মুক্ত স্থান, সড়ক, জলাধার ও অন্যান্য শর্ত বাস্তবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিদর্শন ও অনুসরণ করার একটি সুস্পষ্ট ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। এর ফলে কিছু ক্ষেত্রে অনুমোদিত নকশার ব্যত্যয় বা উন্মুক্ত স্থান সংকুচিত করার মতো অনিয়ম দীর্ঘ সময় অশনাক্ত থেকে যেতে পারে।

এছাড়া নিবন্ধনহীন এবং অবৈধ আবাসন প্রকল্পগুলো তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসন ও রাজউকের সক্ষমতা ও সদিচ্ছার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই 'অতিরিক্ত কাজের চাপ' বা 'জনবল সংকট'-এর অজুহাতে এসব অবৈধ প্রকল্পের মনিটরিং প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এই প্রশাসনিক উদাসীনতার ফলে শহর ও শহরতলীর উপকণ্ঠে যত্রতত্র অনুমোদনহীন প্রকল্প গড়ে উঠছে। ২০২১ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে রাজধানী ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরের উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা প্রায় এক হাজার অবৈধ আবাসন প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।[১৩৩] অথচ ১৯৮৪ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৩৮ বছরে রাজউক ও অন্যান্য সংস্থার (১৯৮৭ সালে রাজউক প্রতিষ্ঠার আগেসহ) অনুমোদিত ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প ৩৬টি।[১৩৪] এই চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয়, অনুমোদনবিহীন আবাসন প্রকল্প প্রতিরোধে বিদ্যমান তদারকি ও আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত কার্যকর নয়। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে বিপুল সংখ্যক অবৈধ প্রকল্প গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৬.২.৪ বিরোধ নিষ্পত্তি ও ভুক্তভোগী সুরক্ষায় জবাবদিহিতার ঘাটতি

আবাসন খাতে গ্রাহক অধিকার সুরক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণের মূল ভিত্তি একটি কার্যকর, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং কাঠামোগত পক্ষপাতিত্বের কারণে সংক্ষুব্ধ গ্রাহক ও ভূমি মালিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে চরম জবাবদিহিতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

- অধিকাংশ রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ, নথিভুক্তকরণ, অনুসরণ ও নিষ্পত্তির জন্য সুস্পষ্ট ও কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল বা দাপ্তরিক কাঠামো নেই। ফলে প্রাক-বিক্রয় চুক্তি লঙ্ঘন, নির্মাণে দীর্ঘসূত্রতা বা ইউটিলিটি সুবিধার ঘাটতি দেখা দিলে সংক্ষুব্ধ গ্রাহকরা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

- রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি আবাসন খাতের পেশাজীবী সংগঠনগুলোতে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিক বিরোধ নিষ্পত্তি সেল থাকলেও দীর্ঘসূত্রিতা, প্রশাসনিক জটিলতা, স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতার কারণে অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যকরতা প্রশ্নের মুখে পড়ে। অধিকন্তু, এসব সংস্থায় অভিযোগ দাখিল ও বিরোধ নিষ্পত্তির

[১৩৩] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'দেশজুড়ে অবৈধ আবাসন প্রকল্পের ছড়াছড়ি,' ১৬ নভেম্বর ২০২১, https://www.tbsnews.net/bangla/বাংলাদেশ/দেশজুড়ে-অবৈধ-আবাসন-প্রকল্পের-ছড়াছড়ি-%C2%A0 (১৯ জুলাই ২০২৬)।

[১৩৪] *বণিকবার্তা*, 'রাজউক অনুমোদিত বেসরকারি আবাসন প্রকল্প ৩৬টি,' ১৭ নভেম্বর ২০২২, https://www.bonikbarta.com/home/news_description/320523 (১৯ জুলাই ২০২৬)।

প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত সার্ভিস ফি ও অন্যান্য প্রক্রিয়াগত ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা থাকায় সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলে তীব্র অনীহা তৈরি হয়।

- রিহ্যাব ও বিএলডিএর মতো পেশাজীবী সংগঠন একইসঙ্গে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করে। বিএলডিএ'তে সাধারণ ক্রেতা ও ভূমি মালিকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা সেলই গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, রিহ্যাবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ নথিভুক্তকরণের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ থাকলেও তা নিষ্পত্তিতে নিরপেক্ষতা ও কার্যকর উদ্যোগের চরম অভাব রয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির বদলে রিহ্যাবকে প্রায়ই সদস্য ডেভেলপার কোম্পানিগুলোর অন্যায় সুবিধা আড়াল করা বা একপাক্ষিক স্বার্থ রক্ষার পক্ষে অবস্থান নেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এই ধরনের সাংগঠনিক পক্ষপাতিত্ব ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে সরাসরি বাধাগ্রস্ত করে।

সামগ্রিকভাবে, বেসরকারি আবাসন খাতে অভিযোগ গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, নিষ্পত্তির কার্যকরতা, নিরপেক্ষতা, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং ভুক্তভোগীর কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। প্রাতিষ্ঠানিক অভিযোগ সেলের অনুপস্থিতি, পেশাজীবী সংগঠনগুলোর একপাক্ষিক অবস্থান এবং সরকারি সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক জটিলতা আবাসন খাতের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

৬.২.৫ ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক অস্বীকৃতির সংস্কৃতি ও যৌথ সুরক্ষাবাদ

বিভিন্ন একাডেমিক গবেষণা ও জাতীয় গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে সরকারি খাস জমি জবরদখল, স্থানীয় নাগরিকদের পৈতৃক সম্পত্তি জোরপূর্বক ভরাট, কিংবা পেশীশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জমি বিক্রিতে বাধ্য করার মতো গুরুতর ফৌজদারি ও পরিবেশগত অপরাধের অকাট্য প্রমাণ মেলার পরও আবাসন খাতের শীর্ষ সংগঠনগুলো তা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করে। অনিয়ম চিহ্নিত করে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (যেমন সদস্যপদ বাতিল বা সাময়িক স্থগিতকরণ) গ্রহণের পরিবর্তে এই ধরনের সামষ্টিক অস্বীকৃতির সংস্কৃতি খাতের জবাবদিহির কাঠামোকে সম্পূর্ণ অকার্যকর করে তোলে।

> "ধরুন ৫০ বিঘা জমি ডেভেলপ করতে যাই, সেখানে মাঝেমধ্যে ৫-৬ বিঘা অন্য মালিকের জমি থেকে যায়... এখন পুরো এলাকাটি যখন ১৫ ফিট পর্যন্ত ভরাট করা হয়, তখন যতই চেষ্টা করি না কেন, ওই আলাদা মালিকের ৫ বা ১০ কাঠা জমিটা ফাঁকা রাখা সম্ভব হয় না... স্বাভাবিকভাবেই আশেপাশের বালু বা মাটি সেখানে ঢুকে পড়ে...।"
>
> *— বিএলডিএর একজন প্রতিনিধি*

> "এই কমপ্লেইনটাকে (জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ) আমি গ্রাহ্য করি না...ভূমি দখল করা ইমপসিবল... বলা হয় আমরা যারা ডেভেলপ করি তারা সব ভূমি দখলকারী ভূমিদস্যু... এটা সম্পূর্ণভাবে সমাজের একটা প্রচলিত কথা...।"
>
> *— বিএলডিএর একজন প্রতিনিধি*

আবাসন খাতের কাঠামোগত ভূমিদস্যুতা কিংবা জোরপূর্বক জমি দখলের মতো মাঠপর্যায়ের বাস্তব অভিযোগগুলোকে এই রিয়েল এস্টেট সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে জনমানসের একটি 'তথাকথিত ধারণা' বা ভিত্তিহীন অপপ্রচার হিসেবে অভিহিত করার প্রবণতা দেখা যায়। কোনো বস্তুনিষ্ঠ অভ্যন্তরীণ তদন্ত ছাড়াই একচেটিয়াভাবে এই ধরনের প্রতিরক্ষামূলক ন্যারেটিভ বা প্রচারণামূলক কৌশল ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো প্রভাবশালী কোম্পানিগুলোর ভাবমূর্তি রক্ষা করা। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর এই যৌথ সুরক্ষাবাদী ভূমিকা প্রকারান্তরে অভিযুক্ত পক্ষগুলোকে একধরনের প্রাতিষ্ঠানিক দায়মুক্তি প্রদান করে, যা গ্রাহক ও ভুক্তভোগী সাধারণ নাগরিকদের আইনি প্রতিকার পাওয়ার পথকে রুদ্ধ করে।

৬.৩ উপসংহার

এ অধ্যায়ে আলোচিত তথ্য ও বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতে অংশগ্রহণ, সমন্বয় এবং জবাবদিহিতা – সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বিদ্যমান। অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে দায়িত্ব ও তথ্য বিনিময়ের ঘাটতি, ভূমি মালিক ও ক্রেতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সীমিত সম্পৃক্ততা, বিভিন্ন পেশাজীবীর মধ্যে সমন্বয়ের দুর্বলতা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বেসরকারি পেশাজীবী সংগঠনের মধ্যে নীতিগত মতপার্থক্য ও প্রশাসনিক অস্পষ্টতা আবাসন উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলেছে। বিশেষত, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশীজনদের কার্যকর সম্পৃক্ততার সীমাবদ্ধতা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি অংশগ্রহণমূলক ও সমন্বিত শাসনব্যবস্থার দুর্বলতাকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, জবাবদিহির ক্ষেত্রে আইন ও বিধিবিধানের বাস্তব প্রয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি, কারিগরি পরামর্শকদের দায়বদ্ধতা এবং গ্রাহক ও ভূমি মালিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পের শর্ত প্রতিপালন, অবৈধ ভূমি উন্নয়ন ও পরিবেশগত অনিয়মের ক্ষেত্রে নিয়মিত তদারকি এবং কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করার ঘাটতি বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাস্তব প্রয়োগের দুর্বলতাকে প্রতিফলিত করে। একই সঙ্গে অভিযোগ ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা এবং পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সদস্যস্বার্থ ও ভুক্তভোগীদের স্বার্থের মধ্যে সম্ভাব্য স্বার্থসংঘাত জবাবদিহির কার্যকরতাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

আরও প্রতীয়মান হয়, বেসরকারি আবাসন খাতে জবাবদিহির সমস্যা কেবল আইন প্রয়োগের দুর্বলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং নীতি প্রণয়ন থেকে প্রকল্প অনুমোদন, বাস্তবায়ন, তদারকি, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং প্রতিকার পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব নির্ধারণ, পারস্পরিক সমন্বয় ও দায়বদ্ধতার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে, সদস্যভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকা এবং তাদের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মোকাবিলার দায়িত্বের মধ্যে যে সম্ভাব্য স্বার্থসংঘাত তৈরি হয়, তা নিরপেক্ষ জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। সার্বিকভাবে, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের সীমাবদ্ধতা এবং জবাবদিহিতার দুর্বলতা পরস্পরকে শক্তিশালী করে বাংলাদেশের বেসরকারি আবাসন খাতে একটি দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ

এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচিত তথ্যাদি ও প্রাপ্ত ফলাফলগুলোর একটি সার্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে আবাসন খাতের সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলোর সারসংক্ষেপ তুলে ধরার পাশাপাশি উত্তরণের জন্য সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে।

৭.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসনের সংকটটি সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশক বা সূচকের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এই সূচকগুলো নির্দেশ করে যে, খাতটি বর্তমানে একটি কাঠামোগত অচলাবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে।

- **সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি:** দুর্বল নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং নীতি বাস্তবায়নের ধীরগতি আবাসন খাতের কার্যকরতাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর জনবল সংকট, কারিগরি অদক্ষতা এবং প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার কারণে পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। এর ফলে একটি 'শ্রেণিকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রবণতা' জোরদার হয়েছে, যেখানে কেবল উচ্চবিত্তের চাহিদা প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ন ও "সবার জন্য আবাসন" ধারণাটি বাস্তবে পুরোপুরি ব্যাহত হচ্ছে।
- **অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের অনুপস্থিতি:** ভূমি মালিক, সাধারণ নাগরিক এবং ক্ষুদ্র অংশীজনরা নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ইউটিলিটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং পেশাজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব এই খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক সুশাসনের সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে। বৃহৎ ডেভেলপার কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া প্রভাবের ফলে অংশগ্রহণমূলক বৈষম্য তৈরি হয়েছে, যা ক্ষুদ্র অংশীজনদের স্বার্থকে কোণঠাসা করে ফেলছে।
- **স্বচ্ছতার অভাব ও তথ্যের নিয়ন্ত্রণ:** স্বচ্ছতার অভাব কেবল তথ্য গোপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন, ভুয়া নথি, প্রশ্নবিদ্ধ অনুমোদন এবং অংশীজনদের মধ্যে সমন্বিত অস্বচ্ছ অবস্থানের মতো বিষয়গুলো উন্মোচিত হয়েছে। লক্ষণীয়, স্বচ্ছতার এই অভাব একক কোনো সমস্যা নয়, বরং এটি 'অনিয়ম ও দুর্নীতি' এবং 'জবাবদিহিতার ঘাটতি' সূচক দুটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যখন তথ্যের অবাধ প্রবাহ রুদ্ধ করা হয়, তখন তা সরাসরি দুর্নীতি ও অনিয়মকে সুরক্ষা প্রদান করে।
- **অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন খাতের অন্যতম প্রধান সংকট পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকা এই অনিয়ম কেবল আর্থিক লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি ভূমি-কেন্দ্রিক মাফিয়াতন্ত্র ও শক্তিশালী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাজারকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করার একটি কৌশলে পরিণত হয়েছে। জবরদখল, জলাশয় ভরাট এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আইনি প্রক্রিয়াকে পাশ কাটানোর প্রবণতা ক্ষমতার অপব্যবহারের অন্যতম উদাহরণ।
- **জবাবদিহিতার ঘাটতি ও দায়মুক্তির সংস্কৃতি:** আইন প্রয়োগে শৈথিল্য এবং নীতিগত ফাঁকফোকর ব্যবহার করে পার পেয়ে যাওয়ার একটি সংস্কৃতি এখানে প্রতিষ্ঠিত। অভিযোগ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থতা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নিষ্ক্রিয়তা এই খাতের অনিয়মগুলোকে টিকে থাকতে সহায়তা করছে। এই 'দায়মুক্তির সংস্কৃতি' প্রমাণ করে, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না থাকায় অসাধু চক্রগুলো দিন দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে, যা সামগ্রিক শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। অনিয়ম টিকে থাকার পেছনে জবাবদিহিতার ঘাটতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে

সামগ্রিকভাবে, বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসনের প্রায় সব সূচকেই কাঠামোগত দুর্বলতা ও বাস্তবায়নের ঘাটতি বিদ্যমান। বিদ্যমান আইন ও বিধির নানা ফাঁকফোকর, শিথিল প্রয়োগ এবং সমন্বয়হীনতার সুযোগ নিয়ে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপাররা নিয়মিতভাবে নীতি ও আইন লঙ্ঘন করছে। একইসঙ্গে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও ইউটিলিটি সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা এবং সদিচ্ছার ঘাটতি প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা তৈরি করছে, যার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো আইনি বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। পাশাপাশি ভূমি নির্বাচন, ক্রয় ও দখল, প্রকল্প অনুমোদন থেকে শুরু করে প্লট হস্তান্তর পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার বিভিন্ন

পর্যায়ে পদ্ধতিগত অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। অপপ্রচার, তথ্যপ্রবাহ রুদ্ধ করা, নাগরিক অংশগ্রহণকে সীমিত করা, এবং অভিযোগ/বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা দুর্বল রাখার মাধ্যমে এ খাতে একধরনের আইনি দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক ছত্রছায়া, মধ্যস্বত্বভোগী, ভূমিকেন্দ্রিক স্বার্থগোষ্ঠী, ও প্রশাসনিক অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বৃহৎ ডেভেলপাররা একটি শক্তিশালী 'মাফিয়াতন্ত্র' গড়ে তুলেছে যা নীতিনির্ধারণী ও সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে কার্যত জিম্মি করে ফেলেছে। আবাসন খাতে কালো টাকা বিনিয়োগকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ও তাদের সংগঠনগুলোর অব্যাহত প্রচেষ্টা এই খাতে সুশাসনকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। আর রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর অতি মুনাফাকেন্দ্রিক মানসিকতা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ফলে জমির মালিক ও সাধারণ ক্রেতা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তাদের অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসনের এই ঘাটতিগুলো সমানভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান নয়। দুর্নীতি ও অনিয়মকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোর সঙ্গে অন্যান্য সূচক, যেমন সক্ষমতার অভাব, জবাবদিহিতার অভাব, সমন্বয়হীনতা এবং অস্বচ্ছতার সাথে আন্তঃসম্পর্কিতভাবে যুক্ত হয়ে খাতটির সামগ্রিক সুশাসনকে দুর্বল করেছে এবং একটি বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জে পরিণত করেছে। ফলে ঢাকা শহরের পরিবেশগত সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা, পরিকল্পিত নগারয়ন, "সবার জন্য সাশ্রয়ী আবাসন" নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৭.২ সুপারিশমালা

রাষ্ট্রীয় আইন এবং বাজার চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকের বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করতে বেসরকারি আবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

৭.২.১ আইনগত ও নীতিনির্ধারণীমূলক

১. রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এ নিম্নলিখিত সংশোধন করতে হবে –

(ক) রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রকল্পের আইনানুগ বাস্তবায়ন, নির্মাণমান, গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক কর্মসম্পাদনভিত্তিক (Performance-based) মূল্যায়ন চালু করতে হবে;

(খ) রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নিবন্ধন-সংক্রান্ত আইন ও প্রশাসনিক পরিপত্রের অসামঞ্জস্য দূর করে সদস্যপদের শর্তসমূহকে একক ও আইনসম্মত কাঠামোর আওতায় আনতে হবে;

(গ) 'প্রসপেক্টাস অথবা বরাদ্দপত্র'-এর পরিবর্তে 'প্রসপেক্টাস এবং বরাদ্দপত্র' বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রসপেক্টাসকে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ঘোষিত সুবিধা লঙ্ঘনকে প্রতারণা হিসেবে শাস্তিযোগ্য করতে হবে;

(ঘ) ডেভেলপারের একতরফা প্লট বা ফ্ল্যাট পরিবর্তনের সুযোগ বাতিল করে ক্রেতার অবাধ, পূর্বানুমোদিত ও লিখিত সম্মতি বাধ্যতামূলক করতে হবে, এবং সম্মতি ছাড়া পরিবর্তনকে আইনগতভাবে অকার্যকর ঘোষণা করতে হবে;

(ঙ) ভূমির মালিকের অনুপস্থিতি/ বিলম্বের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেভেলপারকে দলিল সম্পাদনের ক্ষমতা না দিয়ে যুক্তিসঙ্গত কারণ যাচাই, নির্ধারিত শুনানি এবং প্রয়োজনে নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর দলিল সম্পাদনের বিধান করতে হবে;

(চ) প্রতিটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির জমি অধিগ্রহণে সীমা আরোপ করতে হবে;

(ছ) রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সরকারি নিবন্ধন, প্রকল্প অনুমোদন, নির্মাণকাজ শুরু, বিজ্ঞাপন/বিক্রয় এবং রিহ্যাব/ বিএলডিএর সদস্যপদ – এই ধাপগুলোর মধ্যে কোনটি পূর্বশর্ত এবং কোনটি পরবর্তী ধাপ, তা আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনায় সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। রিহ্যাবের সদস্যপদ ও সরকারি নিবন্ধনের পরস্পরনির্ভরশীল শর্তগুলো পুনর্বিন্যাস করে সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রক ক্রম (Regulatory Sequencing) নির্ধারণ করতে হবে। বিশেষ করে কোনো সংগঠনের সদস্যপদ অর্জনের জন্য এমন কোনো শর্ত রাখা উচিত নয়, যা পূরণ করতে গিয়ে ডেভেলপারকে পূর্ববর্তী আইনগত নিবন্ধন বা অনুমোদন সম্পন্ন হওয়ার আগেই কার্যক্রম শুরু করার প্রণোদনা তৈরি করে।

(ঙ) নতুন রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রিহ্যাবের সদস্যপদ পাওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে রাজউক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত প্রকল্পে বাস্তবে নির্মাণকাজ সূচনা ও দৃশ্যমান অগ্রগতির যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা অবিলম্বে সংশোধন বা বিলোপ করতে হবে।

২. বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২ ও ২০১৫)-এ নিম্নলিখিত সংশোধন করতে হবে –

(ক) জমি অধিগ্রহণে কেবল ভূমির বাজারমূল্য বিবেচনা না করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বসতবাড়ি, জীবিকা ও উপার্জনহানি বিবেচনা করে সমন্বিত পুনর্বাসন ও জীবিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কাঠামো বাধ্যতামূলক করতে হবে;

(খ) পুনর্বাসন প্লট, আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা উভয়ের সমন্বিত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারণের স্বচ্ছ মানদণ্ড, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির লিখিত মতামত, আপিলের সুযোগ এবং পুনর্বাসন প্লটের অবস্থান পরিবর্তনে লিখিত সম্মতি বাধ্যতামূলক করতে হবে;

(গ) প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ৭৫% জমি সংগ্রহের পর অবশিষ্ট ২৫% জমির মালিকদের ওপর জোরপূর্বক জমি বিক্রয়ে বাধ্য না করে তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রকল্পে অংশীদার হওয়ার আইনি সুযোগ প্রদান, অথবা সমমূল্যের উন্নয়নকৃত প্লট গ্রহণের আইনগত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঘ) প্রকল্প প্রস্তাবনায় ক্রেতার অধিকার, ডেভেলপারের দায়বদ্ধতা, ক্ষতিপূরণ, বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বিরোধ নিষ্পত্তিসহ একটি বাধ্যতামূলক 'মানসম্মত ভোক্তা সুরক্ষা কাঠামো' (Standard Consumer Protection Framework) প্রবর্তন করতে হবে;

(ঙ) খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান ও অন্যান্য কমিউনিটি সুবিধা পরিকল্পনায় শিশু, নারী, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজন বিবেচনায় অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা ও সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা বাধ্যতামূলক করতে হবে;

(চ) ২০১৫ সালের সংশোধনী বাতিল করে প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশন, পানি নিষ্কাশন ও অন্যান্য ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী সংস্থার 'সমন্বিত সক্ষমতা যাচাই' (Integrated Utility Capacity Clearance) পুনরায় বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং 'সমন্বিত পরিবেশ ও সেবা ছাড়পত্র' (Integrated Environmental and Service Clearance) প্রণয়ন ও গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে;

(ছ) রাজউক কর্তৃক সরকার অনুমোদিত একটি স্ট্যান্ডার্ড চুক্তিপত্র প্রণয়ন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে, এবং অতিরিক্ত শর্ত সংযোজনের ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(জ) পরীক্ষামূলক প্রকল্পের উদ্দেশ্য, পরিধি, সময়সীমা, তদারকি ও চূড়ান্ত ছাড়পত্রের সময়সীমা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে, এবং নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রম করলে অনুমোদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিলের বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি পরিবর্তন করে নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে –

(ক) অবৈধ প্রকল্পকে জরিমানা দিয়ে বৈধ করার সুযোগ বাতিল করে শর্ত ভঙ্গের দায়ে সংশ্লিষ্ট রিয়েল এস্টেট কোম্পানির লাইসেন্স স্থগিত করতে হবে ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(খ) জলাশয় বা কৃষিজমি ভরাটকারী ডেভেলপারদের প্রকল্প বাতিল, কালো তালিকাভুক্তি এবং তাদের কাছ থেকে পরিবেশ পুনরুদ্ধারের ব্যয় আদায় বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(গ) আবাসন প্রকল্পে আইপিএ নিষিদ্ধ বা স্বল্পমেয়াদি করতে হবে এবং মালিকানা হস্তান্তর ছাড়া প্লট বিক্রয় বা উন্নয়ন অনুমোদন বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি আইপিএ'র মাধ্যমে জমি বিক্রয় হলে পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন ও কর পরিশোধ বাধ্যতামূলক করতে হবে;

(ঘ) প্লটের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্লট ক্যাটাগরি ও অবস্থানগত ভিন্নতা বিবেচনায় প্লটের মূল্যের যৌক্তিকতা, মানদণ্ড এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং নিয়মিত বাজার মূল্য মনিটরিং বাধ্যতামূলক করতে হবে;

(ঙ) কোনো সংরক্ষিত স্থান বা জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তনের অনুমোদনের আগে পরিবেশগত, সামাজিক ও জনস্বাস্থ্যগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। শুধু প্রশাসনিক বিবেচনার ভিত্তিতে "জনস্বার্থ" নির্ধারণের সুযোগ সীমিত করতে হবে;

(চ) দেশের সকল খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধারের ভূ-অবস্থান, সীমানা, শ্রেণি, আয়তন ও বর্তমান ব্যবহার ডিজিটাল রেজিস্ট্রিতে সংরক্ষণ ও জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

(ছ) রিহ্যাবের আচারণবিধিতে গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধে বিলম্বের জন্য যেমন জরিমানা বা বরাদ্দ বাতিলের বিধান থাকে, তেমনি ডেভেলপারের বিলম্ব, চুক্তিভঙ্গ বা প্রতিশ্রুত সেবা প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও সমমানের আর্থিক দায় ও প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে;

(জ) রিহ্যাবের আচরণবিধিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রক কাঠামোর সঙ্গে সমন্বিত করার জন্য রিহ্যাবের অভ্যন্তরীণ শাস্তি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির পাশাপাশি গুরুতর প্রতারণা, অনুমোদনবিহীন প্রকল্প, জালিয়াতি বা ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংশ্লিষ্ট সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে অবহিত করার বিধান করতে হবে।

(ঝ) রিহ্যাবের আচারণবিধিতে 'Chronic Defaulter', 'Force Majeure', 'Abnormal Price Increase', 'Political Unrest' ইত্যাদি শব্দের পরিমাপযোগ্য ও যাচাইযোগ্য মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে, যাতে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির অজুহাতে ডেভেলপারের দায় এড়ানোর সুযোগ সীমিত হয়;

(ঞ) বিএলডিএর অভ্যন্তরে সদস্যদের থেকে স্বাধীন একটি অভিযোগ তদন্ত ও তদারকি কমিটি গঠন করতে হবে, যা অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত, শুনানি ও সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে;

(ট) বিএলডিএর আচারণবিধিতে আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য সতর্কীকরণ, জরিমানা, ক্ষতিপূরণ, সদস্যপদ স্থগিত এবং সদস্যপদ বাতিল – এ ধরনের সুস্পষ্ট ও পর্যায়ক্রমিক শাস্তির বিধান নির্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব, চুক্তিভঙ্গ, বাতিল বা অসম্পূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ক্রেতার ক্ষতিপূরণ, অর্থ ফেরত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুদ প্রদানের সুস্পষ্ট বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭.২.২ তদারকি ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ

৪. রাজউক, সিটি কর্পোরেশন, ইউটিলিটি সংস্থা, জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের (নগর পরিকল্পনাবিদ, পরিবেশবিদ) অন্তর্ভুক্ত করে একটি আন্তঃসংস্থা সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম গঠন করতে হবে এবং তাৎক্ষণিক তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৫. পরিবেশগত মূল্যায়নের (ইআইএ) পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ ও ট্রাফিক মূল্যায়নের (টিআইএ) গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি ডেভেলপার কোম্পানির জন্য ইআইএ ও টিআইএ বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা করালে তালিকাভুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যাচাই বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে রাজউক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে আবাসন বাজার তদারকির জন্য একটি সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

৭.২.৩ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ

৭. গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে রাজউক ও বেসরকারি আবাসন ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি 'স্বাধীন অভিযোগ নিষ্পত্তি বোর্ড' গঠন করতে হবে, এবং এ সংক্রান্ত সব তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

৮. রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর বার্ষিক অডিট ও আর্থিক তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করাসহ এমডি/চেয়ারম্যানের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ এবং বোর্ডে স্বাধীন পরিচালক ও অডিট কমিটি রাখা আবশ্যিক করতে হবে।

৯. বিজ্ঞাপনে প্লটমূল্যের পাশাপাশি উন্নয়ন ফি, ইউটিলিটি চার্জ ও রিফান্ড নীতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাশাপাশি প্রকল্প-সংক্রান্ত সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বাধ্যতামূলক ও নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

৭.২.৪ অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ

১০. বৈশ্বিক উত্তম চর্চার আলোকে এই খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১১. বৈধ অনুমোদন ও ছাড়পত্র ছাড়া প্লটের বিজ্ঞাপন প্রচারে সংশ্লিষ্ট ডেভেলপার ও প্রচারমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. জমি অধিগ্রহণ, প্লট বিক্রয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল আর্থিক লেনদেন বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন এবং তা নিয়মিত নিরীক্ষার আওতায় আনতে হবে।

১৩. যেকোনো অবৈধ ভূমি/জলাশয় দখল, প্রকল্প ও ভূমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিয়েল এস্টেট কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সরকারি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মী, রাজনৈতিক প্রভাবশালী, এবং অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

****

পরিশিষ্ট

তথ্যসূত্র

আইন কমিশন। (২০২৩)। *মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও মামলার জট হ্রাসকরণে আইন কমিশন এর সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন।* একাদশ জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৯.০৮.২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৩২ বৈঠক-এ উপস্থাপনের জন্য। উৎস: https://lc.portal.gov.bd/pages/reports/166-মামলা-ধ্রুত-নিষ্পত্তি-ও-মামলার-জট-হ্রাসকরণে-আইন-কমিশন-এর-সুপারিশ-ed90f4-6922dc84dbfbab28ce05f8b5

অর্থ মন্ত্রণালয়। (২০২৪)। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪।* অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার। প্রাপ্তি: ১২ আগস্ট, ২০২৫, থেকে https://mof.portal.gov.bd/site/page/28ba57f5-59ff-4426-970a-bf014242179e/বাংলাদেশ-অর্থনৈতিক-সমীক্ষা-২০২৪

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। (২০১৫) । বাংলাদেশের আবাসন খাতের ইতিহাস ও উন্নয়ন।

স্থানীয় সরকার বিভাগ। (১৯৭২) । গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা। ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো। (২০০৭) । দুর্যোগ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে গুচ্ছগ্রামের ভূমিকা। ঢাকা: ত্রান ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। (২০১৮) । সরকারি আবাসন প্রকল্প: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ। ঢাকা: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

রাজউক। (২০২২) । *বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০২২-২০৩৫ (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)।* রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজউক ভবন, ঢাকা, বাংলাদেশ। প্রাপ্তি: ১২ আগস্ট, ২০২৫, থেকে https://rajuk.gov.bd/site/page/4075ddcf-8925-489f-8170-c311bc6f952f/-

Ahmed, B. (2012). *Urbanization and Housing Development in Dhaka*. Dhaka: Academic Press.

Ahsan, R. M. (1996). *Urban development and housing in Dhaka: Trends and policy issues*. University of Dhaka.

Ahmed, A., Bakhtiar, M. M., & Mahzab, M. M. (2024). *Food security and nutrition in Bangladesh: Evidence-based strategies for advancement*. International Food Policy Research Institute. Retrieved from https://bangladesh.ifpri.info/files/2024/11/IFPRI_Food-Security-in-Bangladesh_Report_November-2024.pdf

Alam, S. M. Shamsul (1987). *Urbanization in Bangladesh*. CUS Bulletin.

Alam, R. (2018). Corruption and land management in private residential projects. *Bangladesh Journal of Development Journalism*, *5*(2), 35–57.

Alam, J. & Chowdhury, A.H.M.Y. (2018). Causes of Declination of Real Estate Business in Bangladesh: A Case Study on Dhaka City. *The Chittagong University Journal of Business Administration*, 27.

Alam, S. S., & Islam, M. N. (2018). Measuring customers' satisfaction towards the real estate company in Bangladesh: a study on a real estate company in Dhaka city. *Journal of Primeasia*, *1*(1), 1-7.

Arefin, S. A. (2019). The influence of political power on land grabbing. *Social Science Review*, *11*(1), 80–101.

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2018). *Labour Force Survey 2016-17*. Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh. Retrieved from https://mole.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mole.portal.gov.bd/page/ac7088c7_a211_4905_9ff3_1e62af00c837/LFS_2016-17_compressed.pdf

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2017). *Labour Force Survey 2017*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics.

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2019). *Survey on Occupied Residential Houses and Real Estate Services 2018*. Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh. Retrieved from https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2022-03-29-05-04-8cf8b15e642f2fa4263c1cee7448e456.pdf

Bangladesh Bureau of Statistics. (2019). *Survey on Occupied Residential Houses and Real Estate Services 2018*. Retrieved from https://www.bbs.gov.bd

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2022). *Population and Housing Census 2022: National Report*. Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh. Retrieved from

https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/df95b543_51fe_4478_b6c2_b44593094ee1/2025-07-09-08-57-8bf89c23a6177d08fc77ba751ce63a82.pdf

BELA. (2008). *Landmark Judgments on Wetland Protection*. Bangladesh Environmental Lawyers Association. Retrieved from https://belabangladesh.org/landmark-judgments/

Bhowmik, S. (2026). Capturing the fourth estate: A case study of Bangladesh news media. *Journalism*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/14648849261455923

Chen, J. (2019). What is real estate? *Investopedia*. Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/r/realestate.asp

Chowdhury, L. R. (1995). *Urban Land Management in Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited.

Chowdhury, M. S. H. (2013). *Private sector housing in Dhaka: A study on Eastern Housing Limited* [Unpublished Master's thesis]. University of Dhaka.

Chowdhury, A. H. (2013). *Planned housing schemes in Dhaka: A review of public and private sector initiatives*. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Eastern Housing Limited. (2016). Annual report 2016. Dhaka, Bangladesh: Author. Retrieved from https://easternhousing.com/wp-content/uploads/2021/09/EHL_ANNUAL_REPORT_2016-1488958076-2.pdf

Geddes, P. (1917). *Report on town planning, Dacca*. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot. Retrieved from https://books.google.com.bd/books?id=Gcs2HAAACAAJ

Government of Bangladesh. (1972–1975). Cluster Village (*Guccho Gram*) Rehabilitation Program. Ministry of Land / Ministry of Relief and Rehabilitation.

Government of Bangladesh. (2023). *Detailed Area Plan (DAP) 2022–2035*.

Hasan, M. K., & Kabir, M. R. (2019). Challenges and Opportunities of Small and Medium Real Estate Companies in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Business Research*, 8(1).

Hossain, M. Z. (2018). *Constitutional Rights and Social Justice in Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited.

Hoq, M. A. (2012). *Land development in Bangladesh: Political and economic impacts*. Dhaka: Academic Publishers.

Islam, N. (1996). *Dhaka: From City to Megacity*. Dhaka: Urban Studies Program.

Islam, N. (2005). *Dhaka Now: Contemporary Urban Development*. Bangladesh Geographical Society.

Islam, N. (Ed.). (2012). *Dhaka: From City to Megacity: Perspectives on People, Places, Planning, and Development Issues* (2nd ed.). Urban Studies Programme, Department of Geography, University of Dhaka. Retrieved on 17 July 2026 from

Islam, T. (2024). *The housing sector is now beyond the purchasing power of ordinary people*. Centre for Policy Dialogue (CPD). Retrieved from https://cpd.org.bd/আবাসন-খাত-এখন-দেশের-সাধারণ-মানুষের-ক্রয়ক্ষমতার-মধ্যে-নে

Islam, M. T., & Arefin, K. (2009). Real estate market in Bangladesh: Development and current practice. *SSRN Working Paper No. 2979250*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2979250

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues* (World Bank Policy Research Working Paper No. 5430). World Bank. Retrieved from https://info.worldbank.org/governance/wgi/

Khan, M. I. (2018). *A brief history of the expansion of Dhaka city*. Bproperty. Retrieved from https://www.bproperty.com/blog/brief-history-expansion-of-dhaka/

Khan, M. A. (2020). *Administrative corruption in land development sector and its remedies*. Dhaka: Bangla Academy Publications.

Khan, M. Z. H., Sultana, S., & Hassan, M. F. (2025). *Dhaka without nature? Rethinking natural rights led urban sustainability*. Change Initiative. Retrieved from https://www.changei.earth/post/dhaka-without-nature-rethinking-natural-rights-led-urban-sustainability-1

Khan, M. S., & Barua, S. (2009). *The dynamics of residential real estate sector in Bangladesh: Challenges faced and policies sought*. University of Dhaka. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/228122418_The_Dynamics_of_Residential_Real_Estate_Sector_in_Bangladesh_Challenges_Faced_and_Policies_Sought.

Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques*. New Age International.

Kulsum, R. (2023). Real estate sector and Bangladesh economy. *International Journal of Research Publication and Reviews, 4*(9), 233–244. https://doi.org/10.55248/gengpi.4.923.9244

Kumar, Dhanonjoy & Rokonuzzaman, Md & Sanyal, Shamindra Nath. (2024). Unplanned Urbanization Effects on Agriculture in Bangladesh: A Case Study. 11. 1-7. Retrieved from https://doi.org/10.17148/IARJSET.2024.111001

Kulsum, R. (2023). *Real Estate Sector and Bangladesh Economy*. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 4(9), 1414–1416. Retrieved from https://ijrpr.com/uploads/V4ISSUE9/IJRPR17226.pdf

Lamarca, J., Samuels, T., & Johnson, P. (2021). Urban land development and governance challenges in South Asia. *Journal of Urban Policy and Research*, *19*(3), 245–268.

LightCastle Partners. (2015). *Bangladesh housing sector overview*. Retrieved from LightCastle Partners website.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.

Lucius, D. I. (2001). Real options in real estate development. *Journal of Property Investment & Finance*, *19*(1), 73–78. https://doi.org/10.1108/14635780110365370

Mason, M. (2010). Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. *Forum: Qualitative Social Research*, 11(3).

Mbany Real Estate. (2024, December 20). *What is the difference between a real estate developer and a contractor?* Retrieved from https://www.mbany.com/en/blog/what-is-the-difference-between-a-real-estate-developer-and-a-contractor

Michael, J. (1999). *Real Estate Development and Growth: Opportunities in Urban Markets*. New York: Urban Press.

Miles, M. E., Berens, G., & Weiss, M. A. (2007). *Real Estate Development: Principles and Process* (4th ed.). Urban Land Institute.

Ministry of Housing and Public Works. (2016). *National Housing Policy 2016*. Government of the People's Republic of Bangladesh. Retrieved from https://mohpw.gov.bd

National Housing Authority (NHA). (*2018*). *Annual Report.*

Nancy, S. (2004). *Effects of commercialization on the adjoining areas: A study of Dhanmondi and Banani* (Unpublished master's thesis). Department of Urban and Regional Planning, Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka.

Nilufar, F. (2010, February). *Urban Morphology of Dhaka City: Spatial Dynamics of Growing City and the Urban Core*. Paper presented at the International Conference on *Urbanization in Dhaka City: 400 Years of Capital Dhaka*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/363752862_Urban_Morphology_of_Dhaka_City_Spatial_Dynamics_of_Growing_City_and_the_Urban_Core

Nilufar, F. (2011). *Urban Morphology of Dhaka City: Spatial Dynamics of Growing City and the Urban Core*. In R. Hafiz & A. K. M. Golam Rabbani (Eds.), *Urbanization and Urban Development* (pp. 187–210). Asiatic Society of Bangladesh. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/363753023_Urban_Morphology_of_Dhaka_City_Spatial_Dynamics_of_Growing_City_and_the_Urban_Core

Planning Commission. (2020). Perspective Plan of Bangladesh 2021–2041.

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Rahman, M. M. (2010). *Urbanization in Bangladesh: Challenges and priorities*. University Press Limited (UPL).

R*ahman, M. (2011). Dhaka: An urban reader. Dhaka: University Press Limited.*

Rahman, M. M. (2024). *Compilation of GDP for Real Estate and Administrative Service Sector*. Bangladesh Bureau of Statistics. Retrieved from

https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/9c1ddf59_de69_47cf_863d_03a4e071c6a5/2024-02-14-04-54-eb217fdd643f1f203ec8f703035850a3.pdf

Rahman, S. (2020). *Human Rights and Constitutional Law of Bangladesh*. Dhaka: Academic Press.

RAJUK. (2015). *Dhaka Structure Plan (2016–2035).* Rajdhani Unnayan Kartripakkha (RAJUK), Ministry of Housing and Public Works, Government of Bangladesh. Retrieved from https://www.rehab-bd.org/img/home_attach/Dhaka%20Structure%20Plan%20(2016-2035).pdf

RAJUK. (2023). *Rajdhani Unnayan Kartripakkha (RAJUK): Official Project Documents (Uttara, Purbachal, Jhilmil)*.

REHAB. (2014). *A comprehensive study on the real estate sector of Bangladesh*. Real Estate and Housing Association of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh. Retrieved from https://mis.rehab-bd.org/attachment/add_page/page_121.pdf

Sarker, R., Siddiquee, M., & Rehan, S. F. (2008). Real estate financing in Bangladesh: Problems, programs, and prospects. *AIUB Journal of Business and Economics*, 7, 78–84.

Seraj, M. (2003). *Real estate development in Dhaka: Challenges and prospects*. Dhaka: Urban Development Publishers.

Seraj, T. (2012). *Private Sector Housing in Bangladesh*. Dhaka: Bappon Prokashan.

Shakur, M. T. (1987). An analysis of squatter settlements in Dhaka, Bangladesh (Doctoral dissertation, University of Liverpool). Retrieved from https://livrepository.liverpool.ac.uk/3175711/1/DX089082.pdf

Siddiqui, K. (1990). *The Politics of Urban Development in Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited.

Siddiqui, N. A. (2019). *Declining Agricultural Land and Future Landscape of Bangladesh*. Daily Sun, Dhaka (18 September). Retrieved from https://www.dailysun.com/post/424437/Declining-Agricultural-Land-and-Future-Landscape-of-Bangladesh

Talukder, N. A. (2013). Emerging issues in Bangladesh's housing sector. Housing Finance International. *The Quarterly Journal of the International Union for Housing Finance*. 28(1). Retrieved from https://www.housingfinance.org/wp-content/uploads/2020/03/HFI-3-2013.pdf

UNESCAP (2009). *What is Good Governance? Retrieved from:* https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf

Weimer, A. M. (1980). *Principles of Real Estate*. Homewood, IL: Irwin.

World Bank. (2007). Dhaka: Improving Living Conditions for the Urban Poor.

World Bank. (2018). *Bangladesh Urbanization Review: Managing Spatial Transformation for Sustainable Development*. Washington, DC: World Bank Group. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/1234567890

World Population Review. (2025). *World cities: Population and significance*. Retrieved from https://worldpopulationreview.com/cities/ .

****